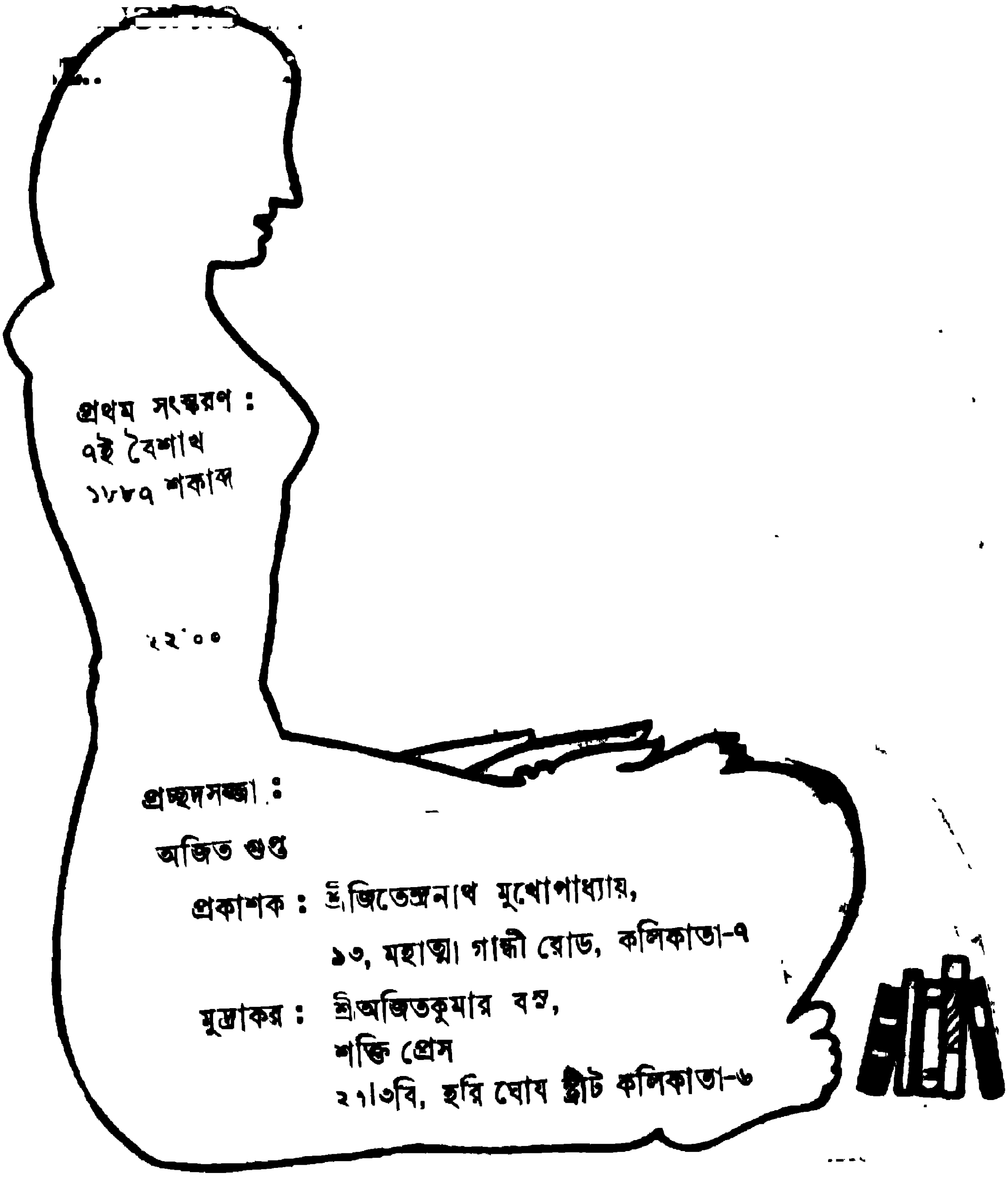
কাঁচ পুঁতি হীরে

আশাপূর্ণা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ
১৮৮৭ শকাব্দ

২'০০

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিতকুমার বসু,
শক্তি প্রেস
২১।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু



সীমারেখার সীমা

সবাই হেরে ফিরে গেছে !

শেষ পর্যন্ত সতীনাথ নিজেই তিনতলায় উঠে এলেন। তীব্র স্বরে বললেন, 'অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে ছবি, থাকা উচিত। কিন্তু এই বিয়েবাড়ি-ভর্তি লোকের সামনে যে অসভ্যতা করলে তুমি, তার সীমা নেই ! আমাকে তো এতগুলো আত্মীয় কুটুম্বের সামনে ধুলোর অধম করলে, নিজের মুখও কম হাসালে না ! এখন চলো দয়া করে !'

তিনতলার ছাতে ঘরের স্যাংশান ছিল না, তবু ছবির জন্যেই ঘরটা বানানো হয়েছিল টালীর ছাত দিয়ে। ছবির এই টালীর ছাত ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলছিল না। শুধু নীচের তলার প্যাণ্ডেলের অগুনতি আলোর তির্যক এক একটা রেখা কীভাবে যেন এসে পড়ে ঘরের দরজাটা সামান্য আলোকিত করেছিল।

সেই দরজার ধারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি, হাতের সেই আঙুল ক'টা আর গালের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল শুধু তার। কিন্তু সেই দেখাটুকুতে ছবির মুখের ভাব ধরা পড়ছিল না।

ধরা পড়ছিল না,—এখনো আগের মতই অনমনীয়, না নরম হয়ে এসেছে।

সতীনাথ ডাকতে আসার পরও যদি পূর্ব অবস্থাই থাকে, ধরে নিতে হবে, ছবিও তার বরের মত পাগল হয়ে গেছে !

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন বোঝা গেল না। ছবি অদ্ভুত শুকনো গলায় বলল, 'তুমি আবার কেন কষ্ট করতে এলে দাদা, আমি তো বলেই দিয়েছি—'

'হ্যাঁ জানি—' সতীনাথ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ স্বরের সংমিশ্রণে বলেন, 'জানি একে একে বাড়িসুদ্ধু লোক তোমাকে খোশামোদ করতে

এসেছে, আর তুমি সবাইকে ছুট্-আউট করে দিয়েছ 'খাব না, নীচে নামব না' বলে। তোমার বৌদি তো শুনলাম হাত জোড় করে ফিরে গেছে। তাতেও—তোমার—'

ছবির মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

ছবি যদি ঘরের মধ্যে থেকে একটু বেরিয়ে আসতো, হয়তো দেখা যেত, কিন্তু বেরিয়ে আসছে না ছবি। যেন ঘরের দরজায় কে তাকে গণ্ডি কেটে দিয়ে আটকে রেখে গেছে সীতার মত। ওই চৌকাঠ ডিঙোলেই রাবণের হাতে পড়ে যাবে ও!

কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে ফেলে নিজেকে যে ছবি একবার বিছানায় ফেলবে সে অবকাশ মিলছে না। সেই সন্ধ্যা থেকে কেবল লোকের পর লোক আসছে ছবিকে ডাকতে।

'অ ছবি, পাঁচশো লোক এসেছে নীচে, কতজন খোঁজ করছে 'ছবি ছবি' করে, আয় একবার!'······'অ ছবি, কী রূপের জামাই হয়েছে তোর দাদার, দেখবি না একবার?'···'পিসিমা, সম্প্রদানের ঘরে কী সব তুমি করে আসনি, বাবা রেগে আগুন হয়ে গেছে, এসো শীগগির!'...

কিন্তু ছবি অটল।

ছবির দুর্জয় মান ভাঙছে না।

ছবি বলছে, 'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

অথচ সারা দিন কিছুই না।

কোনোদিনই কিছু না। গোড়া থেকে বিয়ের সব কাজই ছবি সামলাচ্ছে।...রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খাবার ঘর পুজোর ঘর চরকি ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবি, এর মাঝখানে ঠিক এই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন্ ফাঁকে যে সেই ঘটনাটুকু ঘটে গেছে, আর কোন্ ফাঁকে ছবি সেই তুচ্ছ ঘটনাকেই উচ্চ করে তুলে অভিমানে শয্যা নিতে গেছে, তা কেউ খেয়াল করেনি। খোঁজ পড়েছিল সম্প্রদানের সময়।

ছবি কোথায় ? ছবি ?

গাঁটছড়ার হলুদ কড়ি কোথায় রেখে গেল ছবি ? কনের লজ্জাবস্ত্র ? পাওয়া যাচ্ছে না দরকারের সময়।

পাওয়া অবিশ্যি গেলই তখুনি, পাশেই ছিল। কিন্তু কেউ পাশে বসে হাতে হাতে জুগিয়ে না দিলে অসুবিধে নেই ? আর শুধু গাঁটছড়ার হলুদকড়ি আর কনের লজ্জাবস্ত্রই তো নয়, নিয়ম কর্মের সব কিছুই তো ছবির এক্তারে। কনের মা কত দিকে তাল দেবে ? অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে হবে না তাকে ?

কিন্তু সব জেনেও সবচেয়ে মোক্ষম সময় 'হাওয়া' হয়ে গেল ছবি ? ছি ছি ! ধমক খাওয়া বরকে সোহাগ করতে গেল আর কি ! কিন্তু এইটা কি তার সময় ? পাগল ছাগল মানুষ, আবার কী করতে কী করবে, তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে নেমে আয় ? বর-কনে বাসরে বসলে তখন বরং গুছিয়ে ভোজের রান্না সাজিয়ে নিয়ে তিনতলায় বসে বরকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে সোহাগ করিস !

এ কী !

এ যে বরদাস্ত করা কঠিন !

এই বাড়িভর্তি লোকের সামনে তুই তেজ করে বর নিয়ে ঘরে বসে আছিস ? বলছিস 'ও খাবে না, আমি খাবো না !' ছি ছি ! অমন যে জামাই হল দাদার, কত আমোদ আহ্লাদ হল, বিয়ের সময়, স্ত্রীআচারের সময় দেখলি না একবার ? এমন কি খাওয়ায় পর্যন্ত তেজ দেখাচ্ছিস ? এই উৎসব, এই কাণ্ডর রান্না-বান্না, মাছ মিষ্টি হেন-তেন, তার কিছু দাঁতে কাটবি না দুটো মানুষে ? উপোস করে পড়ে থাকবি ?

ভাইঝির কল্যাণ অকল্যাণ দেখবি না ? ভাই-ভাজের মাথা হেঁট করবি ? ইতরতার কি মাত্রা নেই ?

দাদা, তোর চাইতে কুড়ি বছরের বড় দাদা, বাপের মত বললেই হয়, বাপের মতই মানুষ করেছে তোকে, বিয়েও দিয়েছে। আর তার পর বারো মাস তিরিশ দিন তোকে আর তোর পাগল বরকে পুষছে,

ঘর বানিয়ে দিয়েছে তোর জন্যে। সেই দাদা যদি পাগলটাকে একটু ধমকেই থাকে, কি একটা ধাক্কাই দিয়ে থাকে, এই ব্যবহারটা করবি তুই ? কৃতজ্ঞতার বালাই নেই শরীরে ?

এত বড় অকৃতজ্ঞতা করে কেমন যেন দেখাচ্ছে ছবিকে, সেই দৃশ্য দেখতেই বোধ করি ছবির এই টালীছাত ঘরের দরজায় রথ-দোলের ভিড় হয়েছে তখন থেকে।

অনেকে আবার সহানুভূতিও দেখাচ্ছে !

চুপি চুপি অবশ্য।

কারণ যার বাড়ি তার বিপক্ষ দলের হয়ে কথা বলতে চুপিচুপিই ভাল। চুপিচুপিই বলা যায়, 'আহা !' বলা যায়—'মরে যাই, ছোট ভগ্নীপতিটা পাগল ছাগল মানুষ, বোঝে না বলেই না অমন কাজটা করে ফেলেছিল, তার জন্যে তুমি একটা বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তোমারই মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ, সেই শুভদিনে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে ? বোনটা 'কারে' পড়ে তোমার কাছে পড়ে আছে বলেই না এমনটা পারলে ? পয়সাওলা ভাগ্যিমানী বোন হলে পারতে ?'

কিন্তু নীচে নেমে গিয়ে তারাই আবার রেগে আটখানা হয়ে উল্টো গাইতে বসছে।

না বসবে কেন ?

তারা কি খৃষ্ট, না শ্রীচৈতন্য যে, রাগ নেই শরীরে ? ওই সহানুভূতির উত্তরে ছবি যদি চোখের জল না ফেলে, যদি বলে, 'এসব কথা আমার ভাল লাগছে না, আপনারা নীচে যান—'

তাহলে ?

খৃষ্ট চৈতন্যেরও রাগ হতো এতে।

কিন্তু এসব তো সান্ধ্য লীলা !

রাত্রে, অনেকটা রাত্রে, যখন বাইরের লোক বিদায় নিয়েছে,

বাড়ির লোকরা শুধু খেতে বাকী, যখন সতীনাথ তাঁর জামাইয়ের রূপে গুণে মোহিত, এবং নিজের ক্যাপাসিটির আহ্লাদে ভরপুর, তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষিতীশ খেয়েছে ?'

তখনই বোধ করি মনে পড়ল, অসভ্যর মত একটা ঝাড়নের ওপর একরাশ লুচি মিষ্টি চপ ফ্রাই নিয়ে আসরের মাঝখানে খেতে বসেছে দেখে ক্ষিতীশকে তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন আসর থেকে।

কাজটা একটু গর্হিত হয়েছিল, অস্বীকার করছেন না সতীনাথ, কিন্তু তাঁরও তো রক্ত মাংসের শরীর ?

সেইমাত্র বর আর বরযাত্রীর দল এসে আসরে বসেছে, এবং সতীনাথ কন্যাদান করবেন বলে তখনো অভুক্ত রয়েছেন, সেই উদ্বেগে অধীর, উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, আর আশঙ্কায় থরথর সঙ্গীন সময়ে ওই কুৎসিত বীভৎস দৃশ্য সহ্য করা কি সহজ ?

সহ্য করতে পারেন নি সতীনাথ।

কিন্তু পাগলাটা যে তাতে অপমানে খান্ খান্ হবে, তাও আশঙ্কা করেননি।···ঘুরে গিয়ে আবার হালুইকরদের কাছে গিয়ে বসবে, এই রকমই একটা আন্দাজ ছিল। জানতে পারলেন ছবির অনুপস্থিতিতে। ছবি বিহনে শুধু তো তিনিই অসুবিধেয় পড়েন নি, সারা বাড়িতেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আর 'ছবি ছবি' রব পড়ে গেছে।

সেই সময় বড় শালী ওই 'দানের' আসরেই কারণটা উদ্ঘাটিত করে ফেললেন।

'কি জানি ভাই, শুনছি তুমি নাকি কখন তোমার বোনাইকে যাচ্ছেতাই করেছ, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েছ, তাই বোন তোমার মনের দুঃখে বর নিয়ে নিজের কুঠুরিতে গিয়ে বসে আছে। সেই অবধি নামেনি। বোনাইটি বুঝি হালুইকরদের কাছে তম্বিগম্বি করে এক পোঁটলা খাবার জোগাড় করেছিল, সে সব উঠোনে দালানে সিঁড়িতে ছড়াছড়ি

কাণ্ড! রাগ করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেছে! তা ও না হয় পাগল, বোন তো তোমার পাগল নয়?'

এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নে তখন সতীনাথও রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, নেহাত দানের আসনে বসে, তাই উচিত ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কিন্তু এখন মনের মধ্যে উদারতার সুর বাজছে, এখন প্রশ্ন করা যায় 'ক্ষিতীশ খেয়েছে?'

অনুকূল উত্তর পেলেন না।

শুনলেন, সন্ধ্যা থেকে, না হোক পঞ্চাশজন গিয়ে সেধেছে ছবিকে বিয়ে দেখতে, পাঁচজনের কাছে এসে বসতে, পঙ্‌ক্তিতে বসে খেতে। পাহাড়ের মত অচল হয়ে বসে আছে ছবি, নামানো যায়নি তাকে।

এ হেন অসভ্যতার কাহিনীটা আবার সবটাই শুনলেন স্ত্রীর মুখে। তার পরেও আর মনের মধ্যে উদার রাগিণী বাজতে থাকবে, এ আশা করা চলে না।

তেড়ে উঠে গেলেন তিনতলায়।

বললেন, 'না হয় হাত জোড়ই করছি, একবার আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে চল!'

ছবির কি গলা কাঁপলো?

না সতীনাথের মনের ভ্রম?

বোধ হয় ভ্রমই। ছবি তো খুব পরিষ্কার গলায় বলছে, 'এসব কেন বলছো দাদা, আমি তো বলছি আমার খাবার ক্ষমতা নেই, খেতে পারবো না। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে!'

সতীনাথের সেই এক পোঁটলা খাবারের বীভৎস দৃশ্যের কথা স্মরণে এল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা।···পাগল হোক ছাগল হোক, স্বামী!

নরম গলায় বললেন, 'বেশ তো, পারিস না পারিস বসবি আয় একবার। ক্ষিতীশের খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলছি, ওকে খাইয়ে চলে আয়।'

ছবি তেমনি নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'ও খাবে না দাদা!'

আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

আর সেটা আশ্চর্যও নয়।

সতীনাথ নেমে এলেন, শুধু কড়া গলায় একটি মন্তব্য করে, 'বেইমান হলে এই রকমই হয় বটে।'

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অমল উঠে এল।

শেষ পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে সে, অথচ সামান্য একটা মেয়ের ধনুক-ভাঙা পণে অকারণ ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর থেকে ফের একটায় গিয়ে পড়ল।

সে এদের আত্মীয় নয় কিছু নয়, পাড়ার লোক মাত্র, তার এত দায়িত্ব মাথায় নেবার কারণ নেই, তবু নিয়েছে। স্বভাবে নিয়েছে। কিন্তু আর রাত হলে তার নিজের বাড়ির লোক কি বলবে?

সিঁড়িতে সতীনাথের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা।

সতীনাথ একবার তাকিয়ে দেখলেন, ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন, 'ও, তুমি বুঝি বাকী ছিলে?'

নেমে গেলেন।

পাড়ার ছেলে, চিরকালের চেনা জানা, অবাক কিছু হলেন না। তবে আশাও রাখলেন না।

অমলও রাখেনি।

অমলের কিছুই শুনতে বাকি নেই।

ঘটনা থেকে মন্তব্য!

তাই অমল ভরসা রাখেনি নিজের উপর। তবু তার একবার দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল। অতখানি অনমনীয় হলে দেখতে কেমন লাগে ছবিকে, বোধ করি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল অমলের!

ছবি তখন আস্তে দরজাটা বন্ধ করছিল। হয়তো ভাবছিল এইবার একটু শুয়ে পড়তে পারি!

অমলকে দেখে হাতটা থামালো। দরজা আধখানা বন্ধই রইল।

অমল ভাবল, ফস্ করে কি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালবো? দেখবো মুখটা কেমন দেখাচ্ছে ওর?

তা জ্বালল না।

বলল, 'আলোটা জ্বালো না!'

ছবি আগের মতই শুকনো গলায় বললে, 'কী দরকার?'

'দরকার অবশ্যই নেই, কিন্তু তোমাকে কেমন যেন ভৌতিক ভৌতিক লাগছে, তাই—'

ছবি প্রতিবাদ করল না, চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না, কৈশোর স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে এই কৌতুক কথায় হেসেও উঠল না। ছবি শুধু ছবির মতই দাঁড়িয়ে রইল সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে।

অমল ছবির ঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল না, আধ-ভেজানো দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি। তাই অমল ঘরের মধ্যেটায় এক-বার চোখ ফেলবার বৃথা চেষ্টা করে বলল, 'ক্ষিতীশবাবু ঘুমোচ্ছেন?'

এখন ছবি অকারণ যেন একটু হাসলো। বললো, 'হ্যাঁ!'

'শুনলাম সতীনাথদা ওঁকে 'ইয়ে' করেছেন, কিন্তু ছবি, তবু এতটা না করলেও পারতে তুমি! শুনে শুনে এত লজ্জা করছিল—'

ছবি এবার স্পষ্টই হেসে উঠল।

আর আরও একবার মনে হল অমলের, সত্যিই ছবিকে যেন ভৌতিক ভৌতিক দেখাচ্ছে। হাসিটা পর্যন্ত। হাসির সঙ্গে বলল ছবি, 'আমার নির্লজ্জতায় তুমি হঠাৎ লজ্জা পেতে গেলে কেন অমল?'

অমল কি সত্যি দেশলাই কাঠি জ্বালাবে? দেখবে শুধু নির্লজ্জই নয়, নিতান্ত নিষ্ঠুর এই ছবির মুখটা কেমন দেখতে লাগছে?

অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা ছবিকে যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

ছবির দাদা ঠকেছিল, না বুঝে ছবিকে একটা মাথাখারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, তবু ছবি কোনোদিন দাদার নামে অভিযোগ করেনি। ছবির ভাসুর পাগল-ভাই আর ভাদ্রবৌকে এখানে চালান করে দিয়েছিল, তার জন্যেও ছবি গাল দেয়নি তাদের।

ছবি অমলের কাপুরুষত্বাকে ধিক্কার দেয়নি কোনোদিন। সহজ স্বাভাবিকভাবে ছবি কাজকর্ম করেছে, কুমারীকালে যেভাবে এ সংসারের দায়িত্ব নিত, তাই নিয়েছে, বেশীর মধ্যে পাগলকে সামলেছে।

কিন্তু সব কিছুর উপর চমৎকার একটা কৌতুকের বর্ম পরিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ছবি। অমল কী না জানে, অমল সর্বদা আসে!

ক্ষিতীশকে অনেকক্ষণ না দেখলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ছবি, সেও হাসির ছলে। গল্প করতে করতে সহসা উঠে পড়ে বলেছে, 'এই সেরেছে, অনেকক্ষণ যেন আমার নিধিটিকে দেখিনি মনে হচ্ছে, যাই দেখি আবার বৈরাগী হয়ে চলে গেল কি না!'···বলেছে, 'কটা বাজলো? ওমা তা তো মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়ে গেছে! দেখি আবার প্রভু নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি খাচ্ছেন কি না!' বলেছে, 'ওই দেখ মুখ কালি করে হঠাৎ চলে গেলেন দয়াময়, আমরা জমিয়ে গল্প করছি, প্রাণে সহ্য হল না। চললাম বাবা। নচেৎ ভোলানাথ রুদ্র হয়ে বসে থাকবেন!'

পাগলের পাগলজনোচিত আচরণে যদি কেউ হাসি ঠাট্টা বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কোনোদিন রাগ করতে দেখা যায়নি ছবিকে। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছে, 'বল বাবা, তোমরা সবাই মিলে একটু বল! আমার কিছু কাজ কমুক! জামাইবাবু বলে সমীহ না করে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ' করলে উপকার হয় ওর!'

হেসে হেসেই বলেছে।

অথচ আজ বরের ওইটুকু সত্যিকার অপমানেই ভোল বদলে গেল ছবির?

সতীনাথের স্ত্রীর কথাই তা হলে সত্যি বলে ধরতে হবে? ভাবতে হবে হিংসের জ্বালায় সামান্য একটু ছুতো পেয়েই এমনটা করছে ছবি? দাদার মেয়ের এত ভাল বিয়ে হলো, অমন সুন্দর বর হলো, এতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার!

ছবির সম্পর্কে এমন কথা ভাবা যায় না।

কিন্তু নিজেই ভাবাচ্ছে ছবি।

এই অশোভন আচরণ আর বিসদৃশ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ছে।

ঈর্ষাই!

নইলে কবে এমন পতিভক্তি ছিল ছবির? বরং তার বৌদি বলেছেন, 'স্বামী পাগল বলে এতটুকু দুঃখু আছে ছবির, তা বোঝাও যায় না! কী অদ্ভুত অটুট মন বাবা!

ছবির সেই অটুট মন টুটো ফুটো হয়ে গেছে অতএব হিংসের জ্বালাতেই!

কিন্তু অমল এ সব চিন্তার ওঠাপড়া প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর ছবি!'

ছবি বলল, 'আজ জানলে?' তারপর বলল, 'কিন্তু তুমি সুদ্ধ কেন এলে বল দেখি? খাওয়ার জন্যে ডাকতে না কি?'

অমল আহত দৃষ্টি তুলে আর একবার চেষ্টা করল ছবিকে দেখতে। তারপর বলল, 'না, তোমাকে ডাকতে আসি এত দুঃসাহস নেই। ভাবছিলাম—ক্ষিতীশবাবুকে খেতে না দিয়ে আটক রেখে দাদাকে আর কতটুকু শাস্তি দিতে পারলে? শুধু ওই বেচারী ভদ্রলোককেই জব্দ করলে। খুব উৎসাহ করে আমায় বলেছিলেন, 'তুমি আমায় পরিবেশন করে খাওয়াবে, বুঝলে? এরা ভাল করে দেবে না!'

কথা শেষ করে হাসল একটু অমল। বললো, 'অবশ্য 'এরা' বলেননি, বলেছিলেন 'শালারা'!

ছবির কি এতক্ষণ উপোস করে থেকে গলাটা অত বেশী শুকিয়ে গেছে? না কি এতক্ষণকার অশোভন আচরণের অনুতাপে? নইলে গলাটা তো বেশ সুরেলাই ছিল ছবির!

ছিল, এখন নেই। এখন সেই শুকনো গলাতেই বলে ছবি, 'তা' তোমার পরিবেশনের অপেক্ষা তো রাখেনি, নিজেই তো—'

'থাক্ ছবি, সে সব কথায়···তুমি খাও না খাও, ওঁকে একটু তুলে দাও, আমার সত্য রক্ষা করি।'

ছবি তার কৈশোর স্মৃতির মর্যাদাকে একবারে ধূলিসাৎ করলো। ছবি তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'ও খাবে না!'

'ছবি! বাস্তবিকই তুমি যৎপরোনাস্তি অসভ্যতা করছো! সবেরই সীমা থাকা দরকার! আজ রাগ করে খেতে দেবে না তুমি ওঁকে, কাল তো দিতে হবে? তখন?'

ছবি এবার হেসে উঠল।

সত্যিকার হেসে উঠল। শব্দ করে।

বললো, 'কালও খাবে না অমল, কাল না, পরশু না, কোনোদিন না!'

অমল এই সাধারণ রাগের কথাটায় এমন ভয় পেল কেন? ছবিকে কি সত্যি ভৌতিক মনে হল অমলের, ওই হাসি শুনে?

তাই অমল হঠাৎ 'ছবি' বলে অমন আর্তনাদ করে উঠল!

ছবি এ ডাকের উত্তর দিল না। ছবি নড়লও না।

আর ছবির সেই অনড় মূর্তিটার দিকে চেয়ে অমল হঠাৎ বহুকালের ভুলে-যাওয়া একটা বোকামি করে বসলো। একেবারে কাছে সরে এসে ছবির সেই কপাট ধরে থাকা হাতটা চেপে ধরলো জোরে। বললো, 'ছবি, আলো জ্বালাও!'

ছবি আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

বললো, 'কী হবে?'

'আমি দেখবো!'

'দেখবার কিছু নেই অমল!'

—'ছবি, নিজেকে এতো নির্ভুল মনে করো না, দরজা ছাড়ো, আমায় দেখতে দাও!'

ছবি তবু সরে গেল না।

শুধু স্বরটা দৃঢ় করলো, 'সত্যিই দেখবার কিছু নেই অমল!'

অমলও কি ভৌতিক হয়ে গেছে?

অমলকেই বা অমন দেখাচ্ছে কেন?

অমল কি ভুলে গেছে তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নীচের লোকেরা কী ভাবছে? ওদের কৈশোর ইতিহাস কি তাদের কারুর মনে নেই?

অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় অমলের মনে পড়লো নীচের তলায় একটা জগৎ আছে। তাকে নামতে হবে। তাই বললো, 'ছবি এটা কী করে হলো?'

ছবি বিচিত্র একটা স্বরে বললো, 'পাগলের পাগলামি আর কি! 'শালা আমায় খেতে দিল না' বলে নিজের মাথাটাতেই কিল বসাতে বসলো—'

'ছবি, তুমি কি পাথরের?'

'হয়তো তাই!'

'ছবি, নীচে গিয়ে ওদের কী বলবো?'

'কিচ্ছু না অমল, দোহাই তোমার। বর-কনে বাসরে বসেছে, ওদের এই রাতটাকে ধ্বংস করে দিও না।'

'ছবি, কী করে পারছো?'

'পারতে তো হবেই অমল! সীমারেখাটা ভুললে চলবে কেন? ওদের এই আহ্লাদের সময় কি আমি আমার—'

'সারারাত এইভাবে থাকবে তুমি?'

'না, শোবো। বড্ড ঘুম পেয়েছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবো।'

অভদ্র আর অসভ্য ছবি হঠাৎ অমলের মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

খুট করে একটা শব্দ হল। ছিটকিনির শব্দ।

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ না করে আর পারছে না ছবি। সতীনাথের কথাটাই এখন ঠিক মনে হচ্ছে ওর, সব কিছুরই মাত্রা থাকে, থাকা উচিত!

কয়েক ঘণ্টা এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অন্ধকারটার মধ্যে ডুবে থাকতে পেলে আবার ছবি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। আবার কাল সকালে স্বাভাবিক ছন্দে নীচে নেমে গিয়ে সহজ গলায় বলতে পারবে, 'কাল বিয়ের গোলমালের মধ্যে তোমাদের আর ব্যস্ত করিনি, কিন্তু আর বোধ হয় না করলে চলবে না। এসে দেখ এবার! যা করবার তোমাদেরই তো করতে হবে!'

এখন মুখের মধ্যে গালের হাড়ত্নটোই প্রধান হয়ে উঠেছে। চোখত্নটো যে একদা চোখে পড়বার মত ছিল, সে আর বিশ্বাস হয় না এখন। তারা যেন শুধু বিশ্বের সমস্ত ক্লান্তির প্রতীক সেজে কষ্টে তাকিয়ে আছে ঘুমের ঘরে তলিয়ে যাবার অপেক্ষায়।···বুকের ওঠাপড়াটা সেই আসন্ন ক্ষণের মুহূর্ত গুনছে যেন।···কপালের চুলগুলো পাতলা হবার দিকে এত দ্রুত ঝোঁক নিয়েছে যে, মাথার ত্ন'পাশের সুপুষ্ট বেণীত্নটোকে 'আকস্মিক' লাগে। ওই বেণীত্নটো হাতে তুলে নেড়ে-চেড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে সুজাতা—'চুলের বাহারটা গেল, ভারটা রইল।'

সত্যি, ভারটা যে কেন রইল, সেটাই আশ্চয্যি। কম দিন তো ভুগছে না। প্রথমদিকে তেমন আমল দেয়নি সুজাতা, শুয়েছে উঠেছে, বসেছে, আবার শুয়ে পড়েছে। হয়তো বা রাঁধুনীকে বলেছে, 'নিজে যা পারিস করগে যা।'

অথচ নীলেন্দু ডাক্তারের কথা তুললে বলেছে, 'মাথা খারাপ! মনে হচ্ছে ভেতরে চাপা অম্বল হচ্ছে, এ তার ত্নর্বলতা।'...বলেছে, 'রাতে একটু কেমন ঘাম হচ্ছে, এ তার অবসন্নতা।'

কিন্তু ক্রমশ শোয়াটাই বাড়তে লাগল। তখন তোড়জোড় করে ডাক্তার আনা হল, ডাক্তার এসে 'বিছানাই একমাত্র' নির্দেশ দিল।

আগে বলেছিল, 'মাস দেড়েক শুয়ে থাকুন। কমপ্লীট রেস্ট, উঠে বসা পর্যন্ত না, ব্যস সেরে যাবেন।' হ্যাঁ তাই বলেছিল আগে।

'বাবাঃ, একেবারে শুয়ে!' সুজাতা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল ডাক্তারের বোকামিকে, ডাক্তারের পাগলামিকে! ওরা ওরকম বলে! বোকার রাজা!'

নীলেন্দু বলল, 'ওরা মোটা মোটা টাকা ব্যয় করে যে বোকামিটুকু অর্জন করেছে, সেটুকু সার্থক করতে দাও। তোমার রান্নাঘর, ভঁাড়ার ঘর, পুজোর ঘর, খাওয়ার ঘর, পালিয়ে তো যাচ্ছে না পা বার করে ?'

'বাঃ, এক-আধদিন হয় আলাদা কথা। তা বলে—'

'কোনো কথা নয়, স্রেফ লক্ষ্মী-মেয়ের মত চুপটি করে শুয়ে থাকো, চোখটি বুঁজে—ডিরেকশান পর্যন্ত দেবে না। মৌনী হবার সাধনা করো।'

সুজাতা ভাবে, পুরুষমানুষেরা এমন বোকা আর অবুঝ হয় ! চাকর-বাকরকে যে কীভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিকপথে চালাতে হয়, সে জ্ঞান যদি থাকতো !

অজ্ঞান পুরুষের অজ্ঞানতাকে 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দিয়ে জ্ঞানী মহিলার ভূমিকা নিতো সুজাতা। নীলেন্দুর অনুপস্থিতির সুবণ সুযোগটুকুতে।

কি রান্না হবে, কতটা দুধ নেওয়া হবে, কোন্ বেলায় মাছ, আর কোন্ বেলায় মাংস হবে, শুধু এইসব নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতো না, ওর সামনে এনে এনে দেখাতে হতো ময়দার মাপ, মসলার মাপ, কুটনোর মাপ।

রঁাধুনী ছেলেটা অবশ্য তা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে উল্টোপাল্টা করে বসতো এবং যথেষ্ট পরিমাণেই বকুনি খেয়ে মরতো। কারণ, বকতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলেও নীলেন্দু আর 'শুভো'র খাওয়া-দাওয়ার এদিক-ওদিক হলে, বকতে ছাড়ত না সুজাতা।

যাকে বকতো, শেষপরে তাকেই আবার ইশারা করতো পাখার স্পীড বাড়িয়ে দেবার জন্যে।

আট বছরের শুভেন্দু তখন মাকে চোখ পাকিয়ে শাসন করতে আসতো, বলতো, 'বাবাকে বলে দিচ্ছি, রোসো !'

কিন্তু দেড়মাসের ছলনা আস্তে আস্তে ক্যালেণ্ডারের থান চার-পাঁচ

পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিছানা থেকে ওঠা হলো না সুজাতার। ডাক্তারের পর ডাক্তার বদল হতে লাগল। চিকিৎসার পর চিকিৎসা। সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বদল হতে থাকল।...ময়দা, মসলা, মাছ, দুধ ক্রমশঃ একটা অর্থহীন শব্দমাত্রে পরিণত হলো, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঠাকুরঘর, খাবারঘর তাদের পরিচিত চেহারা হারিয়ে ধূসর শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

সুজাতা যে কোনোদিন ওসব জায়গায় গিয়েছে, তাই যেন ভুলে গেল সুজাতা। ভুলে গেল ওই কেন্দ্রটিতে পাক খেতেখেতেই সারাটা দিন কেটে যেত তার, আর সেই যাওয়াটাকে অন্যায় মনে হতো না। এখন নিজের কাজে চাকরটাকে না পেলে অথবা যথাসময়ে পথ্য না পেলে পাখির গলায় চেঁচিয়ে উঠে, 'কী এত রাজকার্য হচ্ছে ওখানে? কী এত কাজ সংসারে?'

পুরনো অভ্যাসে যদি কোনোদিন রাঁধুনী-ছোকরা খাবার জিনিস কোনো কিছু দেখাতে আনে, হাত নেড়ে বিদায় করে তাকে সুজাতা। নয়তো বলে, 'রুগীর ঘরে আনতে হবে না ওসব।'

ছেলে এসে একটু বসলে বলে, 'ও-ঘরে যাও।' বলে, 'এই দমবন্ধ ঘরে বসতে হবে না বাবা!'

শুধু নীলেন্দু।

নীলেন্দুর প্রত্যাশাতেই দিন-রাতের মুহূর্তগুলি আবেগে থরথর করে, অভিমানে মলিন হয়। সুজাতার জন্যে যে অনেক খরচ হচ্ছে, সে-কথা এখন আর ভাবে না সুজাতা, নীলেন্দু যে আরো অনেকক্ষণ ওর কাছে থাকছে না, সেটাই বলে। কখনো অভিমানে, কখনো হতাশায়, কখনও ক্রোধে, কখনও ক্ষোভে।

কিন্তু নীলেন্দুরই বা সময় কোথা?

নীলেন্দুরই কি কম কাজ বেড়েছে? বাড়িতে গৃহদেবতা আছেন নীলেন্দুর ঠাকুমার আমল থেকে। তাঁর সেবার ভার ঠাকুমা থেকে মা, মা থেকে বৌ-তে বর্তেছিল, এখন নীলেন্দুকেই সে-ভার নিতে

হয়েছে, অনভ্যস্ত হাতের কাজে সকাল-সন্ধ্যা অনেক সময় ব্যয় হয়। যে সময়টুকু সুজাতার কাছে অমূল্য।

এছাড়া নীলেন্দুকে শুভেন্দুর প্রয়োজনের ঘরেও রাখতে হয় কিছুটা সময়। শুভেন্দু কি খেল, কি পরল, বই কোথায় ফেলল, পেন্সিল কোথায় রাখল। একটা মাত্র ছেলে, সুজাতা সর্ববিধ ব্যাপারে সবকিছু তার হাতে জুগিয়ে জুগিয়ে শৈশবের গণ্ডি পার হতে দেয় নি তাকে।... এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে নীলেন্দুকে। তবু তা সত্ত্বেও কষ্ট হচ্ছে বৈকি শুভেন্দুর, খুবই হচ্ছে। নীলেন্দুর কষ্টের একশেষ হওয়া দিয়ে তার সেই কষ্ট পাওয়াকে রোধ করা যাচ্ছে না।

ধোপা এলে নীলেন্দুকেই দেখেশুনে দিতে হয় কি কি যাবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, নীলেন্দু হয়তো শুভোর ফর্সা জামা-প্যাণ্টগুলো আলনা থেকে টেনে নিয়ে ধোপাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এবং ময়লা ছাড়া জামাগুলো খানিক পরে এখান-ওখান থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে। অর্ধেক দিনই রাত্রে শুভো ঘুমিয়ে পড়ার পর বামুনঠাকুরের খেয়াল আসে 'দাদাবাবু দুধ খায়নি'। শুভো স্কুলে চলে যাবার পর ঘোষণা করে 'দাদাবাবু টিফিন-বাক্সো ফেলে গেছে।'

বিছানার বাসিন্দা সুজাতার কানে আসে প্রায় সবই, এনার্জির অভাবে সে নিয়ে অভিযোগ করে না। শুধু তার সেই যে-চোখদুটো একদা চোখে পড়বার মত ছিল, তা থেকে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে একদিন কথাটা পাড়ল, 'এভাবে আর কতদিন চলবে? সুনীলাদিকে একটা চিঠি লিখে দেখনা?'

প্রস্তাবটা নতুন নয়।

মাঝে একবার কথাটা উঠেছিল।

সুজাতাই বলেছিল, 'সুনীলাদিকে লিখব কিছুদিনের জন্যে এসে থাকতে?'

হ্যাঁ, তখনো সুজাতা নিজে হাতে চিঠি লিখতে পারতো, আর তখনো আশা করতো, 'কিছুদিনের জন্যে'।

তা' নীলেন্দুই কি তাই করতো না ?

না করলে নীলেন্দু কেন তখন সে প্রস্তাব সমর্থন করেনি ? কেন বলেছিল, 'কী দরকার সুজাতা ? আমাদের এই ছোট্ট মিষ্টি নিরিবিলির মাঝখানে ইচ্ছে করে কেন আবার ওসব ?'

'মিষ্টি আর থাকতে দিলাম কই ?' সুজাতা নিজের ওপর অভিমানেই ছলছলিয়ে উঠল।···'তেতো বিষ করে ছাড়লাম!'

নীলেন্দু বলেছিল, 'মেয়েরা বড্ড বাজে কথা বলতে ভালবাসে।'

এখন কিন্তু আর সে-কথা বলল না। তারও যেন অহরহ মনে হচ্ছিল, একজন কারো হাতে ভারটা তুলে দিলে বাঁচি।

আশ্চর্য, যে-কাজগুলো কোনোদিন চোখে পড়েনি, 'কাজ' বলে কেউ চোখে পড়াতে এলে হাসি পেয়েছে, সেই নিতান্ত তুচ্ছ কাজগুলো এত ভারী ? রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাবারঘর, পুজোরঘর—এই চারটিকে কেন্দ্র করে যে কর্মপ্রবাহ চলে, সেই প্রবাহ যে দেখতে নিরীহ হয়েও ভিতরে এত উত্তাল, তা কে জানতো ?

হাঁপিয়ে উঠছিল নীলেন্দু।

'তুচ্ছের ভার কি পীড়াকর ! এ-ভার দেহকে যতটা না ক্লান্ত করে, তার থেকে অনেক বেশী ক্লান্ত করে মনকে। সেই ক্লান্ত মন নিয়ে নীলেন্দু হাতড়ে মরছিল মুক্তির উপায়।

একটা কি মেয়েছেলে রাঁধুনী রাখা হবে ? অথবা একটা রাত-দিনের ঝি ?···চাকরটাকে কি বলবে, 'তোর বাড়ি থেকে কাউকে আনতে পারিস ?'

সুনীলার কথাই কি মনে পড়েনি ? পড়েছিল। উল্লেখ করতে লজ্জা করছিল। যদি সুজাতা বলে, 'তখনই তো বলেছিলাম ! তখন আমার কথা শুনলে, সংসারের এই হাল হতো না !' তাই সুনীলার কথা মনে এলেও মুখে আনেনি।

আজ সুজাতা আবার বলতেই যেন হাতে স্বর্গ পেল। সুনীলার প্রকৃতির মধ্যে যে যে বিরক্তিকর বস্তুগুলো আছে, যার জন্যে সুনীলাকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয়, সেসব আর মনে পড়ল না। তবে পূর্বকথা স্মরণ করে একটু সামলে নিল। বলল, 'তা কিছুদিনের জন্যে বললেও হয়।'

আজও নীলেন্দু 'কিছুদিন' শব্দটাই উল্লেখ করল। কিন্তু সুজাতা করল না। সুজাতা বিচিত্র একটা হাসির ভঙ্গী মুখে ফুটিয়ে বলল, 'কিছুদিন ?'

নীলেন্দু এসব কথায় ভয় পায়। ভয় পায়—মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে পরিহাসে। হয়তো সব পুরুষই ভয় পায়। মেয়েরা অবলীলায় যে-কথা বলতে পারে, পুরুষ তা শুনতেও বিব্রত হয়। তাই নীলেন্দু ওই বিচিত্র হাসির প্রশ্নটা শুনতে না-পাওয়ার ভান করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তাহলে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিই ? না কি খামই দেব ?'

যেন ওই খাম আর পোস্টকার্ডের সমস্যাটাই প্রধান সমস্যা !

সুজাতা চোখ বুঁজে বলল, 'যা বোঝো করো।'

হ্যাঁ, এখন ওই ধরনের কথাই বলে সুজাতা। এখন ভুলে গেছে প্রত্যেকটি কথাতেই সে নীলেন্দুকে বলতো, 'তুমি থামো তো ! তুমি কি বোঝো ?' বলতো, 'তুমি যা বুঝবে, তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার !'

এখন নীলেন্দু 'যা ভাল বোঝো' !

নীলেন্দু ভাল বুঝে একখানা খামেই চিঠি দিল তার মামাতো-দিদি সুনীলাকে। সুজাতার অবস্থা বুঝিয়ে মিনতি করে।...আবার চালাকিও করল একটু। লিখল, 'সুজাতা তো অসুখে পড়ে পর্যন্ত তোমার কথা বলছে, আমিই বলেছি, কেন আর ওকে কষ্ট দেওয়া ! তুমি তো বলতে গেলে সংসারত্যাগী বৈরাগিণী ! তোমাকে কেন আর ? সুখের সময় মনে পড়ে না, মনে পড়ে শুধু অসুখের সময় !'

যে-কথা সুনীলা ভাববে, ভাবতে পারে, সেটাই নিজে থেকে লিখে নিজেকে সাফাই করে রাখে।

বাস্তবিকই আবাল্যবিধবা সুনীলা নীলেন্দুর মাতৃকুলে ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো। যার সংসারে যখন অসুবিধে পড়ে, তখন সুনীলাকে স্মরণ করে। তখন তোয়াজও করে। আবার সংসারের অবস্থা সহজ হয়ে এলেই আড়ালে মন্তব্য শুরু হয়, 'বাবা ইনি যে আর নড়তে চান না!...উনি কি ভেবেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এখানে আনা হয়েছিল ওঁকে?...বাবা, কি করে এখন স্বস্থানে প্রস্থান করানো যাবে?'

এসব মন্তব্য কি শুধু মানুষ অকৃতজ্ঞ বলে? না, অতটা দোষ মানুষকে দেওয়া সঙ্গত হয় না। সুনীলার 'গুণ'ই ওই সব আত্মীয়কুলকে অকৃতজ্ঞ জীবে পরিণত করে।

সুনীলার এক মস্ত গুণ পরের সংসারকে নিজের মত ভাবা সেই গুণে সুনীলা প্রথমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর অপর্যাপ্ত আদর পায়, আর ক্রমশঃ দু'চক্ষের বিষ হয়।

ভরানদীর স্রোতে পড়লে লোকে পচা বাঁশখানাকেও বুকে ধরে। তা' বলে ডাঙায় উঠে তো সেখানা বুকে বেঁধে বেড়াতে পারে না?

অবিলির বাড়িতে সুনীলা যখন এসে পড়ে সংসার মাথায় করে, তখন ধন্যি ধন্যি পড়ে। কিন্তু নির্বোধ সুনীলা সংসারের বিলিব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পরও সংসারকে মুঠোয় রাখতে চায়। সেই মাতব্বরি, সেই মুরুব্বিয়ানা কে পারে সহ্য করতে?

নীলেন্দুর মার শেষ অসুখের সময়ও সুনীলাকে আনতে হয়েছিল। না এনে উপায় ছিল না।

সুজাতার কোলে তখন শুভেন্দু মাসকয়েকের বাচ্ছা। নীলেন্দুর মা তো সুনীলার পিসি, পিসির সেবাযত্ন করবে, আশ্চর্যের কিছু নেই।

না, আশ্চর্য হয়ে যাবার মত ক্যাপাসিটি সুনীলা অনেক দেখালেও

তখন কেউ আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হল, যখন দেখা গেল পিসি মরে যাবার পর, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পরও রয়েই গেল সে। ফিরে যাবার কথা উচ্চবাচ্য করল না।

পিসির পরিত্যক্ত ঘরটায়, পিসির শোওয়া চৌকিতেই শোয়, পিসির রান্নার সেট্‌টাতেই রাঁধে খায়। আর বাকী সময়টা চরকি ঘোরে। তখন চাকর ছিল না, একাধারে গৃহিণীর এবং ভৃত্যের, রাঁধুনীর এবং ধোবার পার্ট নির্ভুল উতরে নিয়ে গিয়েছে সুনীলা। মনে হয়নি কোনদিন এ বাড়িতে ছিল না সে।

কিন্তু ক্রমশঃ তো সুজাতার কোলের বাচ্ছা দাঁড়াতে শিখল, আর শাশুড়ী থাকাকালীন যে যে বাসনার ফুলগুলি তার কোরকের রূপে ছিল সেগুলি বিকশিত হবার জন্যে আন্দোলন শুরু করে দিল।

অতএব সুজাতা আড়ালে বরকে বলবে না কেন, 'সুনীলাদি কি তা'হলে এখানে মার পোস্টটাই দখল করবেন স্থির করেছেন? তুমি কি আনবার সময় পার্মানেণ্ট পোস্টের আশ্বাস দিয়ে এনেছিলে?'

তবে এরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভদ্র। মুখোমুখি কিছু বলেনি, যা কিছু আড়ালে। তা তখন এদের বিধি তেমন বাম ছিলেন না, হঠাৎ একদিন বিনা চেষ্টাতেই আগাছার গাছটা নির্মূল হল।

সুনীলার নিজের ভাইয়ের বসন্ত হল। চলে যেতে হল সুনীলাকে।...

সেখানের ইতিহাস কিন্তু সংক্ষিপ্ত।

মাত্র মাস দুই পরেই শোনা গেল সুনীলা নাকি বাপের বাড়ীর দরজায় গোড়ালি ঠুকে বলে গেছে, 'আর যদি কখনো এ ভিটেয় পদার্পণ করি তো আমি'—ইত্যাদি।

তদবধি সুনীলা বস্তিবাটিতে শ্বশুরের ভাঙা ভিটেয় গিয়ে বসবাস করছে। ভাসুরপোরা কুড়িটা করে টাকা পাঠায়, ভাগ্নে না কে মাঝে মাঝে কিছু দেয়। আর নীলেন্দুও মামাতো দিদির বিদায় হওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দশ টাকা করে মনিঅর্ডার করে।

হয়তো সেই মনিঅর্ডারের রসিদগুলিই অসময়ে স্মরণ করার পক্ষে বুকের বল।

সুনীলা এল।

এই আট বছরে সুনীলা দেখতে ডবল বুড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, সুনীলার স্বভাবে বার্ধক্য আসেনি। গাড়ি থেকে নেমেই সুনীলা এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চাকরবাকরকে ডাকহাঁক শুরু করে দিল যে, মনে হওয়া স্বাভাবিক এখুনি শুধু গঙ্গা নেয়ে ফিরেছে সুনীলা।

তুলসীগাছের গয়াপ্রাপ্তি নিয়ে বেশ কটু কড়া মন্তব্য করলো গাছটাকেই উদ্দেশ করে, রান্নার শেষেও উনুনটা কেন এক বুক কয়লা নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরছে তার কৈফিয়ত চাইল ঠাকুরের কাছে, এবং 'রোসো তোমাদের সবাইয়ের মজা দেখাচ্ছি আমি! ভারি স্বরাজ পেয়েছ না?' বলে সকলের মনের উপর একটি ইনজেকশনের ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখে নাইতে গেল।

নেয়ে এসে ভিজে কাপড়ে রোগীর ঘরে ঢুকবে। তা'তে দু'পক্ষেরই বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে। নিষ্ঠাবতী বিধবার কাছে রোগী অস্পৃশ্য, রোগীর কাছে বাইরের ধুলো অস্পৃশ্য, এই জটিল সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান হচ্ছে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র।

সুজাতা অনেকক্ষণ থেকে সাড়া শব্দ পাচ্ছিল, আর এই ঝিমিয়ে-পড়া বাড়িতে হঠাৎ প্রাণের এই ধ্বনি ভালই লাগছিল তার। একদা যে ওই মানুষটাকে বিষ লেগেছিল, তা মনে পড়ছিল না। অভ্যর্থনার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি করছিল।

তবু ঘরে ঢুকতেই প্রথম কথা বলল, 'ভিজে কাপড়? শীত করছে না?'

প্রায় শিউরেই বলল।

সুনীলা নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে, 'নাও কথা! ভূতের আবার জন্মদিন! বলি তোর একী হাল হয়েছে? একেবারে যে নিজেকে শেষ করে

বসে আছিস! বলি—এতদিনে দিদিকে মনে পড়ল? কেন সময় থাকতে ডাকলে কী হতো?'

সুজাতা সেই হাড়বারকরা হাঁ-বড়-হয়ে-যাওয়া মুখে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, 'এই তো ঠিক সময়েই ডাকলাম। তোমার হাতে সংসারটা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো।'

সুনীলা 'ষাট্ ষাট্' করে উঠল, তবু কেন কে জানে, তার সর্বাঙ্গে যেন একটা অজানা স্বাদের রোমাঞ্চ জাগল! সংসারের কন্না করবার জন্যে অনেকে ডেকেছে সুনীলাকে, সংসারটা তার হাতে তুলে দেবার জন্যে তো কেউ কোনোদিন ডাকেনি?

'পাকা পাকা কথা কসনে বাপু, গা জ্বলে যায়। রোগ মানুষের হয় না?' বলে জোর একটা আশ্বাস দিয়ে রোগীর ঘর থেকে সরে সংসারকে হাতের মুঠোয় আনবার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগের সাধনা শুরু করল সুনীলা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবার সুজাতা ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া একটা জগতের বার্তা পেতে থাকে।···শুনতে পায়, অন্ততঃ ছমাস নাকি ঝুলঝাড়া হয়নি বাড়ির, খাবারের টেবিলের ওপরে নাকি দশ-বিশ দিনের তরকারির দাগ মাখামাখি, হাঁড়ি-কড়ার তলার দিকগুলো নাকি ইহজীবনে আর মাজা হয় না, উঠোনে তিন ইঞ্চি শ্যাওলা, রান্নাঘর দেখে কান্না আসছে, এবং ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরকে 'গড়' করবে কি ঘরটাকেই 'গড়' করতে ইচ্ছে করছে!..

'তবু ভাঁড়ার ঘরে এখনো ঢুকিনি—।'

সুনীলার উচ্চগ্রামের ঘোষণা শোনা যাচ্ছে, 'ভয়ে ঢুকছি না! বলি তোরা মানুষ না ভূত রে? মায়ের নয় অসুখ করেছে, তোরা তো আর মরিসনি?'

বলা বাহুল্য টার্গেট সেই বালকভৃত্য ছটি। যারা এই একবেলাতেই সভয়ে সিদ্ধান্ত করছে এ বুড়ি থাকলে আমরা পালাবো!

নীলেন্দু এ ঘরে এসে চুপিচুপি বলে, 'সুনীলাদি যা শুরু করেছে, ছোঁড়াদুটো না পালায়!'

সুজাতা গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে।

বলে, 'পালালেও কোনো দুঃখু নেই ওঁর! এ সংসার উনি একাই হেলায় করতে পারেন।'

'তা' যা বলেছ। এই একদিনেই বাড়ির চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার তো লজ্জাই করছে এতদিন এই অবস্থা করে রাখার জন্যে।'

'তুমি আর কি করবে!'

আর একটা নিশ্বাস পড়ে সুজাতার।

সুনীলার কিন্তু নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। সুনীলা শেষরাত্রে ওঠে, মাঝরাত্রে শোয়। রাঁধুনীটাকে তাড়িয়েছে, বলা যায় না চাকরটাকেও সেই পথে পাঠাবে কিনা। সুনীলা শুভেন্দুকে হাতে তুলে নিয়েছে, নিয়েছে নীলেন্দুকে। ওদের যে কখন কি প্রয়োজন, ওদের আগে সুনীলা জানে।

সুনীলা যেন এক নতুন রসে ভাসছে। নিজের বলে কোনো সংসার কখনো ছিল না সুনীলার, পরের সংসারে খেটেছে, কিন্তু এমন নিঃসপত্ন রাজ্য কোথায় পেয়েছে?

সুজাতার আমলে কখনো এ বাড়িতে বড়ি দেওয়া হয়েছে বলে মনে পড়ে না, মনে পড়ে না আচার আমসত্ত্বের-তত্ত্ব।...গুল-ঘুঁটের কথাই বা কে কবে ভেবেছে?...এত রকমের যে রান্না আছে তাই বা কে জেনেছে?

খাবার লোক বলতে তো নীলেন্দু, আর সুজাতার নার্সটা। ইদানীং যাকে রাখা হয়েছে। সুনীলা যদিও বলেছিল, 'আবার লোক পোষা কেন? আমি থাকতে?'

ডাক্তারের নির্দেশ জানিয়েছে নীলেন্দু। অসুখটা পুরনো, সুনীলা রান্নাবান্না করে। না ছোঁওয়াই ভাল। অতএব রান্নার পদই বাড়ায়

সুনীলা। সুজাতাও অবিশ্যি খায় কিছু কিছু। বলে, 'মুখটা ছাড়ল!' সুনীলা মহোৎসাহে পরদিন আরো বেশী ব্যবস্থায় মন দেয়।

নাস মানে মেয়েমানুষ।

এবং মেয়েমানুষের পক্ষে পরিস্থিতি বুঝতে একবেলাই যথেষ্ট। সুজাতার নার্স বলে, 'এই জন্যেই বলে, 'অতিঘরন্তি না পায় ঘর।' কী বলেন বৌদি? এহেন ঘোরসংসারী মানুষের আপন সংসার বলতে কিছু নেই!'

সুজাতা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'থাকলেই কি ভোগ করা যায়?'

সুজাতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, নীলেন্দুর গালে মাংস লেগেছে, নীলেন্দুর চেহারায় আগের চাকচিক্য। আর কোনো সময় ময়লা গেঞ্জি পরতে দেখা যায় না নীলেন্দুকে অথবা ময়লা পাজামা!

আর শুভেন্দু তো রীতিমত মোটাই হয়ে গেল। মার অসুখের পর থেকে সেই যে একটা হতাশ হতাশ অসহায় ভাব দেখা গিয়েছিল তার, সেটা অন্তর্হিত হয়েছে। উৎফুল্ল দুরন্ত বালকের পর্যায়ে ফিরে এসেছে সে।

সুজাতা বিছানায় পড়ে পড়ে শোনে শুভেন্দুর উচ্চরব—'পিসি পিসি পিসি'!

সুজাতা কি হিংসুটে? সুজাতার কানে সে উৎফুল্লধ্বনি মধুবর্ষণ করে না। কানে মধুবর্ষণ সুনীলারই করে।

সুনীলার বুক ভরে ওঠে।

সুনীলা মনে মনে বলে, 'ভগবান, তুমি যে আমার জন্যে এত রেখেছিলে তা তো জানতাম না!'

সুনীলা সংসার পেয়েছে, সন্তান পেয়েছে, একটা 'কর্তাপুরুষের' ভাত-জলের অধিকার পেয়েছে। সেই পুরুষটা তার ছোটভাই মাত্র, তাতে কি? ভাই জিনিসটাই কি কম? মুখাপেক্ষী তো? 'দিদি দিদি' করে হাপসে পড়ে তো?

এসবের স্বাদ কবে পেয়েছে সুনীলা ?—'আমি ছাড়া এদের আর কেউ নেই'।

এ কী অনাস্বাদিত আনন্দরস !

'শেষপর্যন্তই আমাকে ওদের দরকার হবে', এর তুল্য রোমাঞ্চ আর কি আছে ?

আমাকে আর কেউ অবান্তর ভাববে না, আমাকে বিদায় করবার ছুতো খুঁজবে না, বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে আমাকে বোঝাবে না 'তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে'।

ঈশ্বর, তুমিই ধন্য।

'এবার তবে আমাকে হাসপাতালে দাও।' সুজাতা বলে, 'এতদিন ভাবতাম বিছানায় শুয়ে শুয়েও বুঝি আমি তোমাদের দেখছি, এখন তো আর দেখার প্রশ্ন নেই।'

হাসপাতাল !

হাসপাতালের কথা এর আগে ডাক্তার বলেছে, নীলেন্দু বলেছে। বলেছে, 'কত নতুন নতুন অষুধ আবিষ্কার হয়েছে, কত নতুন নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি, গেলেই সেরে উঠবে।'

সুজাতা কাতরতা প্রকাশ করেছে।

সুজাতা বলেছে, 'সেরে যে উঠব না সেকথা তুমিও জান আমিও জানি, আর কোথায় মরতে যাবো ? বাড়িতেই মরি।'

এটা নির্বোধের উক্তি। এর বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডন আছে। তবু বড় সূক্ষ্ম জায়গা, বেশী বলা যায় না। আজ সুজাতা নিজেই বলল। অতএব বর আর ডাক্তার লুফে নিল কথাটা। যাত্রার আয়োজন শুরু হল।

শুনে সুনীলার বুকটা কাঁপতে থাকে। ভয়ে নয়, আনন্দের বেদনায়। রোগের বিছানায় পড়ে থাকুক, তবুও একজোড়া চোখ ! সে চোখকে সমীহ করতে হয় বৈকি। কিছুতেই তো ভোলা যায় না ওরই সংসার ! এবার আর মনে রাখতে হবে না সে কথা।

শোওয়া রুগী! তা হোক—

যাবার সময় সুনীলা সিঁদুর ছুঁইয়ে দেয়। বলে, 'হলেই বা শরীর খারাপ, এয়োস্ত্রী মানুষ বাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছে!'

সুজাতা বলে, 'হ্যাঁ, জন্মের মতোই তো যাচ্ছি।'

'ষাট ষাট'—সুনীলা ধমকায়। 'কথার কী শ্রী? স্বামীপুত্তুরের কথা ভাবছিস না?'

সুজাতা যাত্রাকালে দুষ্টুমির হাসি হাসে।

'ওদের তো তোমায় দিয়ে দিয়েছি। ওরা তোমার। এই ঘরবাড়ি জিনিসপত্তর সবই তোমার রইল সুনীলাদি! জানি ওদের অযত্ন হবে না।'

সুনীলা রাগ দেখায়।

বলে, 'ভাল হবে না। সেরেসুরে ফিরে সংসার বুঝে নিয়ে আমায় ছুটি দিবি, এই প্রার্থনা।'

কিন্তু সত্যিই কি সুনীলার সেই প্রার্থনা? সুনীলা তো জানে কোন্ রোগের কী পরিণাম, কোন অবস্থার কী ফল! সুনীলা কি জানে না, ফিরে এসে কোনোদিনই আর নিজের জিনিস ফিরিয়ে নেবে না সুজাতা?

তবু বলতে হয়।

বলার জন্যেই বলা।

ওইতো নীলেন্দু কাঁদছে, সুজাতা কাঁদছে, শুভেন্দু কাঁদছে। বেঁচে থেকে চির বিদায়ের এই দৃশ্য বড় করুণ!

তবু।

মনের অগোচর পাপ নেই।

খুব মধুর একটু নিশ্চিন্ততাও।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত নীলেন্দু বলে, 'তুমি না হলে কী যে হত সুনীদি, ভাবাই যায় না। শুভোটাকে তো বাঁচানোই যেত না।'

সুনীলা সাবধানে বলে, 'সবই ভগবানের খেলা !'

ভগবানের খেলা বৈকি। খেয়ালের খেলা।

নইলে কেন সারাজীবন মরুভূমির বালিতে ফেলে রেখে এই প্রায়-প্রৌঢ়কালে সুনীলাকে কাকদিঘির মালিকানাটা দিয়ে বসলেন তিনি ?

শুধুই কি রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীত্ব? আর এক পরম ঐশ্বর্য নেই ?

বিপত্নীক পুরুষ, আর মাতৃহারা শিশুর মত এমন অগাধ ঐশ্বর্য আর কি আছে, সুনীলার মত চিরবঞ্চিত বালবিধবার কাছে ?

বিপত্নীক ? মাতৃহীন ?

তাছাড়া আর কি ?

একটা টেলিগ্রাম আসতে যা দেরি !

সুনীলা সেই টেলিগ্রামের অপেক্ষা করে।

পিয়নের গলা শুনলেই সুনীলার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে। সুনীলা তাড়াতাড়ি মনে করে নেয়, রাতের জন্যে কতখানি মাছ মাংস রাঁধা আছে ভাই আর ভাইপোর জন্যে। সেগুলো তো যাবে।

কিন্তু টেলিগ্রাম এল না। এল চিঠি।

আর অবাক হয়ে শুনতে পেল সুনীলা, নীলেন্দু উৎফুল্ল গলায় বলছে, 'দিদি, দিদি, খুব ভাল খবর আছে। ওকে যে অপারেশনটা করা হয়েছিল, অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে তার। খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্ছে। ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেছেন নাকি !'

সুনীলা একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাকায়, তারপর দৃষ্টিটা তার করুণ হয়ে আসে। ভাবে, 'আহা এতবড় বয়সটাই হয়েছে। একেবারে অবোধ, বুঝছে না নেভার আগের প্রদীপ !'

আবার চিঠি আসে।

নালেন্দু বিগলিত আনন্দে বলে, 'দিদি, নিজে চিঠি দিয়েছে,

লিখেছে খুব নাকি ওজন বেড়েছে, ডাক্তাররা ওকে বলছে আপনি আমাদের একটি আশ্চর্য রেজাল্ট।······পড়তে পারো চিঠিটা—'

সুনীলা শুকনো গলায় বলে, 'হাসপাতাল-ফাসপাতালের চিঠি, ও আর কি নাড়াঘাঁটা করবো, শুনলাম তো!'

একদিন শুভেন্দুর নামে চিঠি আসে। ছুটে আসে সে, 'পিসি, মা আমায় চিঠি দিয়েছেন।'

সুনীলা কঠিন গলায় বলে, 'মার আর আদিখ্যেতার শেষ নেই। পড়ে কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়ো!'

এই বছরখানেক আগেও যে সুজাতা এই সংসারেই ছিল, ওই রোগ নিয়েই ছিল সে আর মনে পড়ে না সুনীলার। ······বলে, 'ওই ভাল থাকার দৃষ্টান্ত ঢের দেখলাম! বাঁচবেন তো কত! মিথ্যে আশার ছলনা!'

সুনীলা জানে সত্যি কি ঘটবে।

সুনীলা সেই সত্যের পদধ্বনির আশায় দিন গোনে।······মাসের পর মাস!

অবশেষে শোনা যায়। আসে একদিন টেলিগ্রাম।

সুনীলা শুনতে পায় পিয়নের হাঁকের পর নীলেন্দুর গলা!······ সুনীলা ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়ে বলে, 'ঠাকুর আমার দোষ নেই, তুমি যা করেছ!' তারপরই হঠাৎ কান খাড়া করে কী যেন শোনে।

বকশিশ?

বকশিশ দিচ্ছে নীলেন্দু পিয়নকে। নীলেন্দু কি হঠাৎ আশাভঙ্গের শোকে পাগল হয়ে গেল? তা পাগলের মতই উল্লসিত হয়ে আসছে নীলেন্দু, 'দিদি, ডাক্তার বলেছে সামনের মাসে ছেড়ে দেবে! আর ভয়ের কিছু নেই, এখন শুধু—'

সুনীলা নিস্পৃহ গলায় বলে, 'সুখের কথা! আহ্লাদের কথা! কিন্তু আমাকেও তো এবার ছাড়তে হবে নীলু?'

'তোমাকে ছাড়তে!'

নীলেন্দু হাঁ হয়ে তাকায়, 'তোমায় ছাড়তে হবে কি?'

সুনীলা আরো নীরস গলায় বলে, 'তা' চিরকাল কি আমি তোমার সংসার আগলে বসে থাকবো? ভাঙা হোক, গুঁড়ো হোক, শ্বশুরের ভিটের একখানা ঘর তো আছে, তাকে একেবারে ফেলে দিলেই বা চলবে কেন?'

নীলেন্দুর মুখটা কি নীল হয়ে গেল?

না পাঙাস?

যা হয় হোক! নীলেন্দুর মুখের দিকে আর তাকিয়ে দেখবে না সুনীলা। যারা তাকে এমন ভয়ঙ্করভাবে ঠকিয়েছে, তাদের কার মুখের চেহারা নীল হয়ে গেল না পাঙাস হয়ে গেল, তা' দেখবার দরকার নেই সুনীলার!

নতুন নামে

ঝুনুকে আমি তার ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। যখন সে রঙবেরঙের ফ্রকও ধরেনি, মায়ের শখে ছেলেদের মত কখনো জাঙিয়া আর 'সামারকুল' গেঞ্জি পরে, কখনো ঢোলা পায়জামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেদের মতই চুল ছাঁটা।

ঝুনুর বাবা সুকান্ত সেন সেই তখন এ পাড়ায় এসে বাসা বেঁধেছিল। কোন্ গ্রহ-নক্ষত্রের খেলায় কে জানে, ঝুনু প্রথম দর্শনেই আমার প্রেমে পড়ে বসলো। সেই প্রেমের চাহিদা মেটাতে আমাকে সদা সর্বদা টফি চকোলেট আমসত্ত্ব কাজুবাদাম মজুত রাখতে হ'ত। দেখা হ'লেই ঝুনু আমার হাত কাঁধ যেটা ধরতে পারতো, ধরে ঝুলে পড়ে বলতো, 'আজ কি আছে?'

তারপর তো ক্রমশঃ ঝুনু ফ্রক ধরল।

বহুবিধ। তার সঙ্গে ধরল কোঁকড়া চুলে ফিতে বাঁধতে। ওর মা ওকে সর্বদা ফুলটির মত করে সাজিয়ে রাখত। রঙিন প্রজাপতির মত ফুরফুরে এক ঝাঁক মেয়ের দলে পার্কে খেলতে আসত ও সবচেয়ে জৌলুস নিয়ে।

তখন ঝুনু বেজায় পাকা পাকা কথা বলতো।

বেজায় ভাল লাগত শুনতে।

ফ্রক ছাড়ার পর ঝুনু কিছুদিন সালোয়ার পাঞ্জাবি পরে গলায় ওড়না দুলিয়ে বেড়াতে লাগল, আর পাকা পাকা কথা ছেড়ে ন্যাকা ন্যাকা কথা ধরল।

তখন যেন তেমন ভাল লাগত না ঝুনুকে।

কি জানি কেন ওই 'হাফ্‌তরুণী' মেয়েগুলো আমার চিরকালের অসহ্য। ওই যে ওরা 'এইমাত্র মাটির পৃথিবীতে নামলো' গোছের মুখ নিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে আদুরে আদুরে কথা কয়, অথচ

চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলায়, ওটা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না।

ঝুনু যখন ওই পর্যায়ে, তখন ঝুনুর সঙ্গে আমার তেমন লেনদেন রইল না। কিন্তু বেশীদিন নয় সেটা। ওটা একটা হাওয়া লাগা মতন অবস্থা হয়েছিল। পার্কের সেই এক ঝাঁক প্রজাপতির মত ফুর ফুরে বাচ্চাগুলো ইত্যবসরে এক দঙ্গল হাফ্‌তরুণী হয়ে উঠেছিল কিনা।

শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠল ঝুনু। লেখা-পড়াতেও দস্তুরমত ভাল হতে থাকল ক্রমশই। তখন আর ঝুনু পাকাও রইল না, ন্যাকাও রইল না, শুধু যেন একটু রোখা হয়ে উঠল। অর্থাৎ 'জেদ' নামক জিনিসটা একটু বেশী মাত্রাতেই দেখা দিল।

সুকান্তর একান্ত ইচ্ছে ছিল ওর মেয়ে আর্টস নিয়ে পড়বে, ঝুনু বাবার কথা হেসে উড়িয়ে সায়েন্স নিল। ঝুনুর মায়ের ইচ্ছে ছিল না তার অমন লাবণ্যবতী মেয়েটি বইয়ের বোঝা বয়ে বয়ে আর রোদে জলে কলেজ যাওয়া আসা করে শুকিয়ে যাক, বুড়িয়ে যাক, লাবণ্য ফুরিয়ে ফেলুক। তাই ঝুনু কলেজে উঠতে না উঠতেই তার মা পাত্র খুঁজতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঝুনু মায়ের বাসনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বি-এ তে অনার্স নিল, এম-এ পড়ল, ফার্স্ট ক্লাস নিল, রিসার্চ করতে শুরু করল।

তবু বলবো ঝুনুর মা মীনা সেন যতই আক্ষেপ করুক, আর সুকান্ত সেনকে যতই গঞ্জনা দিক, রূপ-লাবণ্যে বিশেষ কিছু ঘাটতি দেখা গেল না ঝুনুর। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, রূপেও ঝুনু পাড়ার সেরা মেয়ে হ'য়েই বিরাজ করতে লাগল।

পাড়ার ফাংশানে ঝুনু প্রধানা, পাড়ার সার্বজনীনে ঝুনু প্রধানা, পাড়ার ছেলেদের হৃদয় মন্দিরে ঝুনু প্রধানা। এই কিছুদিন আগেও যে ছেলেগুলো হাফ্‌প্যান্ট পরে পার্কে বল খেলতো, তারা তো সকলেই প্রায় লায়েক হয়ে উঠেছে, অনেকেই বেশ কেষ্ট বিষ্টুও হয়ে উঠেছে।

কাজেই 'হৃদয়-মন্দির'ও গঠিত হয়েছে প্রায় সকলেরই। তবে মাল্টা তেমন জুটছে না কারুরই।

পার্ককেন্দ্রিক পাড়াগুলোর এই এক অসুবিধে, ওই যে সবাই হাফপ্যান্ট পরা, বেবিসুট পরা অবস্থা থেকেই দেখেছে, দেখে নিয়েছে, সেই কারণে এখন তারা যতই 'টাই' এঁটে অফিসে যাক, তাদের সেই ডাকনামগুলো আর ঘোচে না। 'বিদেশ' ঘুরে না আসা পর্যন্ত পোঁছেই না কেউ।

পার্কবর্জিত পাড়ায় ঠিক এ রকমটা হয় না।

অবিশ্যি পার্কের পাড়ায় প্রেমের চাষ হয় না এ কথা ভুল, চাষ যথেষ্টই হয়, কিন্তু সে নেহাতই পাতাবাহারের। শাখা-প্রশাখা সংবলিত 'বৃক্ষ'র দেখা কদাচিৎ মেলে। বলতে গেলে মেলেই না।

তাই ঝুনু একদিন যখন পাড়ারই একটা ছেলের সঙ্গে বেশ একখানি প্রেমে পড়ে বসল, নিজে সে তাকে মহীরুহ মনে করলেও আসলে স্রেফ পাতাবাহারই।

মীনা সেন আর সুকান্ত সেন একদিন এসে 'হাপসে' পড়ল। বলল, 'শুনেছেন কাণ্ড?'

বললাম, 'শুনেছি বৈকি।'

'এখন বলুন মা বাপ হয়ে ঐতে প্রশ্রয় দেব? ঐটে কি ঝুনুর যুগ্যি?'

'যুগ্যি' কি না সে তর্ক তুললাম না।

কারণ জানি আগে যেমন লোকে নিজের বুদ্ধি আর পরের টাকা বেশী দেখত, একালে তেমনি লোকে 'নিজের নাম আর নিজের মেয়ের দাম' অতিরিক্ত বেশী দেখে। সন্দেহ প্রকাশ করলে ক্ষ্যাপে।

তাই তর্ক না তুলে বললাম,—'পাগল! কিসে আর কিসে? কিন্তু ঝুনুকে তো আমি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই জানতাম!'

'এই একটি জায়গায় সব ছেলে মেয়েই ভোঁতা।'

'তা' ও কি বলে? বিয়ে করতে চায়?'

'তাই বা কই?' মীনা সরোষে বলে, 'তাহলেও তো বুঝলাম একটা কিছু হল, একটা ব্যবস্থা করবার স্কোপ পেলাম। তাও না। কেবলই বলে, এক্ষুণি বিয়ের কথা তোলবার দরকার কি আছে?'

'বল কি?' তোলবার দরকার নেই!

'তবে আর দুঃখ করে মরছি কেন?'

'বেশ না হয় এখন না হ'ল, ওকেই করবে তো?'

'ঈশ্বর জানেন—' মীনা সেন ঠোঁট উল্টোয়, 'আর ওরাই জানে। অথবা ওরা নিজেরাও জানে না!'

তা' মীনা সেনের কথাটা ফেল্‌না নয়।

ওরা নিজেরাই জানতো না।

জানতে পারে নি।

'মন' নামক বস্তুটাকে নিয়ে তো তলায় না—এ যুগের মেয়ে ছেলেরা? শুধু সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই সবই ওদের ভাসা ভাসা। মাটির নিচে শিকড় নেই ওদের!

সে যাক।

না থাকুক গে। এখন সমস্যাটার সমাধান হয় কি করে? অত বড় বড় মেয়েছেলেকে "ইদিক উদিক চাইবি না" বলা চলে না। যদি বা লেখা পড়ায় একটু গাড্ডু খেত তো, সেই খোঁটা তুলে ধমক দেওয়া যেত। তাও না। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে যে পরীক্ষার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তা তো নয়। ওদিকে ঠিক আছে। ঝুনুতো ওরই মাঝখানে থিসিস সাবমিট করে ফেলে 'ডি-ফিল' হয়ে বসল।

ভেবেছিলাম অতঃপর বিয়েটা লাগবে।

কিন্তু দেখা গেল, একজনের লাগল, একজনের নয়। সেই ছেলেটাদের বাড়ির ছাতে একদিন ম্যারাপ বাঁধা হ'ল, বাড়ির সামনে বিস্তর আলো জ্বলল, আর আশ্চর্যের কথা পাড়ার প্রধানা ঝুনু সেই ফাংশানেও প্রধানা রূপেই সাজে সজ্জায় কথায় হাসিতে ঠিকরে বেড়ালো।

চুপি চুপি বললাম 'ঝুনু ব্যাপার কি বল তো ?'

ঝুনু বলল, 'দূর, ওটা আবার একটা মানুষ না কি ? ওআর্থলেস !'

তারপর আরও দু' চারটে 'অমানুষ'কে নিয়ে ঘুরল ঝুনু। ত্যাগও করল।

আর এরপরেই একদিন দেখলাম ঝুনু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চাকরি করতে যাচ্ছে। সুকান্ত সেনের ওই একটাই মেয়ে, আর সুকান্ত সেন ইদানীং টাকার 'আণ্ডিল' হয়েছে, অথচ অমন মেয়েটাকে বিয়ে না দিয়ে চাকরি করতে দিল।

আমাদের সেকেলে চোখ তো !

কেমন যেন ভাল লাগল না। মুশকিল !

'বিত্তের পাহাড় নিয়ে বসে থাকুক মেয়েগুলো' এটা বলতে সভ্যতায় বাধে, অথচ সমস্ত বয়েস কালটা কলেজের নোট আর অফিসের ফাইল চিবিয়ে কাটাক, এ ভাবতেও প্রাণ ফাটে।

মীনা সেনেরও প্রাণ ফাটছিল।

সে মেয়ের মতামত অগ্রাহ্য করে পাত্র খুঁজছিল, আর তলে তলে মেয়ের গহনা কাপড় দানসামগ্রা কিনে কিনে বাড়ি বোঝাই করছিল।

অবশেষে এক জায়গায় যখন কথা প্রায় পেকে এসেছে, আর ঝুনুর বাবা গডরেজের ফার্নিচারের অর্ডার দিয়েছে, সেই সময় ঝুনু একটা ছেলের হাত ধরে এসে এক গাল হেসে মা বাপকে প্রণাম করল।

অফিসেরই সহকর্মী।

এইমাত্র রেজিস্ট্রী করে এসেছে।

প্রণামের 'শক্'এ—সুকান্ত সেনের স্ট্রোক্ হয় হয় ! কোন মতে রক্ষে পেল সে যাত্রা মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে। মীনা সেন কাঁদল, হাত পা আছড়াল, তারপর আবার চোখের জল মুছে কোমর বেঁধে সামাজিক বিয়ের আয়োজনে লাগল। মেয়েকে বলল, 'রেজিস্ট্রী'র কথাটা চেপে যা, দু'চারটে দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক।'

না বল্লে কি করবে বেচারা !

কোন্ কাল থেকে মেয়ের বিয়ের ঘটার পরিকল্পনা চালাচ্ছিল। পাড়ার সবাইকে টেক্কা দেবার মতলব ভাঁজছিল।

তা যাক, ঘটার ত্রুটি হ'ল না।

হঠাৎ বড়মানুষের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে যতটা যা হবার সবই হ'ল। শাড়ির পাহাড় দেখে মনে হ'ল ইহজীবনে আর শাড়ি কিনতে হবে না ঝুনুকে, আর ফার্নিচারের বহর দেখে পাত্রপক্ষ থেকে বল্‌ল, 'দয়া করে ওগুলো আপনার বাড়িতেই রেখে দিন, আমাদের বাড়িতে জায়গা নেই।'

না, এটা তাদের বিনয় প্রকাশ নয়, নেহাত সত্যি কথা। জায়গা আদৌ নেই তাদের। ছাপোষা গেরস্থ, একান্নবর্তী পরিবার। ছেলেটা ডেক্রনের প্যান্ট আর নাইলনের শার্ট পরে অফিসে আসত, খুব চটকদার কথাবার্তা বলতো, চেহারাটাও বেশ আকর্ষণীয়। বাইরে থেকে ধরা যায় নি, বাড়িতে দানসামগ্রী তোলার জায়গা নেই, আর শার্ট প্যান্ট ওই একটাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সাবান জলে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে দেয়, সকালে গায়ে চড়িয়ে অফিসে আসে।

চালচলতি দেখে মনে হ'তো তুচ্ছ একটা কাজ যে করতে এসেছে সে, সেটা নেহাতই শখ করে। যেমন ঝুনু এসেছে। অতএব ছেলেটাকে সমগোত্র ভেবেছিল ঝুনু।

প্রথম ভুল ভাঙল বাড়ির জায়গা নিয়ে।

ঝুনু সেকালের ঘোমটা-টানা বৌ নয়, শিক্ষিতা, স্বাধীন। তাই সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ল, 'যদি ফার্নিচার রাখবার মত জায়গা নেই তো বৌ রাখবে কোথায়?'

বাড়িতে ডেক্রন নাইলন নয়, আধাসিল্কের লুঙ্গি আর হাতকাটা গেঞ্জি, তবু পুরুষের আত্মাভিমান বলে কথা।

বর বলল, 'সেখানে বাড়ির আরও দু'টো বৌ আছে।'

'আছে! ওকে কি থাকা বলে? অমন গোয়ালের গরু হয়ে থাকতে পারব না।'

বিয়ের আগে পূর্বরাগ করে করে সব রাগ-রক্তিমাই মুছে ফেলে এরা, তাই কথা কাটাকাটিটা বেশ রিয়ালিস্টিকই হল। বর বলল—'মনে রেখো আমিও এই গোয়ালেরই একটি গরু।'

ঝুনু বলল, 'তুমি ভণ্ড!'

বর বলল, 'তুমিও তাতে কম যাও না। মনে পড়ছে না, বলেছিলে তোমার স্বপ্নই আমার স্বপ্ন, তোমার সাধনাই আমার সাধনা—'

'মনে পড়বে না কেন? খুব পড়েছে। তবে, এ কথা বলিনি—তোমার গোয়ালই আমার গোয়াল।'

বর বলল, 'বলেছিলে, আমরা দু'জনে স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে—'

বলেছিল বটে।

ভুলে যাবার কথা নয়। লেকে, বোটানিকালে, সিনেমায়, রেস্তোঁরায়, অফিসের করিডোরে, চলন্ত ট্যাক্সীতে বহুবার বলেছে। তাই অস্বীকার করল না ঝুনু। শুধু নাক শিকেয় তুলে বললে,—'হ্যাঁ, বলেছিলাম। বলেছিলাম 'আমরা দু'জনে'—'আমরা বাইশ জনে' নয়। তোমার ওই মা, বাপ, কাকা, ঠাকুমা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি হাবিজাবি আত্মীয়দের না ছাড়লে আমায় পাবে না।'

বর বলল, 'এখনো ভেবে দেখ।'

ঝুনু বলল, 'ঢের ভেবে দেখেছি।'

তারপরও অবিশ্যি চলল অনেকদিন। এ যুগে বিয়ে ভাঙে বলেই সত্যি এক কথাতেই ভাঙে না। বর এসে এসে খোশামোদ করে। শ্বশুর শাশুড়কে সালিস মানে। সুকান্ত সেন বলে, 'আমি ও সবের মধ্যে নেই'—মীনা সেন বলে 'তা বাবা আমার মেয়ে যদি তোমাদের রাবণের গুষ্টির মধ্যে গিয়ে থাকতে না পারে?'

ও পক্ষেও অবশ্য মা বাপ আছে।

বাড়তি হাবিজাবিরাও আছে।

তারা বলল, 'ছেলেটার জীবন মহানিশা হবে! নে বাবা আলাদা একটা ফ্ল্যাটই নে।'

নিজেরাই তারা চেষ্টাবেষ্টা করে ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিল, বৌদি ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেল, দাদা চুপিচুপি—'দরকার পড়লে সাহায্য করবো—' আশ্বাস জানিয়ে বিদায় নিল।

অতঃপর মিটল বাধা। ঝুনু এইবারে বাপের দেওয়া সেই সব ফার্নিচার থেকে কিছু নিয়ে বিজয়গৌরবে পতিগৃহে বাস করতে গেল। হাস্যবদনে আমায় নেমন্তন্ন জানিয়ে গেল—'যেও আমার বাড়ি।'

আহ্লাদে ডগমগ করছে ঝুনু। মুখ দেখে বোঝা ভার—এম্. এ, ডি. ফিল। মাথায় এক ধ্যাবড়া সিন্দূর, কপালে ইয়া বড় টিপ। পায়ে মল, কোমরে গোট, কেমন যেন গাঁইয়া গাঁইয়া, শুনলাম ওই নাকি লেটেস্ট ফ্যাশান।

এই পর্যন্ত আমি এক নাগাড়ে দেখেছি ঝুনুকে। সেই জাঙিয়া গেঞ্জিপরা বয়স থেকে। কিন্তু দেখেছি, আর অবাক হয়েছি। বুঝতেই পারিনি কোথাকার মাটির রস আহরণ করে ওর মন পুষ্ট হচ্ছে।

তা' ঝুনুর নেমন্তন্নটা আর তখুনি তখুনি রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না আমার। হঠাৎ বেশ কিছুকালের জন্যে বাইরে যেতে হ'ল।

ফিরলাম বছর দেড়েক পরে।

আর ফিরে খোঁজ নেবার আগেই দেখা পেলাম ঝুনুর......ঘরের জানালা থেকেই দেখলাম।

সেই তার আশৈশবের পার্ক প্রদক্ষিণ করা রাস্তায় ধীরে ধীরে চলেছে ঝুনু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। মুখের সেই লাবণ্য অন্তর্হিত, ঠোঁটের রেখায় বিষণ্ণ ছাপ। পরনে এত সাদাসিধে শাড়ি ব্লাউজ যে, দেখে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কাঁটা দিল।

ছুটে নেমে এলাম।

ও ততক্ষণে বাসে উঠে পড়েছে।

ওদের বাড়ি গিয়ে বললাম—'ব্যাপার কি সুকান্ত ?'

সুকান্ত নীরবে কপালে হাত ঠেকালো।

তা হলে, যা ভেবেছি তাই।

বললাম 'কবে এমন হল ?'

সুকান্ত ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ওর মা বলতে পারবে।'

ওর মা বলতে পারবে !

এটা আবার কী ভাষা ?

তবে কি যা ভাবছি তা' নয় ?

না।

তা নয়।

মীনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সন্দেহভঞ্জন হ'ল। মীনা একেবারে ফেটে পড়ল। 'এতদিনে এলেন আপনি ! আপনাকেই যা একটু মান্‌তো, আর আপনিই এ সময়—'

মানে না যে ওরা কাউকেই, স্বয়ং ভগবানকেও না, সেকথা আর উচ্চারণ করলাম না। নিমপাতা বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভাল। শুধু কথার শেষ শোনবার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলাম।

মীনা সেনের অনেক আক্ষেপ অনেক হাত পা আছড়ানির মধ্যে থেকে এইটুকু আবিষ্কার করতে পারলাম বৈধব্য নয়, বিচ্ছেদ।

বরের সঙ্গে বনিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ঝুনুর, তাই—

অবাক হয়ে বলি,'কেন, আবার সেই রাবণের গুষ্ঠি এসে ওর ফ্ল্যাটে হানা দিল না কি ?

'না না। তারা কেন, তাদের কা সাধ্যি ! জামাই ! ওই জামাইটিই আমার একায় একশো। ত্যাঁদোড়ের শিরোমণি, অবাধ্যর রাজা। কোন বিষয়ে যদি ঝুনুর মতে চলবে !'

'আশ্চর্য তো ! তোমার অমন রূপবতী বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সামান্য একটা কেরানী ছোকরাকে কায়দা করতে পারল না ?'

'পারবে কোথা থেকে ? প্রতি পদেই যে মতবিরোধ। আমিও

বলেছি—ঠিক আছে, আমাদের মতন নিরুপায় তো নয়? লেখাপড়া শিখেছিস চাকরি করে খা।'

না বলে পারলাম না।

ফস্ করে বলে ফেললাম, 'তা' খাওয়াটাই তো শেষ কথা নয়?'

মীনা ভারী মুখে উত্তর দিল, 'তা আর কি করা যাবে? আগেকার দিনে ঘরে ঘরে কত বালবিধবাও তো থাকতো।'

বোধ করি একটু চমকেছিলাম। তারপর মনে পড়ল, না, চমকাবার হেতু নেই। নতুন কিছু নয়। আমার নিজের পিসিমাকেই তো দেখেছি স্বামী জীবিত সত্ত্বেও আজন্ম বাপ ভাইয়ের ঘরে পড়ে থাকতে! বিয়ের পরে না কি জানা গিয়েছিল পিসেমশাইয়ের বোনের অকুলীনের ঘরে বিয়ে হয়েছিল। সেটা তারা গোপন করেছিল। আমার ঠাকুরদা সেই পতিত ঘর থেকে জন্মেরশোধ মেয়ে নিয়ে চলে এসেছিলেন। বলেছিলেন 'বিধবা মেয়েও তো ঘরে থাকে।'

হঠাৎ মনে হ'ল চিরদিন আমার সেই পিসিমার ঠোঁটের কোণে অমনি একটা বিষাদ বিষণ্ণতার ছাপ আঁকা দেখেছি, এই একটু আগে যেমন দেখলাম।

মনে পড়ল প্রকৃতির নিয়মে না কি কোনও শূন্যস্থানই শূন্য থাকে না। নতুন কোন চেহারায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। বাল্যবিবাহ অতএব বাল-বৈধব্য উঠে যাবার পর ঘরে ঘরে পিসিমাদের যে জায়গাটা কিছুদিন শূন্য ছিল, এই ঝুনুরা সে জায়গাকে পূর্ণ করবার ভার নিয়েছে। শুধু বাপের বাড়ির সংসারের জাঁতাটাকে কাঁধে তুলে না নিয়ে অফিসের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিচ্ছে এরা। ভাইপো ভাইঝিগুলো ছিল পিসিমাদের অবলম্বন, এদের স্বাবলম্বনই অবলম্বন। এই যা।

চলে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বললাম—'কিন্তু ওদের সেই ভালবাসা?'

'সেই তো, সেইটিই তো হয়েছে 'কু'য়ের গোড়া—' মীনা

বিরক্তকণ্ঠে বলে, 'বলে বলে তো হদ্দ হয়ে যাচ্ছি। বলছি আইন যখন রয়েছে মিথ্যে কেন জীবনটা বরবাদ দিবি ?' আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। বলে কি না, 'দরকার নেই বেশ আছি।'

বেশ আছে !

ঝুনুর সেই হৃতসর্বস্ব চেহারাটা মনে পড়ল। তা' হোক, তবু ঝুনু 'বেশ আছে।' তবে আর বলবার কি আছে ?

বলতেই যদি হয়, শুধু এইটুকুই বলা যায়, 'বেশ' না থেকে উপায় কি ঝুনুর ? এতো আর পাষণ্ড সমাজপতিদের কাটা খালে ডুবে মরছে না ঝুনু ? ডুবছে স্বখাত সলিলে !

তা' বেচারার দোষই বা কি ?

হতভাগা বরটা যদি ওর মতে না চলে, ও কি করবে ?

হারজিত

'অ-সম্ভব' !

বিরক্তির রেখায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শ্রীলার সাদামাঠা মুখ। এমনিতে সাদামাঠা, শুধু হাসলে ভারি লাবণ্যময় দেখায়। আর নরম করে তাকালে হঠাৎ মনে হয় 'চোখদু'টি বড় সুন্দর তো !'

কিন্তু এখন শ্রীলা হাসছেও না, আর নরম চোখে আস্তে তাকাচ্ছেও না। এখন ভুরু পাকিয়ে বলছে 'অ-সম্ভব ! এটা সার্কাসের স্টেজ নয়, আর তোমারও তলওয়ারের আগায় হেঁটে বাহাদুরি দেখাবার দরকার নেই।'

তাই তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে ওর মুখটা। সোমেন কিন্তু দমছে না। সোমেনের যেন শ্রীলার বিরক্তিতে পরম কৌতুক। আর সোমেন যেন এইমাত্র পৃথিবীতে নেমেছে, পৃথিবীর ধুলোবালির খবর রাখে না। সেই অপাপবিদ্ধ মুখ নিয়ে সোমেন বলে, 'কী আশ্চর্য ! এতে বাহাদুরি নেবার কথা উঠছে কোথা থেকে ? আর তলওয়ারের আগাকেই বা টেনে আনছ কেন ? এ যে তিলকে তাল করা !'

'এটা তিলকে তাল করা হ'ল ?'

'তা' ছাড়া কি ? চারজনের যাওয়ার কথা ছিল, দৈবক্রমে দু'জনের যাওয়া হচ্ছে না। বাকী দু'জন যাবে। এই তো সাদা বাংলা। এর মধ্যে আছেটা কী ? যেটা একেবারে সহজ স্বাভাবি.., সেটাকে হঠাৎ জটিল করে তুলছ তুমি !'

শ্রীলা সোমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। কী এ ? কৌতুক, না যাচাই ? নাকি নিপাট সরলতা ? বোঝা যায় না। এমনিতেই সোমেনের মুখটা নিখুঁত আর কমনীয় কমনীয়। এখন যেন আরও মোলায়েম দেখাচ্ছে। তবুও শ্রীলার মুখটা তীক্ষ্ণই রইল। তবু শ্রীলা বলল, 'তোমার মতে এটা একেবারে সহজ স্বাভাবিক ?'

'নিশ্চয়ই ! আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না এযুগের মেয়ে হয়ে তুমি

হঠাৎ এত শুচিবাইগ্রস্ত হচ্ছ কি করে? এটাই অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে।'

'রাজ্যের লোককে ডেকে জিজ্ঞেস কর, কে এটাকে শুচিবাই বলবে—'

'রাজ্যের লোকের অভিমত নিয়ে ধুয়ে জল খেতে যাব না আমি, আমি আমার রাজা। আমি বলব এটা শুচিবাই। তা' ছাড়া—' সোমেন মনে পড়িয়ে দেয়, 'গতকাল যখন শুভময় বলতে এল ওর স্ত্রীর যাওয়া হবে না, তখন তো কই তুমি এমন আপ্‌সেট হয়ে পড়নি? সত্যি বলতে, আমার বরং মনে হল হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলে তুমি, হাড়ে হাওয়া লাগল তোমার।'

'চমৎকার!' শ্রীলা ঝলসে ওঠে, 'কথার কী শ্রী!'

ঝলসে ওঠে, সেটা মনকে চোখ ঠেরে। আসলে সোমেনের কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। হাড়ে হাওয়া লাগার মত অতটা না হলেও, মনে মনে সত্যিই রীতিমত স্বস্তি বোধ করেছিল শ্রীলা শুভময়ের স্ত্রী সুতপার যাওয়া হবে না শুনে।

সুতপাকে আদৌ পছন্দ করতে পারে না শ্রীলা। তার সর্ববিধ ব্যাপারে উন্নাসিকতা, সর্ববিধ আচরণে কৃত্রিমতা, আর উৎকট আধুনিকতা শ্রীলার চক্ষুপীড়াকর। নেহাত সোমেনের নিকটবন্ধু শুভময়ের স্ত্রী বলেই ভদ্রতার বন্ধুত্ব বজায় রাখা।

ভারত ভ্রমণের এই বাইশ দিনের প্রোগ্রামে সুতপাকে অহরহ কালের জন্যে সঙ্গিনী হিসেবে ভাবতে খুব খারাপই লাগছিল শ্রীলার। তা' ছাড়া জানে তো সোমেনের আতিশয্য! ওর তো সর্বদাই মনে হয় ওর বন্ধুপত্নীর সম্যক সম্ভ্রম রক্ষা করে উঠতে পারছে না শ্রীলা। তারা বেড়াতে এলে অথবা এরা বেড়াতে গেলে সোমেনের পরবর্তী প্রশ্নই হচ্ছে, 'আচ্ছা তুমি ওভাবে আন্তরিকতাশূন্য ছাড়াছাড়া মত কথা বলছিলে কেন শুভময়ের বৌয়ের সঙ্গে?'

তাই তার যাওয়া বন্ধ হওয়ায় বেঁচেছিল শ্রীলা।

দুই বন্ধুর সস্ত্রীক বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহটা সোমেনেরই। শান্ত-প্রকৃতি শুভময়ের উৎসাহ অনুৎসাহ বোঝা যায় না। তবে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল তাকে কদিন। যে ক'দিন তোড়জোড় চালাচ্ছে সোমেন। যেখানে যেখানে নামবে সেখানে হোটেলের সিট্ বুক্ করে রাখা, রেলের রিজার্ভেশান, জিনিসপত্র কেনাকাটা, সব সোমেনের ঘাড়ে। অর্থাৎ ঘাড় পেতে নিয়েছে সোমেন। কোথাও না অসুবিধেয় পড়তে হয়।

শ্রীলা ওর উৎসাহের বহর দেখে থেকে থেকে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল আর ভুরু বাঁকাচ্ছিল। ভাবটা এই—আমার জন্যে আর অতটা নয়, সাধের বন্ধুগিন্নী যাবেন তাই। তিনি তো আবার সর্বদা নাক সিকেয় তুলেই থাকেন!

কিন্তু গতকাল শুভময় এসে জানাল সুতপার যাওয়া হবে না। পাটনা থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে ওর বাপের হঠাৎ কী অসুখ করেছে, ও চলে যাচ্ছে।

'আর আপনি?'

ফস্ করে প্রশ্ন করে বসেছিল শ্রীলা। চারজনের মধ্যে দু'জন কমে গেলে খারাপ লাগবে এটাই মনে হয়েছিল ওর। আর মনে হয়ে মন-মরা হয়ে পড়ছিল। তা' তখুনি সে ভাবটা কেটেই গেল। শুভময় বলল, 'আমি পাটনায় যাচ্ছি না। কথা শুনে মনে হ'ল না অসুখটা বিশেষ কিছু। তবে সুতপার 'বাবা বাবা' বাতিকটা তো একটু বেশী, ও শুনেই সুটকেস গুছিয়ে রেডি। এখুনি বেরোবে, চলি তবে।'

'ছাখো কাণ্ড!'

বলেছিল সোমেন।

তবু শ্রীলার মনে হয়েছিল যতটা মন-মরা হবার কথা, সোমেনের ততটা হ'ল না। যাক ভালই হল। সারাক্ষণ বন্ধুপত্নীর সম্ভ্রমরক্ষার দায়ে উদ্বিগ্ন স্বামীকে নিয়ে জ্বালার শেষ থাকত না শ্রীলার।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায়, রওনা দেবার যখন মাত্র ঘণ্টা দুই বাকী, সোমেন

এসে বলে কিনা—ছুটি ক্যানসেল, হঠাৎ হেড্ অফিস থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কলকাতায় আসছেন, অন্ততঃ চারদিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে নড়বার উপায় নেই তার।

অতএব—

হ্যাঁ, সেই কথাই বলেছে সোমেন, অতএব আজ শ্রীলা শুভময়ের সঙ্গে একাই যাক। সোমেন ক'দিন পরে ম্যাড্রাসে গিয়ে ধরছে তাদের। তেমন দেরি দেখে প্লেনেই চলে যাবে। তবে দরকারই বা কি এত, শুভময় তো রইলই, যা দেখাবার-টেখাবার দেখাবে ততক্ষণ।

একা শ্রীলাই যাক শুভময়ের সঙ্গে।

অর্থাৎ চার বার্থের ওই কামরাটায় তু'খানা শূন্য আসন সামনে নিয়ে।

শ্রীলা প্রথমে ভেবেছিল ঠাট্টা করছে সোমেন, তারপর অবাক হল। অবাক হ'ল, বিরক্তও হল। বলল, 'এটা সার্কাসের স্টেজ্ নয় যে, তলওয়ারের ওপর হাঁটার খেলায় বাহাতুরি দেখাবে তুমি।'

সোমেন আরও অবাক হল। বলল, 'আশ্চর্য! আমি তো এর মানেই বুঝতে পারছি না। এতে বাহাতুরির কী আছে?'

আরও বলল, কই কাল যখন শুভময় খবর দিল সুতপার যাওয়া হবে না, তখন তো এমন আপসেট হয়ে পড়নি, তখন তো বলনি যাওয়া বন্ধ থাক।

শ্রীলা এই যুক্তিহীন কথায় হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। বলে, 'কাল কি জন্যে? কাল কি তোমার যাওয়া বাতিল হচ্ছিল?'

'তাতে কি? আমি জরুরি দরকারে পড়ে আটকে যাচ্ছি বলে তোমার বাধা আসছে কি সূত্রে? তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে—'

সোমেন মিষ্টি একটু হেসে বলে, 'আমি তোমার পাহারাদার! আমার চোখছাড়া হলে—'

শ্রীলার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

শ্রীলা কষ্টে নিজেকে সামলায় তারপর বলে, 'এমনও তো হতে পারতো আমিও হঠাৎ কাজে পড়ে—'

'ওটা তো বানানো ওজর। তুমি পরের চাকর নয়।'

'বাজে কথা থাক, তুমি শুভময়কে ফোনে খবর দিয়ে দাও আমাদের যাওয়া বন্ধ রইল।'

'কী মুশকিল! ও নির্ঘাত এতক্ষণে স্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যা নার্ভাস! তা' ছাড়া দেখ রিজার্ভেশন হয়ে রয়েছে, মিছামিছি এতগুলো টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয়?'

শ্রীলা একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'টাকাটাই সব থেকে মূল্যবান, তাই না?'

সোমেন হেসে ওঠে।

সোমেন শ্রীলার আবেগকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, 'আহা তাই কি বলছি? কিন্তু টাকার চেয়ে মূল্যবান কিছু হারাতে বসছি এমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে নাকি তোমার?'

শ্রীলাকে ভারী গম্ভীর দেখায়।

শ্রীলা বলে, 'আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, আগাগোড়াই তুমি আমার সঙ্গে তামাশা করছ কিনা।'

হঠাৎ সোমেনের সেই কমনীয় কমনীয় মুখে এক চিলতে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ধারালো ছুরির আগার মত ঝকঝকে। সে হাসি মিলিয়ে গেলে খুব শান্তগলায় বলে, 'আমিও বুঝে উঠতে পারছি না, তুমি এই চারটে বছর ধরে আমার সঙ্গে তামাশা করে এসেছ কিনা।'

'কী বললে? কী বললে তুমি?'

'যা বললাম, বুঝতে অবশ্যই পেরেছ।'

শ্রীলা হঠাৎ একেবারে সুস্থির হয়ে গেল। শান্তগলায় বলল, 'তুমি কি আমায় যাচাই করতে চাইছ?'

যাচাই!

'যাচাই করছি তোমাকে ?'

সোমেন কপালে হাত ঠেকাল।

মুখটা অবহেলিত শিশুর মত করুণ করল বলল, 'তোমার কথা শুনে আমার মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে ।'

'মরে যেতে ইচ্ছে করছে ?'

'তা' ছাড়া ? এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি আছে যে শুভময়কে তুমি ডেঞ্জারাস্ ভাবছ—'

'শুভময়কে আমি ডেঞ্জারাস ভাবছি ?'

শ্রীলার সাদামাঠা মুখটা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'তাহলে ?'

সোমেন যেন শ্রীলার কথার মানে বুঝতে পারছে না।

শ্রীলা ঝেঁকে উঠে বলে, 'আমি বলছি এটা লোকচক্ষে খুব খারাপ দেখাবে—'

'ঠিক উল্টো। অন্তত আমার মতে—' সোমেন বলে, 'আমি গেলাম না বলে তুমি শুভময়ের সঙ্গে যেতে পারবে না, এর থেকে

'শুধু তুমি গেলে না বলে নয়, ওর স্ত্রীও যাচ্ছে না—'

'একই কথা। মানে তো দাঁড়াচ্ছে,—তুমি শুভময়কে বিশ্বাস করতে পারছ না—'

শ্রীলা এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে, 'এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নীতি নিয়মের প্রশ্ন, সভ্যতার প্রশ্ন।'

'আমিও তো সেই সভ্যতার কথাই বলছি। ওর সঙ্গে একা যাবার সাহস হচ্ছে না তোমার, এইটা স্বীকার করাই অসভ্যতা মনে হচ্ছে আমার।'

'সাহস হচ্ছে না ?'

'তবে ?'

'সমাজ' বলে একটা বস্তু আছে।'

'আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার স্ত্রী দু'দিন কোথাও গেলে যদি সমাজচ্যুত হতে হয়, সে সমাজকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।'

শ্রীলা নির্নিমেষে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'এমন কি হতে পারে না, তুমি যাচ্ছ না বলে আমার যেতে ভাল লাগছে না?'

'কী মুশকিল! হতে পারবে না কেন? হবেই তো, হওয়াই তো স্বাভাবিক!' ভারি নরম শোনায় সোমেনের গলা, 'কিন্তু ভেবে দেখ সে প্রশ্ন শুভময়েরও ছিল। তবু আমাদের মুখ চেয়ে যাওয়া ক্যানসেল করেনি ও।'

'তুমি বন্ধু, তোমার জন্যে সব হতে পারে। এখন তুমি না গেলে ওরই বা ভাল লাগবে কেন?'

শ্রীলা প্রখর হতে চাইছে।

কিন্তু সোমেন আরও নরম, 'লাগবে লাগবে। লাগবে না কেন? গেলেই ভাল লাগবে।'

'কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আজই আমাকে তাড়াবার জন্যে এমন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছ কেন তুমি! ক'দিন পরে একসঙ্গে গেলেই তো—'

'তাড়াবার জন্যে?'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

সোমেন কাছে সরে আসে শ্রীলার। বিপন্ন গলায় বলে, 'কেবল কথার ফাঁস টেনে ব্যাপারটা জটিল করে তুলছ কেন? এটা ভাবছ না কেন, এখন যদি বলি এস্কর্টের অভাবে শ্রীলার যাত্রা বন্ধ, শুভময়ের কাছে মুখটা কত ছোট হয়ে যাবে আমার! কী ভাববে ও আমাকে?'

'খুব সহজ আর স্বাভাবিক মানুষ ভাববে।'

'দেখ ওর সঙ্গে যদি আমার সেইরকম দূরত্বের সম্পর্ক হতো—ইস্ কী কাণ্ড! মাত্র আর আধঘণ্টা সময় হাতে! শ্রীলা দোহাই তোমার,

অন্ততঃ স্টেশনেও চল একবার। নইলে কী অবস্থায় পড়বে সে বেচারী! মোটঘাট সব পাঠিয়ে দিয়েছি তার ভরসায়।'

'মোটঘাট! আমাদের মোটঘাট?'

শ্রীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সোমেন ব্যস্ততায় দ্রুতভাষী হয়ে ওঠে। 'হ্যাঁ অফিস থেকে ফিরেই' …মানে যা সব গোছানো ছিল তোমার, অপূর্বকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ট্যাক্সী করে। একটু আগে থেকে যাওয়াই ভাল। মানে—'

'থাক, মানে বুঝতে পেরেছি। ফাঁদের কোনও দিকে না ফাঁক থাকে।'

সোমেন বসে পড়ে।

সোমেন যেন বুকে বাণ খেয়েছে।

'ফাঁদ! ফাঁদ পাতছি আমি তোমার জন্যে? ঠিক আছে, স্টেশনেই ফোন করে দিচ্ছি, মাইকে বলে দিক শুভময়কে ডেকে, শ্রীলা দেবীর যাওয়া হল না।'

'থাক্! আমি যাবো!' শ্রীলা শান্ত গম্ভীর।

'যাবে? আঃ শ্রীলা তুমি আমায় বাঁচালে! ভেবে পাচ্ছিলাম না—কোন্ মুখে বলব শুভময়কে—কিন্তু আর এক সেকেণ্ডও দেরি করা চলছে না শ্রীলা, গাড়ি ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এল!'

না ছেড়ে যায়নি।

শুধু নড়ে উঠেছিল।

শুভময়কে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই শ্রীলাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল সোমেন। ঠেলে দিয়ে নেমে পড়েছিল।

'আরে আরে তুমি আবার এখন নামছ কেন? গাড়ি ছেড়ে দিল যে!'

চীৎকার করে উঠল শুভময়।

শান্ত মিষ্টি শুভময়, গম্ভীর গলার শব্দ যার কচিৎ শোনা যায়।

'আমি যাচ্ছি না—!'

সোমেনও চেঁচিয়ে উত্তর দিচ্ছে, কারণ গাড়ি গতি নিয়েছে। যারা জানলার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, তারা পিছিয়ে পড়ছে। সোমেনও পিছিয়ে পড়েছে, চেঁচিয়েই বলছে, 'আজ আমার যাওয়া হ'ল না, শ্রীলার কাছে শুনো কারণ। ক'দিন পরে যাচ্ছি—'

আর দেখা গেল না, সোমেনকে। গাড়ি গতি নিয়েছে, আর কিছু করার নেই।

'কী ব্যাপার ?'

শুভময় বিমূঢ়।

শ্রীলা শান্ত। জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক করতে করতে বলে, 'মারাত্মক কোনো ব্যাপার নয়, ওপরওয়ালা আসছে বম্বে থেকে চারদিনের জন্যে। অতএব এই দিন চারেক তার চরণে চরণে ঘোরা ছাড়া আর কোনো কর্তব্য থাকতে পারে না।'

'তাহলে যাচ্ছে কে ?'

'কেন ? যারা গাড়িতে উঠেছি।'

বিমূঢ় শুভময় হতাশ গলায় বলে, 'খুব ভুল হল আমার। এ্যালার্ম-চেন্ টেনে নেমে পড়লেই হতো।'

'এ্যালার্ম-চেন্' !

শ্রীলা সহসা রূঢ় বিদ্রূপের গলায় বলে ওঠে, 'ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছেন, তাই না ?'

'অস্বীকার করছি না।'

'সাহসের এত অভাব ?'

'তা' হয়তো অভাবই।'

শ্রীলার সেই সাদামাঠা মুখটা আবার এখন তীব্র হয়ে ওঠে, 'নিজের ওপর এটুকু আস্থা নেই আপনার ?'

শুভময় ওর ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তারপর আস্তে বলে, 'ওটা বড় গোলমেলে জিনিস। ওটা বড়

গোলমেলে জিনিস! ও কথা থাক। আর একটা মজার কথা শুনুন'—সুতপা আজ ট্রাঙ্ককল্ করেছিল, 'ওর বাবার আদৌ কোনও অসুখ করেনি।'

'আদৌ কোনও অসুখ করেনি?'

'না। ওখান থেকে কেউ কোনো ট্রাঙ্ককল করেনি। ব্যাপারটা একদম ভুয়ো।'

'একদম ভুয়ো!'

শ্রীলা যেন কথাগুলো বুঝতে সময় নিচ্ছে।

শুভময় বলে, 'বুঝতে পারছি না হঠাৎ এ রকম অদ্ভুত রসিকতা কে করল।'

শ্রীলা এবার আস্তে বলে, 'আমি বুঝতে পারছি! কিন্তু অসুখটা যদি ভুয়ো, সুতপা চলে এল না কেন?'

'আসবে! বলল এসেই যখন পড়েছি, দু' একটি দিন থাকি! আজকের দিনটা তো গেলই, তোমরা এগোও, দিন দুই পরে যাচ্ছি। গিয়ে একত্র হবো। ম্যাড্রাসের হোটেলটার ঠিকানাটা ভাল করে জেনে নিল।'

শ্রীলা আস্তে বলে, 'এখন বুঝতে পারছি হঠাৎ ডিরেক্টর আসাটাও ভুয়ো। এ ওদের ষড়যন্ত্র। ওরা আলাদা আসবে বলে।'

শুভময় মৃদু হেসে বলে, 'ঠিক এই মুহূর্তে আমারও তাই মনে হচ্ছে—'

শ্রীলা প্রবল আক্ষেপের সঙ্গে বলে, 'ও আমাদের ঠকাল শুভময়?'

শুভময়ের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। বিচিত্র রহস্যময়।

সেই হাসির গলায় বলে, 'কে বলতে পারে, ঠকালো না জেতালো!'

শ্রীলা চমকে ওঠে!

শ্রীলা যেন একটা গভীর সমুদ্রের তলাটা হঠাৎ দেখতে পায়। আর এই মুহূর্তে শ্রীলার সাদামাঠা মুখটা ভারি লাবণ্যময় দেখায়, আর মনে হয়, চোখদুটি ভারি সুন্দর তো ওর!'

ঘরনী

জুতোর দোকানের র‍্যাকে সাজানো জুতোর বাক্সের মত, গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি এক মাপের আর এক ছাঁচের রেল কোয়ার্টার্সের এই বাড়িগুলো দেখতে এমন কিছু নয়নমনোহর নয়, তবু সাইকেল রিক্‌শটা যখন ওই সারি সারি নম্বরের মধ্যে বিশেষ একটি নম্বর-দাগা বাসার সামনে এসে থামলো, কাননের মনে হলো এমন অপূর্ব ভবন সে জীবনে দেখেনি।

বাসাটা এখন খোলা আর খালি, শীতশেষের নেশা জাগানো বাতাস ঘর বারান্দা রোয়াক আর উঠোনটুকুর মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলে ফিরছে।

এই খালি বাসাটা কাননরা ভরে তুলবে, বিছানায় বাসনে কাপড়ে আসবাবে।...কিন্তু বাসাটাই যে কাননকে ভরে তুললো!

এই বাসাটা কাননের একার!

একেবারে নিজস্ব।

কানন আর অনিমেষের! এ চিন্তা কী সুখকর! এই বারান্দা এই রোয়াক এই উঠোন, এই রান্নাঘর আর—এই দু দু'খানা শোবার ঘর, সব—সব কাননের!

পুরো একটা সাম্রাজ্য ছাড়া আর কি!

রিক্‌শ থেকে নেমেই কানন বাসার সবটা দেখে নিল। একবার দু'বার তিনবার: কাননের মুখে শিশুর ঔৎসুক্য, কাননের মুখে শিশুর আহ্লাদ!

অনিমেষ রিক্‌শওলাটাকে দিয়েই সব মালপত্র ঘরে তুলিয়ে দিয়ে ভাড়া মিটোচ্ছিল, কানন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল 'ওগো দেখবে এসো কী কাণ্ড!'

অনিমেষ উদ্‌ভ্রান্ত হল না।

বলল, 'কাণ্ডকারখানাগুলো পরে দেখো, আগে জিনিসগুলো মিলিয়ে নাও দিকি !'

কানন ওই তুচ্ছ কথাটা গায়ে মাখল না। তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'মিলোবার কি আছে ? সব তো দেখেই তুলেছ। ওসব রাখো, আগে ওদিকে চল না !'

'চল !'

অনিমেষ বলল, 'কাণ্ডটা কী ? উঠোনের বেলগাছটায় দুটো বেহ্মদত্যি আছে বুঝি ?'

'আহা কী কথারে ! বেলগাছই নেই। আমগাছ গো ! দু দুটো আম গাছ ! আর সেই গাছে ছোট ছোট আম ধরেছে !'

অনিমেষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কপালে হাত রেখে বলে উঠল, 'সর্বনাশ ! বল কি ? আম গাছে আম ধরেছে ?'

কানন ওর ভঙ্গীতে প্রথমটা থতমত খেল, তারপরই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'উঃ কী দুষ্টু ! কী ভয়ই খাইয়ে দিচ্ছিলে ! বলি ঠাট্টা তো করা হচ্ছে, বলতো নিজেদের বাড়িতে, একেবারে নিজস্ব উঠোনে, গাছে ফল ধরেছে দেখেছ তুমি ?'

অনিমেষের চোখের সামনে ওদের সেই উত্তর কলকাতার এক সংকীর্ণ গলির মধ্যের জ্ঞাতিদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা একটা জীর্ণ বাড়ির কোণের দিকের সেই ছোট্ট ঘরখানা ভেসে উঠলো।...ভেসে উঠলো কাননের বাপের বাড়ির ততোধিক অপরিসর সেই বালিখসা ছোট্ট একতলার ঘরটা !

মাথা নেড়ে বললো, 'তা দেখিনি স্বীকার করতেই হবে !'

কোয়ার্টার্স অনিমেষের দেখা।

তবু কানন অনিমেষকে টানতে টানতে বাসাটা সব ঘুরিয়ে নিল।

পরিসর এত বড় নয় যে, ফুরোতে দেরি লাগবে, কিন্তু আর একটা

বস্তু যে অফুরন্ত! অনিমেষ বলে, 'তা' অনেক তো দেখা হলো। এইবার গুছিয়ে নাও চটপট! খেতে টেতে হবে তো, না কি?'

কানন ভুরু তুলে বললো, 'খেতে? খাওয়া? আজ এখন এই অপূর্ব সময়ে তুমি ওই তুচ্ছ কথাটা ভাবতে বসেছ?'

আর পরক্ষণেই হেসে উঠে কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়ে বিছানার বাণ্ডিলটা গড়িয়ে ঠেলে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এক ঘণ্টার মধ্যে তিন তরকারি ভাত খাওয়াচ্ছি তোমায়। কী রকম একখানা গিন্নী দেখবে!'

কানন যেন কিশোরী হয়ে গেছে।

কাননের মন থেকে আর শরীর থেকে যেন আট দশটা বছর ঝরে পড়ে গেছে!

বিয়ের আগে, বিয়ের পরে, জীবনের এই পঁচিশটা বছর কাল কী দমবন্ধ করা হাওয়াতেই কাটিয়েছে কানন!...অনিমেষ যখন রেলের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে এল, গলির ধারের সেই ছোট্ট ঘরে কানন একা একা জানলার শিকে কপাল ঠুকেছে, আর ভগবানকে ডেকে বলেছে, ঠাকুর আমার কি এদের এখান থেকে মুক্তি নেই? যদি তা না থাকে তো জীবন থেকেই মুক্তি দাও আমায়!'

ঠাকুরের দয়া হয়েছে।

মুক্তি এসেছে অনিমেষের কিঞ্চিৎ পদোন্নতি আর এই কোয়ার্টার্স প্রাপ্তির পথ ধরে! জা ননদ ভাসুরপো ভাসুরঝির ঈর্ষাকাতর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে মালপত্তর নিয়ে ট্যাক্সীতে উঠেছে কানন, হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে!

রেলগাড়ি চড়াও তো প্রায় নতুনই! ভগবান, এত সুখও লিখে রেখেছিলে তুমি কাননের জন্যে?

অনিমেষ বলে, 'তুমি তো দেখছি নতুন প্রেমাস্পদ পেয়ে আমাকে প্রায় ভুলেই গেলে!'

কানন বলে, 'অসভ্য!'

অনিমেষ বলে, 'অসভ্য মানে ? সত্যি কথা ! বাসা পেয়ে আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে অবহেলা করবে জানলে, আগে চিন্তা করতাম ! এ যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী !'

'মশাই গো, বাসা মানেই তুমি, তুমি মানেই বাসা ! বুঝলে ?'

চিরদিনের সাদামাঠা কানন এখানে এসে কবি হয়ে যাচ্ছে, না বিদুষী হয়ে যাচ্ছে ?

তা' ওরই মধ্যে অনিমেষ থেকে থেকে বলে, 'মিত্তির সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে না ? না যাওয়াটা ভালো হচ্ছে না ! যতই হোক ওপরওলা, একটু তোয়াজের দরকার !'

কানন বলে, 'তুমি চল না !'

'আহা আমি কেন ? তোমরা মেয়েতে মেয়েতে—'

কানন বিপন্ন মুখে বলে, 'মেয়েতে মেয়েতে কি গো ? ওঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা ? উনি তো তুমি বললে এম. এ., বি. এ. পাশ, সুন্দরী আধুনিকা, আর আমি এই গাঁইয়া—'

অনিমেষ হেসে বলে, 'তা' তুমি তো আর তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাবে না ? তুমি যাবে—রাজার কাছে প্রজার মত, প্রভুর সামনে ভৃত্যের মত !'

কানন মুখ লাল করে বলে, 'সে আমি পারবো না !'

'আরে বাবা ঠাট্টাও বোঝো না !' অনিমেষ বলে, 'যাবে, একটু সৌজন্য করবে, চলে আসবে ! এখানে আবার ওই ওপরওলা নীচের-ওলাটা একটু বেশী আছে কিনা ! সূর্যের চেয়ে বালির তাত বেশী, সাহেবদের থেকে মেমেদের মান অধিক ! একটু পাদ্য অর্ঘ্য না পেলে খাপ্পা হন !'

কানন বলে, 'যাবো। যাবো একদিন।'

তবু হয়ে ওঠে না।

তা' আজ অনিমেষ একটা খবর দিল। বললো, 'এইবেলা যাবে

তো যাও। সাহেব ক' দিনের জন্যে টুরে গেছেন, বিরহিণীর কাছে এখন চাকর ঘরনীর সঙ্গও কাম্য মনে হবে!'

কানন অতএব চললো।

দুপুরের ট্রিপে বেরিয়ে গেল অনিমেষ, দূর থেকে পৌঁছে দিয়ে। ফাল্গুনের শেষ, দুপুরের বাতাসটা এখন আর মলয় বাতাস নেই, ওইটুকু হাঁটতেই মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কাননের।

কিন্তু অনিমেষ যখন ফেরে তখনও কিছু আর সেই লাল থাকবার কথা নয়! অনেক আগে ফিরেছে কানন।...

তবু কাননের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কৌতুকের হাসিতে!

বলে, 'হুঁ বাবা, খুব! সাহেব তোমাদের আচ্ছা ধাপ্পা দিয়েছে! টুরে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে, ঘুরে গিয়ে গিন্নীর আঁচলের আশ্রয়ে! ইস আমি তো গিয়ে পড়ে অপ্রস্তুতের একশেষ—'

অনিমেষ এ কৌতুকে কৌতুক বোধ করে না। প্রায় ধমক দিয়েই বলে, 'কী বকছো যা তা! সাহেব গেল আমরা জানি না? তুলে দিয়ে এলাম!'

কানন তবু হাসে।

সরল আর মুখ্যু কানন!

'তাই তো বললাম দু স্টেশন গিয়েই, আবার ঘুরে—'

'থামো! কি হয়েছে শুনি! কী দেখলে গিয়ে? গিন্নীর সঙ্গে দেখা হল না?'

কানন বকুনি খেয়ে একটু গম্ভীর হয়। বলে, 'দেখা আর করবো কি করে? যা অবস্থা দেখলাম! তুমি তো ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলে? রোদ বলে আমি বাগানের এ পাশটা দিয়ে ঢুকে, কৌতূহলের বশে

বাগানের দিকের জানলার পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেখতে গেলাম।··· তারপর 'পত্রপাঠ' বোঁ বোঁ করে ফিরে এলাম!'

'ফিরে এলে?'

কানন আবার ভুরু নাচিয়ে বলে, 'বাঃ তা' ফিরে আসবো না? সাহেব আর মেমসাহেব তখন দিনদুপুরকে রাতদুপুর করে—'

'চুপ! চুপ করো!'

অনিমেষ বলে, 'নিশ্চয় তুমি বাড়ি ভুল করে অন্য কোনো বাড়িতে—'

বরের এই রুদ্রমূর্তিতে বোকা কানন একটু থতমত খায়। তা বলে এত বোকাবনাটা স্বীকার করতে রাজী হয় না। অভিযোগের সুরে বলে, 'হ্যাঁ আমি যেন পাগল! নিজে তুমি ঢুকিয়ে দিলে না? দূরে দাঁড়িয়ে দেখে হাত নাড়লে না? তারপর আবার বুঝি আমি গেট ডিঙিয়ে অন্য কোয়ার্টার্সে ঢুকতে গেলাম?...সাহেবদের কোয়ার্টার্স তো আর এই আমাদের মতন গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি নয় যে গুলিয়ে যাবে? এহদ্দ ওহদ্দ বাগান তো একজনের!'

কথাটা মিথ্যে নয়।

অনিমেষ গুম্ হয়ে যায়।

মিত্তির মেমসাহেবের অতি আধুনিক অতি সাজসজ্জা নিয়ে হাসাহাসি হয় অফিসে, অধস্তনজনোচিত সমালোচনাও করে থাকে অনেকে কটু কষায় লবণাক্ত, কিন্তু এটা কী ভয়ঙ্কর!

বোকা কানন এই ভরদুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে কি একটা সাপের গর্ত আবিষ্কার করে বসলো!

তবু গেরস্থ ঘরের ছেলে অনিমেষের মনে হতে থাকে, অসম্ভব! অসম্ভব! নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে!

মিত্তির মেমসাহেবের সাজসজ্জা যেমন তাদের আলোচনার বস্তু, মিত্তির সাহেবের স্ত্রৈণতাও তেমনি রসালো গল্পের বিষয়বস্তু।

যাক্ বড়লোকের বড় কথা!

অনিমেষ একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'থাক্, খুব বেড়ানো হয়েছে, আর কোনোদিন যেতে হবে না তোমায়। তবে শোনো, যা দেখেছ তা একদম ভুলে যাবে! জীবনে কোনোদিন ও রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলে তা' মনে রাখবে না!'

কাননের কৌতুকহাস্য অনেকক্ষণ উপে গিয়েছিল, এখন ভয়ে বুক ছমছম করতে থাকে। আর এখন নিজের সম্বন্ধে আস্থা ফুরিয়ে যায়। বার বার মনে হতে থাকে তবে কি ভুলই দেখেছি? চড়া রোদে পথ হেঁটে চোখে ধাঁধা লেগেছিল আমার? মেমসাহেব একাই ছিল?... কিন্তু—জলজ্যান্ত দুপুরে—কানন তো কানা নয়!

অনেকক্ষণ পরে কানন বলে, 'হ্যাঁ গা—এও সম্ভব?'

অনিমেষ শুকনো গলায় বলে, 'অসম্ভব কি? জগতে এমন ঘটনা ঘটে না তা তো নয়!'

'তাই বলে ওই রকম ইন্দ্র চন্দ্র বর—'

'ওতে কিছু না! যার সঙ্গে যার মজে না কি যে বলে!' অনিমেষ নিশ্বাস ফেলে একটা।

নিশ্বাস ফেলে—হয়তো মানুষের লোভের বহর দেখে, নির্লজ্জতার বহর দেখে!

কিন্তু কানন এবার ঝেঁজে ওঠে। বলে, 'বসে বসে নিশ্বাস ফেললে তো হবে না। এর প্রতিকার করতে হবে তো?'

'প্রতিকার?'

অনিমেষ হেসে উঠে বলে, 'আমরা কি প্রতিকার করবো?'

'কি আবার করবে—' কানন তীব্র হয়। 'বলে দেবে সাহেবকে! সেই পাজী বদমাইশটাকে সাহেব একেবারে খতম করে দেবেন!'

অনিমেষ ওর কথায় 'থাবা' দেয়। বলে ওঠে, 'থামো, চেঁচিও না। বললাম না ভুলে যাবে আজ দুপুরে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে! কে বলতে পারে সাহেব জানেই কি না!'

'সাহেব জানে?'

কানন রেগে জ্বলে বলে ওঠে, 'পাগলের মত কথা বলছ কেন বলতো ?'

অনিমেষ এই নির্বোধ সরলতার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'ঠাট্টা করছি রে বাবা ঠাট্টা করছি !'

'তাই বল !' কানন কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বলে, 'তা যাই বল, আমরা কি করবো বলে নিশ্চেষ্ট থাকাটা মনুষ্যত্ব নয় ! বেচারা সাহেব নিশ্চিন্দি হয়ে অফিসের কাজে চলে গেছে, আর—'

অনিমেষ এবার ধমকেই ওঠে।

বলে, 'তুমি থামবে ? ও সব ছেঁড়া কথা আর যেন শুনি না তোমার মুখে ! যে যা আছে থাক্ !'

যে যা আছে থাক্ !

যে যা আছে থাক্ !

এই কি একটা কথা ?

কাননের মন জুড়ে একটা প্রশ্নের যন্ত্রণা অবিরত পাক খেতে থাকে। নিশ্চিন্ত নিঃসন্দিগ্ধ লোকটা জানতেও পারবে না তলে তলে তার কী ভয়ানক সর্বনাশ ঘটছে, আমরা টের পেয়েও সাবধান করে দেবো না তাকে ?...

যদি ওই বিচ্ছিরি মেয়েমানুষটা ঘরভেঙে পালায় ? যদি সাহেবের টাকাকড়ি সব নিয়ে-টিয়ে ভাগে ?

কাননের বুদ্ধি দিয়ে কানন ওই রকমই ভাবে।

অনিমেষ ভাবলে ওকথা ভাবতো না।

অনিমেষ জানে ঘর ভেঙে পালাবার বোকামি ওরা করে না ! ঘর বজায় রেখে শুধু কোণে সিঁদ কাটে। জমানো কিছু টাকাকড়ি নিয়ে চলে গিয়ে তার লাভ ? নিত্য আয়ের চাবিটা যার বজায় থাকবে ?

কানন জানে না।

কাননের তাই ছটফটানির শেষ নেই।

অনিমেষ ও প্রসঙ্গ তুলতে বারণ করেছে, তবু বলে 'হ্যাঁ গো—সাহেব কবে আসবে?'

'পশু´, তস্য´। কেন তুমি গিয়ে সাহেবকে সাবধান করে আসবে?' অনিমেষ বিদ্রূপ করে বলে, 'মেমসাহেব কি তোমার মাথার মধ্যে পুঁতে গেল? ও যে আর নড়ছে না! দোহাই তোমার কানন, ক্ষ্যামা দাও। এবার সত্যি রেগে যাবো।'

কাননকে অতএব থামতেই হয়।

কিন্তু কাননের ভিতরটা থামে কি?

কাননের সুমতি, কাননকে দুর্মতিতে প্ররোচিত করতে থাকে।

কানন আর একবার যাবে, ভাল করে দেখবে, দেখবে আজকের দেখাটা স্বপ্ন না মায়া? নিশ্চিত দেখে নিয়ে কানন উড়ো চিঠি দেবে সাহেবের নামে।

পরদিন আবার অভিযানে বেরোল কানন সেই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে।

কিন্তু নিঃশঙ্ক চিত্ত, আর সশঙ্ক চিত্ত! কাল কাননের মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। কাল শুধু নিছক্ কৌতূহলের বশেই জানলার পর্দাটা সরিয়েছিল কানন, মেমসাহেব কোন্ ঘরে দেখতে।

আজ অন্য আর একরকম!

আজ কাননের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে, সেই শব্দই হয়তো মেমসাহেবকে চমকে দিল।

'কৌন? কৌন হ্যায়!'

বলে নিজেই পর্দা সরিয়ে জানলায় এসে দাঁড়ালেন মেমসাহেব, এবং দেখলেন 'কৌন হ্যায়' বলবার দরকার ছিল না। 'কে?' বললেই হতো!

বাগানে নেমে এলেন মেমসাহেব!

তীব্রস্বরে বললেন, 'কে তুমি?'

রোদে ঘেমে নেয়ে ওঠা আরক্ত মুখ কানন যতটুকু বলতে পারলো, তাতে আর যাই হোক পরিচয়টা ধরা পড়তে বাধা হল না।

'ওঃ অফিসের অনিমেষ বোসের বৌ তুমি? এখানে মারছিলে কি জন্যে?'

কানন অনেক কষ্টে সাহস সংগ্রহ করে বলে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে তাই! দেখছিলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন কিনা!'

'ও! তাই নাকি?'

মেমসাহেবের নিখুঁত নাক চোখ ঠোঁটে গড়া মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে একটু ক্রূর হিংসার হাসিতে!

'তা' আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে কেন? অনিমেষ বোসের চাকরি গেছে?'

বিমূঢ় কানন অবাক্ হয়ে মেমসাহেবের রাগে ফুলে-ওঠা টাইট গড়ন দেহটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, চাকরি যাবে কেন? এই তো সেদিন বদলি হয়ে এলেন নতুন কোয়ার্টার্স পেয়ে।'

'তাই নাকি? তবে?'

মেমসাহেব পা ঠুকে বলেন, 'তবে কি জন্যে এসেছ?'

কাননকে উদ্ধার করবার জন্যে কি ভগবান কোনো দূত পাঠাতে পারেন না? কাননকে বাঁচাতে হঠাৎ এই মুহূর্তে সাহেব এসে পড়তে পারেন না?

হয়তো পারা অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু কাননকে বাঁচাবার গরজ কার? যে বোকা আশ্রয়ের ডালে কোপ দেয়, তার মৃত্যু রোধ করার সাধ্য ভগবানেরও নেই।

তাই কিছুই হল না। কাননকে বলতেই হলো, 'এমনি বেড়াতে এসেছিলাম!'

'বেড়াতে এসেছিলে? আমার কাছে?' মেমসাহেবের ঠোঁটের কোণে হাসি ঝলসে ওঠে। 'তাস খেলতে নয় তো? পান দোক্তা খেতে খেতে? হুঁ, সাপের ল্যাজে পা দিলে কি হয় জানে না বোধহয় অনিমেষ বোস, সেটা শিখিয়ে দিতে হবে তাকে। যেতে পারো তুমি।'

দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণীটাকে লটকে, শরীরটায় একটা মোচড় দিয়ে ফিরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান মেমসাহেব।

তারপর?

তারপর নিঃশঙ্ক অনিমেষ সাপের ল্যাজে পা দিলে কী প্রতিফল পেতে হয়, তা' শিখলো! অফিসের আইন পাল্টে গেল। এখানে আসার দেড় মাসের মধ্যেই আবার বদলির অর্ডার হয়ে গেল অনিমেষ বোসের।

এবার আর হেডকোয়ার্টার্স নয়। ধাবধাড়া গোবিন্দপুরের কোথায় কোন্‌খানে কে জানে। সেখানে কোয়ার্টার্সের স্বপ্ন দেখাও পাগলামি!

দু'খানা সাইকেল রিক্‌শ এসে দাঁড়িয়েছিল।

ক্ষোভে ধিক্কারে অপমানে আর দুরন্ত ক্রোধে পাথর হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ, এপর্যন্ত একটাও কথা বলেনি কাননের সঙ্গে। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে বদলির অর্ডারের ভিতরের রহস্য আর গোপন ছিল না।

তিরস্কারেও আর রুচি নেই অনিমেষের। শুধু সমস্ত রাগটা সংসারের জড়বস্তুগুলোকেই বুঝিয়ে ছাড়বে, এই যেন প্রতিজ্ঞা!

কাননেরও আর বাক্‌শক্তি ছিল না।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল কিভাবে ঝনঝনিয়ে কাঁচের বাসনগুলোয় টান মারছে অনিমেষ। কিভাবে লাথিয়ে লাথিয়ে বেডিং সুটকেসগুলো ঘরের এদিক থেকে ওদিকে করছে!

শ্বেত পাথরের ছোট্ট একটা ঘটিতে গঙ্গাজল রাখতো কানন রামকৃষ্ণের ছবির নীচের ব্র্যাকেটে। শুধু সেটা কি অসাবধানে অনিমেষের হাত থেকে গড়িয়ে পড়লো?

তাই অপ্রতিভ হল অনিমেষ!

এতক্ষণ একটি কথা বলেনি কানন, এইবার বলল। কষ্টে কান্না চেপে বলল, 'ঠাকুর দেবতার জিনিস এইভাবে—'

হয়তো কথাটা না বললে অনিমেষ অপ্রতিভই থাকতো, কিন্তু কাননের কথা তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটের পাথরকুচিগুলো মুঠো করে কুড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'ভাঙুক ভাঙুক, সব ভাঙুক! গুঁড়ো হয়ে যাক সব!···সাহেবের ঘর ভাঙছে এই ভাবনায় আমার ঘরটা ভেঙে গুঁড়ো করলে তুমি! সাধে কি আর বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি!...যাও এখন আবার সেই ঝামাপুকুরের গলিতে পড়ে নাকে ঝামা ঘষোগে! পই পই করে বললাম চুপ করে থাকো—'

দুম দুম করে মালপত্রগুলো গাড়িতে ওঠায় অনিমেষ।

কানন তার সাধের বাসার পরিণতি দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না একটা মেয়েমানুষ তার স্বামীকে ঠকাচ্ছে, অসতী অবিশ্বাসিনী হচ্ছে, ঘর ভাঙার তাল করছে দেখে জেনে একেবারে চুপ করে থাকা কী করে সম্ভব?

পসারিনী

উঠতি বড়লোকের পাড়া।

প্রায় সব বাড়িই নতুন, আর সব বাড়িরই দোরে বাঁধা হাতী। সত্যি, গাড়ি নেই, গ্যারেজ নেই, এমন বাড়ি এখানে দৈবাতের ঘটনা। রাস্তার ধারে ধারে অবশ্য এখনও কাঁচা নর্দমার কৃষ্ণ জল-ধারা প্রবাহিত, পথ চলতে নাকে রুমাল চাপতে হয়, কিন্তু বাড়িগুলি ছবির মত।

এ পাড়ার অধিবাসীদের ছেলেরা ধুতি পরতে শেখেনি, আর কর্তারা সেই শেখা বিদ্যা ভুলে গেছেন। সমাজ সামাজিকতায় নেমন্তন্ন যেতে সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কারো কারো স্টকে হয়তো এক-আধখানি মিহি কাঁচি ধুতি মজুত আছে, আছে গিলেকরা পাঞ্জাবি আর পাড়ওয়ালা মাদ্রাজী-উড়ুনি, কিন্তু তাঁদের সে সাজে সজ্জিত মূর্তি দেখতে পাওয়াও দৈবাতের ঘটনা।

এখানের চাকররাও ইস্ত্রী-করা পাজামা আর নিভাঁজ হাওয়াই শার্ট পরে বেড়ায়। আর এ তল্লাটের মেয়েরা কেউ পর পর দু'দিন একই শাড়ি পরে রাস্তায় বেরিয়েছে, এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারে না।

সহজেই বোঝা যায় এ পাড়ায় মুদীর দোকানের চেয়ে স্টেশনারি দোকানের কাট্‌তি বেশি। যে সংসারে চাল ডাল তেল মসলা মাসে লাগে পঞ্চাশ টাকা, সে সংসারে স্টেশনারির খরচা মাসে অন্ততঃ সত্তর।

কাজেই এ পাড়ায় যদি দোকান খুলতে হয় তো ওই স্টেশনারি দোকান খোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তা জগতে তো আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভাব নেই, আর একেবারে সাজানো বাগান খুলে বসবার মত মূলধনেরও অভাব নেই।

কাজেই মোড়ের মাথায় মহাসমারোহে একদিন 'পসারিনী'র উদ্‌-বোধন উৎসব হয়ে গেল। একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন, সংস্কৃত কলেজের জনৈক অধ্যাপক মাঙ্গলিকী ও স্বস্তিবাচন

করলেন, প্রোপ্রাইটার মাইক সামনে নিয়ে তাঁদের 'জনসেবার' মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছোটখাট একটু বক্তৃতাও দিলেন।

আলো জ্বলল, মালা ঝুললো, সারাদিন ধরে লাউড্‌স্পীকার সহযোগে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজল এবং যাঁরা সেইদিনই দোকানে পায়ের ধুলো দিলেন, তাঁদের কপালে চন্দন টিপ্‌ এবং গায়ে গোলাপ জল দেওয়া হ'ল।

'পসারিনী'কে যে আর পসার হবার আশায় তিলে তিলে প্রতীক্ষা করতে হবে না, তা বোঝাই গেল। কারণ দোকান খোলা হল না তো, যেন স্বপ্নপুরীর একটি দরজা খুলে ধরা হ'ল।

রঙে রূপে শোভায় সৌন্দর্যে একেবারে ঝলমলে দোকান। দিনের চেয়ে সন্ধ্যার দিকে শোভা আরও মনোরম।

পালিশ চক্‌চকে আধুনিক গড়নের কাউন্টার, ক্রেতাদের বসবার জন্য ডানলোপিলোর গদি আঁটা শৌখিন টুল এবং সুচারু সুছাঁদে নিপুণ করে সাজানো বহুবিধ লোভনীয় আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির ওপর যখন ফ্লোরেসেণ্ট লাইটের নীলাভদ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে, তখন পসারিনীর হৃদয়খানি সত্যিই স্বপ্নপুরী বলে ভ্রম হয়।

বলাবাহুল্য এক সপ্তাহও লাগল না। সবাই পরিচিত পুরনো দোকানগুলি ছেড়ে, 'পসারিনী'র খদ্দের হতে লাগল। চিত্তে দ্বিধা আসবার কারণ কিছুই ছিল না, কারণ কেউই পুরুষানুক্রমে এ পাড়ার বাসিন্দা নয়। নতুন আগন্তুক। কোনখানেই কারো শিকড়ের বন্ধন নেই। তা'ছাড়া পসারিনীর গুণ কত!

পসারিনী একেবারে পাড়ার মধ্যে।

পসারিনী রাখে না এমন জিনিস নেই।

পসারিনী খদ্দেরের জন্যে সর্বদা মিঠে পান সাজিয়ে মজুত রাখে, আর সর্বোপরি, পসারিনীর সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়।

মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো যে দেখে, তার প্রেমে পড়ে যায়, এমনি তার মধুর ভাষা, এমনি তার মোহন হাসি! অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা তাঁদের

দ্বৈকালীন ভ্রমণের পথে যেতে আসতে চারবারের অন্ততঃ দু'বারও কিছু কিনুন আর না কিনুন, 'কি হে, কেমন চলছে?' বলে ঢুঁ মেরে যান, ছোট ছেলেমেয়েরা অকারণ 'চিত্তদা চিত্তদা' করে দোকানের দরজায় এসে উঁকিঝুঁকি মারে। এবং তরুণীকুল বিনা প্রয়োজনে বটুয়ার কড়ি খরচা করে জিনিস কিনতে ঢোকে, ঢুকে আর উঠে আসতে চায় না।

সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়ের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় কি না কে জানে, কিন্তু কাজকর্ম বিক্ষিপ্ত হয়। হিসেবপত্র রাখতে হিমসিম খেয়ে যায়। অনেক মেয়ে আবার যেন চিত্তকে কী এক অপূর্ব বিত্ত দিয়ে কিনে নিচ্ছেন, এই ভাবে ধারে জিনিস চান। অনেকে ন্যায্য দামের চাইতে দু'দশ নয়া পয়সা কম দিয়ে আবদার আর অভিযোগের ললিত হাসি হেসে বলেন, 'যান আর চাইবেন না! দেখছেন তো ব্যাগে আর কিছু নেই, আপনি একেবারে ফতুর করে দিয়েছেন আমাকে!'

চিত্ত হাসে।

তার সেই মোহন হাসি হাসে। আর বলে, 'আপনাদের ফতুর করে এমন সাধ্য কার আছে?'

'না, আপনি বড্ড সব পয়সা নিয়ে নেন', বলে তরুণী কালো কাজল চোখের কটাক্ষ হানেন। চিত্ত বলে, 'তবু তো আমার ভাঁড়ারে কিছুই ওঠে না।'

'ওঠে না বৈ কি। ঢের জমিয়েছেন।' বলে একটি রহস্যমধুর হাসি হেসে তরুণী কম পয়সায় বেশী জিনিস নিয়ে দোকান থেকে নেমে পড়েন।

বয়স্থা মহিলারাও আসেন।

একখানি দুধের ছাঁকনি, বা চায়ের চামচ, কি 'জনতা' স্টোভের পলতে কিনতেও আসেন। কারণ বাড়ির পুরুষে দোকান বাজার করবে এমন সেকেলে আইন আর এখন কোনও সংসারে বলবৎ নেই।

গিন্নীরা বেশির ভাগ খেয়ে উঠে দুপুরের দিকে আসেন, তাতে

পানের প্রয়োজনটা কিছু মিটে যায়। ভারী দেহ নিয়ে এসে প্রথমটা খানিক হাঁপান, তারপর জিনিসটা চান, আর কেনা জিনিস প্যাক্ করার অবকাশে মুঠো খানেক তবকদার মিঠে পানের সদ্‌গতি করেন।

ওঁরা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত রায় পানের কৌটো খুলে ধরে।

চাকর বাকররাও আসে বৈ কি!

হয়তো বাজারের থলি হাতে, নয়তো মনিব-ছানা কোলে নিয়ে। অপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে একখানা কাপড়কাচা সাবান, হাফ পাউণ্ড বিস্কিট্ অথবা দুটো সুতোর রীল, এই রকম কিছু নিয়ে যায়।

তা' চিত্তর তাদের প্রতিও অবহেলা নেই। 'তুমি ওই গেটওলা হলদে বাড়িতে থাক' না? হ্যাঁ, বল ঠিক ধরেছি কি না?'…'কি আবার সুতো? এত সেলাই কে করে তোমাদের বাড়ি?'…'আরে ফের সাবান? কাপড় কি ধোবার বাড়ি যায় না কারুর? সবই তো তোমাকে কাচতে হয় তা'হলে?' বলে আপ্যায়িত করে তাদের। কদাচ কখনো পানও দেয়।

সেলস্‌ম্যান চিত্ত সকলের চিত্তজয় করে নিয়েছে এই ক'মাসেই।

তবে বর্ষাকালটায় দোকানের বোলবোলাও একটু কম।

অকারণে পথে বেরোনো কমে লোকের। তরুণীরা যথেচ্ছ বসে গল্প করতে ভয় পায়, পাছে আটকে পড়ে। বর্ষাকালে বিক্রিতে কিছু মন্দা পড়েছে। অবিশ্যি তাতে ভাবনার কিছু নেই, সামনেই আবার পুজো আসছে।

যারা মাসে দশটাকার জিনিস কেনে, তারা একশো টাকা কিনবে। সাবান স্নো পাউডার পমেটম, 'কজ্জলী' 'রঞ্জনী' 'সীমন্তিকা' 'অলক্তক' ইত্যাদির লম্বা তালিকা পড়বে এক একটি।

ভবিষ্যতের বাড়তির ভরসায় আজকের ঘাটতির পরোয়া করে না চিত্ত রায়। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে বসে বসে। চিত্ত যে মাইনে করা চাকর নয়, মালিকের নিজের ভাইপো, একথা চিত্ত কোনদিন কাউকে বলেনি। বলার ইচ্ছেও নেই। কি দরকার বলে

যে, ফাস্ট´ ইয়ারে পড়তে পড়তে তার একবার টি. বি.-র মত হয়েছিল বলে লেখাপড়া বেশী দূর এগোয়নি, আর জীবনে তার শ্রমসাধ্য কাজ করা চলবে না বলে, কাকা তার জন্মেই এই সহজসাধ্য কাজটা আবিষ্কার করেছেন!

মালিক কদাচ দোকানে আসেন।

আর এলেও তিনি কিছু আর সেলস্‌ম্যান চিত্তকে 'ভাই-পো ভাই-পো' করে ডাকেন না? চিত্ত বলেই ডাকেন। আর চিত্তও তাঁকে 'কাকা' 'কাকা' করে না, রীতিমত দূরত্ব বজায় রেখে 'আপনি আজ্ঞে' করেই কথা বলে। কাকা নিজের পদবীতে পুরো করে লেখেন রায় চৌধুরী, ভাইপো শেষাংশটুকু সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে। কাজেই সন্দেহও করে না কেউ।

পাড়াবাসীরা নিজেদের মধ্যেও আলোচনা চালান চিত্ত রায়কে নিয়ে।

হ্যাঁ, সেলস্‌ম্যান হতে হয়তো ওই রকমই। সেলস্‌ম্যানের যা যা গুণ থাকা দরকার সব আছে ওর। কী অমায়িক, কী ভদ্র, কী সদা হাস্যমুখ, আর কী ঠাণ্ডা মাথা! একসঙ্গে বিশজন এসে ফরমাশ করলেও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে না।

তরুণীরা একে অপরকে নিয়ে তো বেশ ঠাট্টা তামাশাই চালায় সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়ের নাম জড়িয়ে। বিশেষ করে রিটায়ার্ড জজ এন. আর. চক্রবর্তীর আদুরে কোলের মেয়ে লিলি চক্রবর্তীকে নিয়ে। কারণ লিলি সব সময় বান্ধবীদের কাছে চিত্তর কথা বলতে বলে, 'ও'। আর কথায় কথায় বলে, 'এত দুষ্টু আর অসভ্য ওটা!'

বান্ধবীরা দুঃসাহসিকা। চিত্তর কাছে তারা লিলির কথা তুলে খোঁটা দেয়।

'বাঃ চমৎকার! এঞ্জেল ফেসের হোয়াইট কালারটা নেই বলছেন। অথচ এই পরশু আপনি লিলিকে ওটা দিয়েছেন।'

'ওই একটাই ছিল বিশ্বাস করুন।'

'ছিল, মানে তোলা ছিল।' অভিমানে ভেঙে পড়ে মাধুরী, স্বপ্না, কল্পনা।

'কী আশ্চর্য! তুলে রাখতে যাবো কি জন্যে?' চিত্ত রায় চিত্তবিমোহন হাসি হাসে।

'কি জন্যে, তা আপনিই ভাল জানেন।'

মাধুরী, স্বপ্না, কল্পনা কিলবিল করে ওঠে।

তবু চিত্ত রায় রাগ করে না। বলে, 'আপনাদের মত অত সবজান্তা নই আমি। নিন না আইভরি কালারটাই, নিন না, আপনার রঙে ভাল ম্যাচ্ করবে।'

প্রার্থিনী কপট ক্রোধে বলে, 'ও, আমি কালো বলে বুঝি একটু ঠুকে নেওয়া হল? তা সবাই যদি এখন লিলি ফুল না হতে পারে?'

না, চিত্ত রায় এসবের উপযুক্ত উত্তর দেয় না। জানে না বলে, না সাহস হয় না বলে, কে জানে!

এই মেয়ের দল বেশির ভাগ সময় দল বেঁধেই আসে। আজকাল আবার পসারিনী কিছু কিছু আধুনিক উপন্যাস, আর কিছু কিছু শৌখিন শৌখিন ব্লাউস পীস রাখতে শুরু করায় দল ভারীই হয়ে চলেছে।

তবু সেদিন সেই মেঘলা দুপুরটায় দোকান একেবারে নিঃঝুম মেরে ছিল। সকাল থেকে বারে বারে পশলা পশলা বৃষ্টি পড়েছে, রাস্তায় জমেছে কাদা। ভাল শাড়ি নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই হয়তো বেরোন নি গিন্নীরা, বেরোয় নি স্বপ্না, ছন্দা, মাধুরী, মালবিকারা। যেমন তেমন শাড়ি পরে তো আর পথে বেরোন যায় না!

চিত্ত গল্পের বইটার মধ্যে ডুবে বসেছিল। সহসা ছোট্ট রঙিন ছাতার ছায়া পড়ল বইয়ের পাতায়।

চিত্ত রায় সচকিত হয়ে উঠল। বিস্ময়ে বলল, 'একী আজকের দিনেও বেরিয়েছেন?'

লিলি গদি আঁটা শৌখিন টুলে বসে পড়ে বলল, 'আজকের দিনটাই তো বেরোবার দিন।'

'তা ভাল!'

চিত্ত রায় একটু বেশী ব্যস্ততা দেখাল, 'বলুন, চট্‌পট্‌ বলুন কি চাই। আকাশ আজ যে রকম খামখেয়ালী, এখুনি হয়তো প্রবল বর্ষণ শুরু করে দেবে।'

লিলি চক্রবর্তী কিন্তু ব্যস্ততার দিক দিয়েও গেল না। মাটিতে চটির আগা ঠুকতে ঠুকতে 'কজ্জলী' আঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে বলল, 'কিচ্ছু চাই না।'

সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায় কি একটু প্রমাদ গণল? ব্যাকুল হয়ে কি একবার মেঘলা দুপুরের জন বিরল পথের দিকে তাকাল?

কে জানে!

তবে কথা সে সহজ সুরেই কইল। 'কিচ্ছু না? বেশ মজা তো! আকাশের মত আপনিও আজ খামখেয়ালী হয়ে উঠলেন নাকি?'

'উঠেছিই তো!'

লিলি চক্রবর্তী 'রঞ্জনী' রঙানো লম্বা লম্বা নখ সমেত গোলাপী-গোলাপী করপল্লব দুখানি কাউন্টারের উপর বিছিয়ে রাখে।

'নাঃ, যতদূর দেখছি আজ আপনার ওই দামী শাড়িটির বারোটা বাজবে। দেখুন ভীষণ অন্ধকার হয়ে আসছে আকাশ। পালান পালান।'

লিলি দুদিকে লটপটানো বেণী দুটো আরো লটপটিয়ে অপরূপ এক ভঙ্গিমা করে বলে 'যদি না পালাই?'

'ছেলেমানুষী করবেন না। উঠুন, বাড়ি যান।'

সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়ের সদাহাস্যময় কৌতুককণ্ঠ একটু যেন গম্ভীর হল।

কিন্তু লিলি হল জজের মেয়ে!

তার দাপট অনেক বেশী!

তীব্রস্বরে বলে ওঠে সে, 'আপনি এমন ভয়ে কণ্টকিত ভাব দেখাচ্ছেন, যেন বাঘে কামড়াতে আসছে আপনাকে।'

চিত্ত রায় হেসে উঠে বলে, 'বাঘ তো ভাল জিনিস। শুধু কামড় দেয় না, একেবারে শেষ করে ফর্সা করে দেয়।'

রাস্তা একেবারে জনশূন্য।

আকাশ গভীরতর অন্ধকার হয়ে আসছে। লিলি চক্রবর্তী বাঁকা কটাক্ষে সেদিকে চেয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে বলে ওঠে, 'আপনার এত অহঙ্কার কেন বলুন তো?'

সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায় সহজ হবার চেষ্টা করে। আত্মস্থ হ'বার চেষ্টা করে। 'অহঙ্কার! অহঙ্কারের কি দেখলেন? গরীব দুঃখী লোকের আবার অহঙ্কার!'

'এটাও আপনার মস্ত এক অহঙ্কার। জগতে যে কোনও মানুষ আছে, সে যেন আপনি দেখতেই পান না।'

চিত্ত রায় আত্মরক্ষা করে বলে, 'দেখতে চাইলে কি আর রক্ষা আছে? ছমাসের ফাঁসি, যাবজ্জীবন জেল!'

হঠাৎ লিলি চক্রবর্তী অপরূপ এক হাসি হেসে ওঠে, 'যাবজ্জীবন জেলের ভয়েই কাতর! এমন লোকও আছে জানেন, যারা ওই জেলের আশায় পাগল হয়ে বেড়ায়!'

চিত্ত রায় আবারও হাসে।

'তারা স্বভাবতঃই পাগল।'

হঠাৎ লিলি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে ওঠে, 'জানেন আমার বিয়ের ঠিক হচ্ছে?'

সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়ও হঠাৎ হেসে ওঠে, 'তাই বুঝি? শুনে আশ্বস্ত হলাম।'

'আশ্বস্ত হলেন!'

'বাঃ হবো না? আপনার একটা হিল্লে হচ্ছে!'

লিলির দুই চোখে আবার অগ্নিকণা ঠিকরে ওঠে, 'আপনার অহঙ্কার দেখলে ইচ্ছে হয় আপনাকে খুন করে ফেলি।'

না, রাস্তায় কোন আশ্বাসের আভাস মাত্র নেই। আকাশে আরও আতঙ্ক।

নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে হবে, অতএব চিত্ত রায় হাসবে। 'উঃ কী সাংঘাতিক! এই সাধু ইচ্ছেটি নিয়ে আপনি আমার থেকে মাত্র গজ খানেক দূরে বসে আছেন? আঁচলের আড়ালে ছোরা বা রিভলবার নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি তো?'

মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদল করাই লিলির আসল ক্যাপাসিটি। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে,'ওটি কি আর আঁচলের তলায় নিয়ে বেড়াতে হয়? বিধাতা পুরুষ মেয়েদের একেবারে সশস্ত্র করেই পাঠান!'

'ছাই পাঠান!'

চিত্ত রায় তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে ওঠে, 'ছাই পাঠান? আপনাদের যা কিছু মহিমা, তার বারো আনাই তো আমাদের কাছে।'

'আপনাদের কাছে?'

'তা না তো কি! আপনাদের চোখ ভুরু, রং গড়ন, নখ্ চুল, লালিত্য লাবণ্য, সব কিছুর বারোআনাই তো ধার করা! পুরুষের গড়ে রাখা জিনিস, পুরুষের দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে গিয়ে, কী আর ভোলাবেন তাদের? ভোলবার দিন শেষ হয়ে গেছে পুরুষের।'

'ইস্ তবু যদি না মেয়েদের পায়ে গড়াগড়ি দিত পুরুষ!' বলে অদ্ভুত রহস্যে হেসে ওঠে লিলি।

'সব পুরুষ নয়।' চিত্ত গম্ভীর ভাবে বলে।

'সব পুরুষই'—লিলি সেই ধার করা ভুরু আর ধার করা কটাক্ষে অগ্নিবাণ হেনে বলে, 'সাধু সাজে শুধু ধরা পড়বার ভয়ে।'

চিত্ত রায় উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুহূর্তে একটা ওলট পালট কাণ্ড ঘটে গেল।

ভয়ঙ্কর শব্দে একটা বাজ পড়ল কোথায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দুরন্তবেগে বৃষ্টি নেমে ঝড়ে জলের ছাটে একটা লণ্ড-ভণ্ড করে দিল।

খানিকক্ষণ ধরে সামনের দিকে সাজানো জিনিসগুলো সামলাতে চেষ্টা করল চিত্ত, কিন্তু এলোমেলো ছাটে বিপর্যস্তই হ'ল শুধু।

দরজা বন্ধ করবার উপায় নেই।

সদাহাস্যময় চিত্ত রায় বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'দেখলেন তো, যা তা পাগলামি করে কী কাণ্ড করলেন! বলছি তখন থেকে জোরে বৃষ্টি আসছে! গেল সমস্ত!'

লিলি দরজার দিক থেকে পাশে সরে এসেছিল। সেখান থেকে ছুঁদে গলায় বলে, 'তা জিনিসগুলো সব ভিজিয়ে নষ্ট করছেন কেন? দরজাটা বন্ধ করে দিন না!'

'দরজাটা বন্ধ করে দেব?'

'দেবেন না কেন? নামে কলঙ্ক পড়ে যাবে? আশ্চর্য! পুরুষ মানুষ না মেয়ে মানুষ আপনি? আপনার পবিত্র নামে কালি লেপতে ত্রিসীমানায় আছে কে শুনি?'

বলে নিজেই সহসা এগিয়ে গিয়ে ঝড়াং করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, তাতে পিঠ ঠেশিয়ে দাঁড়ায় লিলি।

'কী হচ্ছে কি? দোর ছাড়ুন।'

ক্ষেপে ওঠে চিত্ত রায়। ফট করে আলোটা জ্বেলে দেয় ঘরের। ঘন অন্ধকার হয়ে উঠেছিল একদুয়োরি দোকান ঘর।

জজের মেয়ে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তোমার প্রাণটা এত নিষ্ঠুর কেন বলতো? বুঝতে পারো না আমি মেয়ে হয়ে লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে—' হাঁপাতে থাকে সে। বাইরে প্রকৃতির ভীম গর্জনে শোনাও যায় না সব।

চিত্ত নিজের কাউন্টারে ফিরে গিয়ে দুই হাতে মাথা চেপে বসে থাকে।

বাইরের দুর্যোগের গর্জনের চাইতেও বুঝি ভয়ঙ্কর শব্দ উঠছে তার মাথার মধ্যে।

লিলি চক্রবর্তী এই হতাশ মূর্তির দিকে চেয়ে বোধ করি হতাশ হয়েই আর কোন কথা বলে না, চুপ করে চেয়ে থাকে।

সহসা দরজার বাইরে যেন বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও মানুষের কলকণ্ঠ শোনা যায়।

বোঝা যাচ্ছে দোকানের সামনের সামান্য শেড্‌টুকুর আড়ালে একাধিক ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে।

হায়! এতক্ষণ এরা কোথায় ছিল?

ঝড়ের গর্জন কমে আসে।

বৃষ্টির শব্দ স্তিমিত হয়ে যায়।

বাইরের কলকণ্ঠ চুপ হয়ে গেছে।

চিত্ত উঠে এসে বলে, 'সরুন দরজা খুলি।'

লিলি মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ায়। এতক্ষণে বুঝি নিজের মত্ততার চেহারাটা কতটা অশোভন হয়েছে সেটা অনুভব করতে পেরেছে সে।

দরজা খুলে ফেলল চিত্ত।

আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মতই স্থির হয়ে গেল।

দরজার বাইরে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন মাধুরীর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের উকিল এন চ্যাটার্জি। আর অপরজন লিলির বাবা রিটায়ার্ড জজ আর এন চক্রবর্তী।

আরে, একি তোমার দোকান খোলা—'বলে ইন্‌কাম ট্যাক্সের উকিল দু'পা পিছিয়ে দোকানে উঠে এসে বলেন, 'আমরা ভাবছি বৃষ্টির দিনে বন্ধ করে—'

না, কথাটা আর শেষ করেন না তিনি। বজ্রাহতের মতই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

রিটায়ার্ড জজও তখন দোকানে উঠে এসেছেন। আর 'বাবা' বলে ডুকরে কেঁদে তীরবেগে ছুটে এসে তাঁর বুকের উপর আছড়ে পড়েছে তাঁর আদরিণী কন্যা।

যার চুল এলো মেলো, মুখ লাল, গালের ওপর কাজল ধোয়া অশ্রু রেখার চিহ্ন।

না, এ যুগে কেউ কেলেঙ্কারির ভয়ে চুপ করে থাকে না।

অভিজাত পাড়া তোলপাড় হতে থাকে সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়ের ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের সংবাদে।

সকলে শতমুখে বলতে থাকে, জগতে মানুষ চেনা দায়! বলতে থাকে, লোকটা যে মেয়েঘেঁষা এটা তারা সকলেই লক্ষ্য করেছে!

কিন্তু দুর্বৃত্তকে ছেড়ে দেওয়া চলে না।

রিটায়ার্ড জজ আদালতে নালিশ করেন।

ইনকাম ট্যাক্সের উকিল সাক্ষ্য দেন।

লিলি চক্রবর্তী নিজে আদালতে গিয়ে বিবৃতি দেয়—কিভাবে সামান্য একটা পাউডার কিনতে গিয়ে দুর্বৃত্ত দোকানদার কর্তৃক বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং কিভাবে আপন মনোবলে আত্মরক্ষা করে।

সংবাদপত্রভোজীরা কদিন ধরে এই নিয়ে আলোচনা চালায়। ছোটলোকের স্পর্ধা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়।

রায়চৌধুরী দুর্বৃত্ত ভাইপোর জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে রাজী হন না। তাই জরিমানার টাকা 'অনাদায়' হওয়ায় আদালত সেলস্‌ম্যান চিত্ত রায়কে তার ধৃষ্টতার জন্য পনের দিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করান।

ঠিক সেই সময় জজসাহেবের মেয়ের বিয়ের বিরাট সমারোহে অভিজাত পাড়া আহ্লাদে টলমল করতে থাকে।

'পসারিনী' থেকেই বিয়ের যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য সওদা করা হয়। রায়চৌধুরী তাঁর বাঘা শরীর নিয়ে নিজে এসে দোকানে বসেন। চাকরে সাহায্য করে।

কিছুদিনের জন্যে দোকানটা একটু কানা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু রায়চৌধুরীর আকুতিতে আবার সকলেরই মন গলেছে প্রাণ টলেছে।

উত্তর পত্র

আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বাড়ি এল রমাপতি। মনে করতে চেষ্টা করছে সকালে কার মুখ দেখে উঠেছে। হ্যাঁ, এসব এখনো মানে রমাপতি। হাঁচি, টিকটিকি, এক চোখ দেখানো, জুতো উল্টেরাখা, 'ধোবা' আর 'ছুঁচে'র নামের মহিমা, সবই মানে। তেরোদশীতে বেগুন খাওয়ার আর শনি মঙ্গলে নতুন কাপড় পরার নিষেধেও সে ঘোরতর বিশ্বাসী। শুধু মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে হয়, এই পুরনো প্রথায় আর বিশ্বাসী নেই।

তাই আজ ওপরতলার এই 'অগাধ করুণা'র প্রস্তাব-স্পর্শে সারাদিন রোমাঞ্চ হয়েছে রমাপতির। এ 'সাহেব' নতুন। কিছুদিন হল এসেছেন, আর এসেই অফিসে নানাবিধ নতুন পদ্ধতি চালু করতে শুরু করেছেন। হেড্‌ক্লার্ক রমাপতির কাছে এ প্রস্তাব, সেই 'নতুনের'ই এক আইডিয়া।

এ ডিপার্টমেণ্টে কোনোদিন মেয়ে ছিল না। সেন সাহেব সেটা রাখতে চান। বলছেন, কেন থাকবে না? যে যুগে যে ধরন! ডেস্‌প্যাচে লোকের দরকার হচ্ছে, ওখানেই একজন মেয়ে নেওয়া হোক।

আগের সাহেব ছিলেন বাঘা।

'অমায়িকতা' কথাটার বানান জানতেন না তিনি। এ সাহেবের ডাঁটও যেমন অমায়িকতাও তেমন। অধস্তনদের সঙ্গে যখন কথা বলেন, মনে হয় মনিবের সঙ্গেই কথা বলছেন বা!

কারো কাজের মধ্যে ভুল দেখলে, তাকে ডেকে পাঠিয়ে 'যাচ্ছেতাই' করার বদলে, নিজে তার টেবিলে এসে বিনয়ে মধুর হয়ে বলেন,'দেখুন, এটা কি আমাদের ঠিক হচ্ছে? ধরুন, যদি আমরা চিঠির সেকেণ্ড প্যারাটা এইভাবে লিখি?'

সাহেব নিজে উঠে আসার জন্যে কেউ যদি তদ্‌ব্যস্ত হয়, উনি আরো মধুর হন। বলেন, 'ক্ষতি কি? কাজের সময় ডেকে ডিস্‌টার্ব করবো কেন?'

অথচ যখন হেঁটে ফিরে যাবেন, মনে হবে—উঃ কী ডাঁট!

এখনো সেই ডাঁটের সঙ্গে বিনয়ের একটি মাত্রাজ্ঞান সম্বলিত সামঞ্জস্য বজায় রেখে হেড্‌ক্লার্ক রমাপতিকে বললেন, 'আপনার কোন্ একটি মেয়ে থার্ডইয়ারে পড়ছে বলছিলেন না?'

রমাপতি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, 'আমার ওই একটিই মাত্র মেয়ে স্যর!'

'বেশ!'

সাহেব 'একটি মাত্র মেয়ে'র তথ্য লাভেও নতুন আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, 'বেশ! ইচ্ছে করলে আপনার মেয়েকে দিয়ে একটা এ্যাপ্লিকেশন দেওয়াতে পারেন। অবশ্য কাজ আমরা প্রপার চ্যানেলেই করতে চাই। তবে কোয়ালিফিকেশন বুঝলে কেন নেব না? তবে—' সাহেব একটু হাসলেন, 'চেনা জানা হলে তো ভালই! আজকালকার চাকুরে মেয়েরা তো বেশ একটু ভীতিকর! কী বলেন তাই না?'

রমাপতি যদিও অনেক বছর কাজ করছে, তবু এখনো 'সাহেব' দেখলেই 'নার্ভাস' হয়ে যায়, আর 'সাহেব' কোনো প্রশ্ন করলেই বেসামাল হয়ে পড়ে।

তাই হাত কচলে তাড়াতাড়ি বলে বসে, 'যা বলেছেন স্যর! এই আধুনিক মেয়েগুলো মেয়ে তো নয়, যেন এক একখানা ছুরি! দেখলেই ভয় করে। তা ছাড়া একটা মেয়ে এসেই হয়তো অফিস সুদ্ধ সকলের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে!'

সাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'আপনাদের এই অফিসের 'মস্তিষ্ক' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা এখনো নেই আমার! তবে সেদিক থেকেও তাহলে আপনার মেয়েই প্রেফারেব্‌ল! আপনি যখন রয়েছেন তখন আর—'

'যা বলেছেন স্যর—' রমাপতি আর একবার হাত কচলায়, 'আমার

সামনে থেকে আর কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই—আচ্ছা কালই আমি এ্যাপ্লিকেশন দেওয়াবো স্যর !'

এটা অবশ্য সাহেব নিজের ঘরে ডেকেই বলেছিলেন।

চলে এলো রমাপতি হাওয়ায় দুলতে দুলতে। বাড়ি ফিরলো আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে।

প্রথমে মেয়েকে নয়।

প্রথমে চুপি চুপি স্ত্রীকে।

শুনে সুমতি আবেগে শিথিল হলো। শিথিল কণ্ঠেই বললো, 'হ্যাঁ গো কত দেবে !'

'কত ?'

রমাপতি 'তুচ্ছ করা' সুরে বলে, 'কত আর ? 'ডেসপ্যাচে' তো ? বড়জোর শ দুই ! তবে—'

যেন রমাপতির সংসারে হঠাৎ বাড়তি দুশো টাকাটা কিছুই নয় ! যেন নিজে রমাপতি অফিসে ঢুকেই দুশো টাকার বেশী পেয়েছিল !

তবু স্ত্রীর কাছে বিশ্বনস্যাৎ সুরে কথা বলার একটা সুখ আছে।

সুমতি বলে ওঠে, 'তা' সে যাই হোক, ও টাকাটা কিন্তু আমি নিজের হাতে রাখবো, অবিশ্যি ওর ট্রাম বাসের খরচা দেব ও থেকে—'

রমাপতি হেসে বলে, 'নিজের হাতে আর কোনটা না রাখছো ?'

'পোড়াকপাল আমার ! তোমার টাকা আমি রাখছিই বটে ! তোমার এই দস্যি সংসার পুষে একটা পয়সা থাকে ? না না, 'জুলি'র টাকাটা আমি ইচ্ছে মতন খরচ করবো !'

জুলি অর্থাৎ উজ্জ্বলা সম্পর্কে এবং তার টাকা সম্পর্কে অনেক আলোচনা অন্তে রমাপতি তাকে ডাকে, এবং সাহেবের বিচক্ষণতার প্রসঙ্গে গৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেবের প্রস্তাবটা শুনিয়ে বলে ওঠে, 'ও, সাহেব যখন নিজে থেকে বলেছে, ধরে নে হয়েই গেছে।...... এ্যাপ্লিকেশনটা ছল !'

আরো কিছু আশ্বাসের বাণী শোনাতে যাচ্ছিল রমাপতি মেয়েকে, কিন্তু দুম্ করে এক বিজাতীয় কথা বলে বসে উজ্জ্বলা।

বলে, 'আমি এখন চাকরিটা নিতে যাবো কি করে? পড়াবন্ধ করে?'

রমাপতি এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ভেবেছিল টাকার অঙ্কটা শুনেই মেয়ের মাথা ঘুরে যাবে। সে রকম নিদর্শন না পেয়ে ভুরু কুঁচকে বললো 'পড়া! ওঃ! তা বন্ধ করতে না চাও, বাকীটা প্রাইভেটে পড়ে একজামিন দিও।'

'সে হয় না', বলে উজ্জ্বলা প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করে চলে যেতে চায়, যেতে পারে না। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রমাপতির উগ্র মন্তব্যে।

মেয়ের ওই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে অপমানাহত, আর আশাভঙ্গে বিচলিত রমাপতি উগ্রস্বরে বলে ওঠে, 'সে হয় না? নবাব কন্যের রায় দেওয়া হয়ে গেল! বলি পড়াটা কি জন্যে? রোজগারের জন্যেই তো? সেটাই যখন হয়ে যাচ্ছে—'

'পড়াটা শুধুই রোজগারের জন্যে বাবা?'

উজ্জ্বলা বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়।

আর বলাই বাহুল্য রমাপতি এ দৃষ্টিতে ক্ষেপে ওঠে। প্রায় গর্জন করে বলে, 'বুঝলাম না হয় জ্ঞান অর্জনের জন্যেই পড়া। তা সেটা ইচ্ছেমত আউট বুক্ পড়েও হতে পারে, ডিগ্রীর মধ্যেই সব জ্ঞান ভরা নেই!'

উজ্জ্বলা একমিনিট চুপ করে থেকে বলে—

'তবু সবাই ডিগ্রীর জন্যেই খাটে বাবা!'

'সেটা ওই জন্যেই। ওই চাকরির বাজারে দর বাড়াবার জন্যেই।'

বলে নস্যির কৌটোটা খুলতে থাকে রমাপতি।

উজ্জ্বলা আস্তে বলে, 'তা হলেও তো সেই এক কথাই হলো বাবা, এম. এ. পাস করলে অবশ্যিই দর আরো বাড়বে!'

'এম. এ.! আবার এম্. এ. পাসের ভাবনাও ভাবছো তা'হলে?'

উজ্জ্বলা বাবার এই আকস্মিক ক্ষিপ্ততায় অবাক্ হয়ে যায়। বি. এ. তে যখন অনার্স নিয়েছিল, কই বাবা তো খুব কিছু রাগ করেনি! বলেনি তো 'অনার্স নিয়ে কি হবে? তুই তো আর এম্. এ. পড়তে যাচ্ছিস না?'

বলেনি।

না সত্যিই বলেনি।

তার কারণ, আজ সকাল পর্যন্তও মেয়ের থেকে আর্থিক সুবিধার কথা ভাবেনি রমাপতি।

এ ভাবনাটা তার 'সাহেবের' অবদান!

আর সেই কারণেই এমন গভীর মর্মস্পর্শী!

হয়তো মেয়ের চাকরির কথা অন্য কেউ বললে ভাল করে কানেও নিত না রমাপতি। কিন্তু এ যে বড় ভয়ানক! এ যে 'সাহেবের' অনুরোধ, এর মধ্যে সাহেবের মান সম্মান জড়িত!

সেই সম্মানটা কী করে রক্ষা হবে, যদি রমাপতি এখন গিয়ে বলে, 'মেয়ে অ্যাপ্লাই করতে রাজী হল না স্যর! আরো পড়তে চায়!'

সাহেব তার বদলে তাঁর সেই ডাঁটে ভরা অমায়িক চোখ দুটি তুলে বলবেন না 'আরো পড়তে চায়? ওঃ! তাহলে তো ভালই!'

সে চোখ দুটি কার দিকে তুলবেন?

এই রমাপতির দিকেই তো?

যে রমাপতিকে তার পরেও সাহেবের চোখের সামনেই থাকতে হবে!

অতএব রমাপতিকে মেয়ের মুখের ওপর বলতেই হয়, 'আবার এম. এ. পাসের কথাও ভাবছ?'

উজ্জ্বলা সে আকস্মিকতায় অবাক্ হয়।

কিন্তু অবাক্ হয়ে কি চুপ করে যাবে উজ্জ্বলা?

তাই কি যায় একালের মেয়েরা?

অন্ততঃ উজ্জ্বলা গেল না।

উজ্জ্বলা যেন একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠলো, 'ভাববো না কেন বাবা? গোড়া থেকেই তো ভাবছি। প্রফেসারী করার ইচ্ছে আমার, একথা যে কোনোদিন না শুনেছ তাও নয়?'

সাহেবের চিন্তায় মর্মাহত, টাকার ব্যাপারে আশাহত, আর মেয়ের এই ব্যঙ্গহাসিতে অপমানাহত রমাপতি মেজাজে আর 'টান' রাখতে পারে না।

প্রায় খিঁচিয়ে বলে ওঠে—

'হ্যাঁ শুনেছি। শুনেছি, চুপ করে থেকেছি। ধোবার গাধা আমি মোট বইতে এসেছি, মোট বয়ে চলে যাবো। যে ফর্সা কাপড় পরবার সে পরবে।...কিন্তু এটাও না বলে পারছি না, খুব তো বাপের মুখের ওপর জ্ঞান অর্জনের বড়াই দেখালে, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষার গোড়ার কথাটা কি তা ভেবে দেখেছ কোনোদিন? কর্তব্য, বুঝলে? ওই গোড়ার কথাটা হচ্ছে কর্তব্য। জ্ঞান মানেই কর্তব্যজ্ঞান। কই এটা তো মনে হল না তোমার, বাবা ব্যাটা সেই বাইশ বছর থেকে এই বাহান্ন বছর পর্যন্ত খেটেই চলেছে, তাকে সাহায্য করার কেউ নেই! তোমার এম. এ. পাসের কেরিয়ার তৈরি হতে হতে সে ব্যাটা পটল তুলতে পারে!'

হ্যাঁ, এই ভাবেই মেয়ের ব্যঙ্গ হাসির জবাব দেয় রমাপতি।

নিজের প্রায় অসুরের মত শক্তিসম্পন্ন দেহটা নিয়েও 'পটল তোলা'র ভয় দেখাতে বাধে না তার। এবং কথাগুলো বলে হাঁপাতেও বাধে না।

উজ্জ্বলা এই হাঁপানোর দিকে একমিনিট তাকিয়ে সহসা শান্ত আর নম্র গলায় বলে, 'আমার ভুল হয়েছিল বাবা! ঠিক আছে, কালই এ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে দেব।'

রমাপতি মেয়ের এই সহসা নম্রতায় একটু অপ্রতিভ হয়। আর সেটা ঢাকতেই বোধ করি পুরনো টোন্‌টা ছাড়তে পারে না। বলে,

'দরকার নেই। আমার মুখ চাইবার দরকার নেই কারো। সাহেবের মুখটা গেল এই যা! বড় মুখ করে বললো—'

উজ্জ্বলা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুমতি বললো, 'দেখলে মেয়ের মেজাজ?'

রমাপতি নিঃশ্বাস ফেলে বললো 'দেখলাম!'

কিন্তু এই সব 'দেখাদেখি' সত্ত্বেও উজ্জ্বলা আর তার সংকল্প ত্যাগ করল না। উজ্জ্বলা ইনটারভ্যু দিয়ে এল, এবং চাকরিটা পেয়েও গেল।

এরপরও কি আর রমাপতি সেই অপ্রতিভ হয়ে থাকার জের টানবে?

তা টানে না। রমাপতি সেসব ভুলে গেল।

রমাপতি মেয়েকে নিজের পাশে বসিয়ে খাইয়ে, নিজের সঙ্গে ট্রামে চাপিয়ে অফিসে নিয়ে এল।

আর তার পর তাকে বসিয়ে রেখে একমুখ হাসি নিয়ে সাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'নিয়ে এলাম স্যর!'

সাহেব চোখ তুলে বিস্মিতের সুর চোখে ফুটিয়ে বললেন, 'কী নিয়ে এলেন?'

হাসিটা একটু নিষ্প্রভ হল।

রমাপতি আস্তে বললো, 'মেয়েকে স্যর!'

'মেয়েকে!'

সাহেব যেন স্মৃতির সমুদ্রের অতলে ডুবুরি নামিয়েছেন। যেন 'মেয়ে' শব্দটার মানে খুঁজছেন। মানে পেলেন না, বললেন, 'মেয়ের কথা কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো'!

মুখের সব আলো নিভে গেল।

তমসাচ্ছন্ন রমাপতি আরো আস্তে বললো, সেই যে 'ডেসপ্যাচে লোক নেবার কথা ছিল—'

'ও হো হো!'

সাহেব যেন অথই জল থেকে উঠে এলেন। বললেন, 'মনে

পড়েছে, একটা ইনটারভ্যু হলো সেদিন, তাই না ? মেয়ে ছিল একটিই মনে হচ্ছে—'

রমাপতি নীরবে মাথা হেলালো।

সাহেব বললেন, 'সে মেয়ে কি আপনারই নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গুড্। কাজ টাজ বুঝিয়ে দেবেন !'

বলে সাহেব হঠাৎ আবার কাজের সমুদ্রে ডুবে গেলেন, রমাপতি নামক লোকটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে।

রমাপতি ফিরে এসে বসলো নিজের চেয়ারে। অনেকক্ষণ বসে রইল, আর তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলো, তার মেয়েও যেন ভুলে গেছে সে কথা।

এ অফিসে যে উজ্জ্বলা আজ নতুন এসেছে, এবং তার বাবার হাত ধরেই এসেছে, সেটা মনে রাখার সৌজন্য নেই যেন উজ্জ্বলার।

একবারও বাবার খোঁজ করলো না এতক্ষণের মধ্যে।

রমাপতি অতএব নিজেই উঠে গেল। দেখলো মৃগাঙ্কবাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিচ্ছে সে। ডেস্‌প্যাচের প্রধান মৃগাঙ্ক ঘোষ।

রমাপতিকে দেখে মৃগাঙ্ক বলে উঠলো, 'এই যে রমাপতিবাবু, আপনার মেয়ে তো দেখছি ভেরি ইন্‌টেলিজেণ্ট! এই ছ'ঘণ্টার মধ্যেই—'

উজ্জ্বলা কৃতিত্বের গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে বাবার দিকে তাকাল না, যেমন কাজ করছিল করতেই লাগলো।

রমাপতি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আচ্ছা শেখান !'

চলে এল।

তবু টিফিনের সময় আবার নিজেই মান খুইয়ে মেয়ের কাছে আসতে হলো, বার করতে হলো সুমতির দেওয়া বড় সাইজের টিফিন কৌটো

কিন্তু উজ্জ্বলার যদি খিদে না থাকে, সে কি করবে ?

রমাপতিকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ? উপায় কি ?

অফিসের অন্যরা বললো, 'আপনার মেয়ে খুব 'শাই' দেখছি রমাপতিবাবু ! অন্য মেয়ে হলে এতক্ষণ পাঁচবার বাপের কাছে ছুট ছুট করে আসতো !'

অতএব রমাপতিকে বলতেই হলো 'আর বলবেন না ! ওই লজ্জার জন্যে—' ইত্যাদি ।

সেদিন অবশ্য ফেরার সময় বাপের সঙ্গেই ফিরলো উজ্জ্বলা, কিন্তু পরদিনই স্বচ্ছন্দে বললো, 'তুমি বরং ততক্ষণ এগোও বাবা, আমার একটু দেরি আছে।'

রমাপতির মনে হলো তক্ষুনি জুতো মস্‌মসিয়ে চলে আসে। কিন্তু মেয়ে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরলে সুমতির ধিক্কার বাণীটা এত প্রবল হবে সেটা স্মরণ করে কপাল কুঁচকে বললে, 'দেরি আবার কিসের ? অফিস টাইম হয়ে গেছে—'

উজ্জ্বলা মাথা না তুলেই বললো, 'তা' হোক, আমার নিজেরই কাজটা একটু 'শ্লো' হচ্ছে। যে চিঠিগুলো হয়ে ওঠেনি—যাচ্ছি একটু পরেই যাচ্ছি। তুমি কেন মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে ?'

কথাটা মিথ্যে নয়।

মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো যুক্তি নেই। উজ্জ্বলাকে কি এতাবৎ কাল তার বাবা স্কুলে কলেজে পৌঁছে দিয়েছে ?

দু'চার দিন পর থেকে অফিস যাবার সময়ও উজ্জ্বলার বাপের সঙ্গে যাওয়া হয়ে ওঠে না। হয়তো শাড়ি পরা হয় না। বলে, 'তুমি এগোও বাবা, আমি যাচ্ছি ?'

সুমতি তীব্র আপত্তি করে, বলে, 'বাপের সঙ্গে যাবি আসবি, এত সুখের চাকরি হলো, সেটা সুবিধে হচ্ছে না ?'

উজ্জ্বলা বলে, 'সেরে না নিতে পারলে কী করবো ?'

রমাপতি বিষণ্নমুখে বলে, 'রোজ রোজ লেট্ হচ্ছে সেটা লজ্জার বিষয় নয়?'

উজ্জ্বলা অম্লান মুখে বলে, 'লজ্জার আবার কি! ওদিকে তো কতক্ষণ থাকি! তা' ছাড়া খাতায় তো আর লেট্ মার্ক পড়ে না!'

'পড়ে না? যখন ইচ্ছে তখন যাচ্ছো, লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার! আর ওঁর লেট্ মার্ক পড়ে না!'

'খাতাটা উল্টে দেখো।'

বলে মৃদু হেসে চলে যায় উজ্জ্বলা, বোধ হয় কেয়ারি করে চুল বাঁধতে!

রমাপতি অস্ফুটে বলে, 'হারামজাদীকে নিজের অফিসে নেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে!'

সুমতি সেই অস্ফুটেরই অস্ফুট উত্তর দেয়, 'এত বড় বজ্জাতি করবে কে জানতো বল? তুমি ওর ও চাকরি ঘোচাও।'

কিন্তু রমাপতির কি এখন আর সাধ্য আছে ওর চাকরি ঘোচাবার? ওতো আর ওখানে রমাপতির মেয়ে মাত্র নয়! একজন কর্মী! সহ-কর্মীর চাকরি খাবার ক্ষমতা কোথায় পাবে রমাপতি?

আর বাড়িতে?

যেখানে 'মেয়ে' পরিচয়টাই একমাত্র? সেখানে কি রমাপতি জোর করে দাবিয়ে রাখতে পারে না? বলতে পারে না, 'থাক্, তোমার আর চাকরি করতে হবে না!'

না, এখন আর বলা যায় না।

রমাপতি নিজেই চেষ্টাযত্ন করে উজ্জ্বলাকে যে ক্ষমতার অধিকারিণী করে দিয়েছে, সেই ক্ষমতার বলেই উজ্জ্বলা তার সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ওকে রুখবার ক্ষমতা আর নেই রমাপতির।

হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আর সমকক্ষও থাকবে না রমাপতির, হয়তো ছাড়িয়ে যাবে তাকে। কারণ পদোন্নতির সবচেয়ে সহজ আর সংক্ষিপ্ত পথটাই ক্রমশঃ রপ্ত করছে উজ্জ্বলা।

উত্তর পত্র

আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বাড়ি এল রমাপতি। মনে করতে চেষ্টা করছে সকালে কার মুখ দেখে উঠেছে। হ্যাঁ, এসব এখনো মানে রমাপতি। হাঁচি, টিকটিকি, এক চোখ দেখানো, জুতো উল্টেরাখা, 'ধোবা' আর 'ছুঁচে'র নামের মহিমা, সবই মানে। তেরোদশীতে বেগুন খাওয়ার আর শনি মঙ্গলে নতুন কাপড় পরার নিষেধেও সে ঘোরতর বিশ্বাসী। শুধু মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে হয়, এই পুরনো প্রথায় আর বিশ্বাসী নেই।

তাই আজ ওপরতলার এই 'অগাধ করুণা'র প্রস্তাব-স্পর্শে সারাদিন রোমাঞ্চ হয়েছে রমাপতির। এ 'সাহেব' নতুন। কিছুদিন হল এসেছেন, আর এসেই অফিসে নানাবিধ নতুন পদ্ধতি চালু করতে শুরু করেছেন। হেড ক্লার্ক রমাপতির কাছে এ প্রস্তাব, সেই 'নতুনের'ই এক আইডিয়া।

এ ডিপার্টমেন্টে কোনোদিন মেয়ে ছিল না। সেন সাহেব সেটা রাখতে চান। বলছেন, কেন থাকবে না? যে যুগে যে ধরন! ডেস্‌প্যাচে লোকের দরকার হচ্ছে, ওখানেই একজন মেয়ে নেওয়া হোক।

আগের সাহেব ছিলেন বাঘা।

'অমায়িকতা' কথাটার বানান জানতেন না তিনি। এ সাহেবের ডাঁটও যেমন অমায়িকতাও তেমন। অধস্তনদের সঙ্গে যখন কথা বলেন, মনে হয় মনিবের সঙ্গেই কথা বলছেন বা!

কারো কাজের মধ্যে ভুল দেখলে, তাকে ডেকে পাঠিয়ে 'যাচ্ছেতাই' করার বদলে, নিজে তার টেবিলে এসে বিনয়ে মধুর হয়ে বলেন,'দেখুন, এটা কি আমাদের ঠিক হচ্ছে? ধরুন, যদি আমরা চিঠির সেকেণ্ড প্যারাটা এইভাবে লিখি?'

সাহেব নিজে উঠে আসার জন্যে কেউ যদি তদ্‌ব্যস্ত হয়, উনি আরো মধুর হন। বলেন, 'ক্ষতি কি? কাজের সময় ডেকে ডিস্‌টার্ব করবো কেন?'

অথচ যখন হেঁটে ফিরে যাবেন, মনে হবে—উঃ কী ডাঁট!

এখনো সেই ডাঁটের সঙ্গে বিনয়ের একটি মাত্রাজ্ঞান সম্বলিত সামঞ্জস্য বজায় রেখে হেড্‌ক্লার্ক রমাপতিকে বললেন, 'আপনার কোন্‌ একটি মেয়ে থার্ডইয়ারে পড়ছে বলছিলেন না?'

রমাপতি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, 'আমার ওই একটিই মাত্র মেয়ে স্যর!'

'বেশ!'

সাহেব 'একটি মাত্র মেয়ে'র তথ্য লাভেও নতুন আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, 'বেশ! ইচ্ছে করলে আপনার মেয়েকে দিয়ে একটা এ্যাপ্লিকেশন দেওয়াতে পারেন। অবশ্য কাজ আমরা প্রপার চ্যানেলেই করতে চাই। তবে কোয়ালিফিকেশন বুঝলে কেন নেব না? তবে—' সাহেব একটু হাসলেন, 'চেনা জানা হলে তো ভালই! আজকালকার চাকুরে মেয়েরা তো বেশ একটু ভীতিকর! কী বলেন তাই না?'

রমাপতি যদিও অনেক বছর কাজ করছে, তবু এখনো 'সাহেব' দেখলেই 'নার্ভাস' হয়ে যায়, আর 'সাহেব' কোনো প্রশ্ন করলেই বেসামাল হয়ে পড়ে।

তাই হাত কচলে তাড়াতাড়ি বলে বসে, 'যা বলেছেন স্যর! এই আধুনিক মেয়েগুলো মেয়ে তো নয়, যেন এক একখানা ছুরি! দেখলেই ভয় করে। তা ছাড়া একটা মেয়ে এসেই হয়তো অফিস সুদ্ধ সকলের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে!'

সাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'আপনাদের এই অফিসের 'মস্তিষ্ক' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা এখনো নেই আমার! তবে সেদিক থেকেও তাহলে আপনার মেয়েই প্রেফারেব্‌ল! আপনি যখন রয়েছেন তখন আর—'

'যা বলেছেন স্যর—' রমাপতি আর একবার হাত কচলায়, 'আমার

সামনে থেকে আর কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই—আচ্ছা কালই আমি এ্যাপ্লিকেশন দেওয়াবো স্যর !'

এটা অবশ্য সাহেব নিজের ঘরে ডেকেই বলেছিলেন।

চলে এলো রমাপতি হাওয়ায় দুলতে দুলতে। বাড়ি ফিরলো আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে।

প্রথমে মেয়েকে নয়।

প্রথমে চুপি চুপি স্ত্রীকে।

শুনে সুমতি আবেগে শিথিল হলো। শিথিল কণ্ঠেই বললো, 'হ্যাঁ গো কত দেবে !'

'কত ?'

রমাপতি 'তুচ্ছ করা' সুরে বলে, 'কত আর ? 'ডেসপ্যাচে' তো ? বড়জোর শ দুই ! তবে—'

যেন রমাপতির সংসারে হঠাৎ বাড়তি দুশো টাকাটা কিছুই নয় ! যেন নিজে রমাপতি অফিসে ঢুকেই দুশো টাকার বেশী পেয়েছিল !

তবু স্ত্রীর কাছে বিশ্বনস্যাৎ সুরে কথা বলার একটা সুখ আছে।

সুমতি বলে ওঠে, 'তা' সে যাই হোক, ও টাকাটা কিন্তু আমি নিজের হাতে রাখবো, অবিশ্যি ওর ট্রাম বাসের খরচা দেব ও থেকে—'

রমাপতি হেসে বলে, 'নিজের হাতে আর কোনটা না রাখছো ?'

'পোড়াকপাল আমার ! তোমার টাকা আমি রাখছিই বটে ! তোমার এই দস্যি সংসার পুষে একটা পয়সা থাকে ? না না, 'জুলি'র টাকাটা আমি ইচ্ছে মতন খরচ করবো !'

জুলি অর্থাৎ উজ্জ্বলা সম্পর্কে এবং তার টাকা সম্পর্কে অনেক আলোচনা অন্তে রমাপতি তাকে ডাকে, এবং সাহেবের বিচক্ষণতার প্রসঙ্গে গৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেবের প্রস্তাবটা শুনিয়ে বলে ওঠে, 'ও, সাহেব যখন নিজে থেকে বলেছে, ধরে নে হয়েই গেছে।...... এ্যাপ্লিকেশনটা ছল !'

আরো কিছু আশ্বাসের বাণী শোনাতে যাচ্ছিল রমাপতি মেয়েকে, কিন্তু দুম্ করে এক বিজাতীয় কথা বলে বসে উজ্জ্বলা।

বলে, 'আমি এখন চাকরিটা নিতে যাবো কি করে? পড়াবন্ধ করে?'

রমাপতি এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ভেবেছিল টাকার অঙ্কটা শুনেই মেয়ের মাথা ঘুরে যাবে। সে রকম নিদর্শন না পেয়ে ভুরু কুঁচকে বললো 'পড়া! ওঃ! তা বন্ধ করতে না চাও, বাকীটা প্রাইভেটে পড়ে একজামিন দিও।'

'সে হয় না', বলে উজ্জ্বলা প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করে চলে যেতে চায়, যেতে পারে না। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রমাপতির উগ্র মন্তব্যে।

মেয়ের ওই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে অপমানাহত, আর আশাভঙ্গে বিচলিত রমাপতি উগ্রস্বরে বলে ওঠে, 'সে হয় না? নবাব কন্যের রায় দেওয়া হয়ে গেল! বলি পড়াটা কি জন্যে? রোজগারের জন্যেই তো? সেটাই যখন হয়ে যাচ্ছে—'

'পড়াটা শুধুই রোজগারের জন্যে বাবা?'

উজ্জ্বলা বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়।

আর বলাই বাহুল্য রমাপতি এ দৃষ্টিতে ক্ষেপে ওঠে। প্রায় গর্জন করে বলে, 'বুঝলাম না হয় জ্ঞান অর্জনের জন্যেই পড়া। তা সেটা ইচ্ছেমত আউট বুক্ পড়েও হতে পারে, ডিগ্রীর মধ্যেই সব জ্ঞান ভরা নেই!'

উজ্জ্বলা একমিনিট চুপ করে থেকে বলে—

'তবু সবাই ডিগ্রীর জন্যেই খাটে বাবা!'

'সেটা ওই জন্যেই। ওই চাকরির বাজারে দর বাড়াবার জন্যেই।'

বলে নস্যির কৌটোটা খুলতে থাকে রমাপতি।

উজ্জ্বলা আস্তে বলে, 'তা হলেও তো সেই এক কথাই হলো বাবা, এম. এ. পাস করলে অবশ্যিই দর আরো বাড়বে!'

'এম. এ.! আবার এম্. এ. পাসের ভাবনাও ভাবছো তা'হলে?'

উজ্জ্বলা বাবার এই আকস্মিক ক্ষিপ্ততায় অবাক্ হয়ে যায়। বি. এ. তে যখন অনার্স নিয়েছিল, কই বাবা তো খুব কিছু রাগ করেনি! বলেনি তো 'অনার্স নিয়ে কি হবে? তুই তো আর এম্. এ. পড়তে যাচ্ছিস না?'

বলেনি।

না সত্যিই বলেনি।

তার কারণ, আজ সকাল পর্যন্তও মেয়ের থেকে আর্থিক সুবিধার কথা ভাবেনি রমাপতি।

এ ভাবনাটা তার 'সাহেবের' অবদান!

আর সেই কারণেই এমন গভীর মর্মস্পর্শী!

হয়তো মেয়ের চাকরির কথা অন্য কেউ বললে ভাল করে কানেও নিত না রমাপতি। কিন্তু এ যে বড় ভয়ানক! এ যে 'সাহেবের' অনুরোধ, এর মধ্যে সাহেবের মান সম্মান জড়িত!

সেই সম্মানটা কী করে রক্ষা হবে, যদি রমাপতি এখন গিয়ে বলে, 'মেয়ে অ্যাপ্লাই করতে রাজী হল না স্যর! আরো পড়তে চায়!'

সাহেব তার বদলে তাঁর সেই ডাঁটে ভরা অমায়িক চোখ ছুটি তুলে বলবেন না 'আরো পড়তে চায়? ওঃ! তাহলে তো ভালই!'

সে চোখ ছুটি কার দিকে তুলবেন?

এই রমাপতির দিকেই তো?

যে রমাপতিকে তার পরেও সাহেবের চোখের সামনেই থাকতে হবে!

অতএব রমাপতিকে মেয়ের মুখের ওপর বলতেই হয়, 'আবার এম. এ. পাসের কথাও ভাবছ?'

উজ্জ্বলা সে আকস্মিকতায় অবাক্ হয়।

কিন্তু অবাক্ হয়ে কি চুপ করে যাবে উজ্জ্বলা?

তাই কি যায় একালের মেয়েরা?

অন্ততঃ উজ্জ্বলা গেল না।

উজ্জ্বলা যেন একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠলো, 'ভাববো না কেন বাবা? গোড়া থেকেই তো ভাবছি। প্রফেসারী করার ইচ্ছে আমার, একথা যে কোনোদিন না শুনেছ তাও নয়?'

সাহেবের চিন্তায় মর্মাহত, টাকার ব্যাপারে আশাহত, আর মেয়ের এই ব্যঙ্গহাসিতে অপমানাহত রমাপতি মেজাজে আর 'টান' রাখতে পারে না।

প্রায় খিঁচিয়ে বলে ওঠে—

'হ্যাঁ শুনেছি। শুনেছি, চুপ করে থেকেছি। ধোবার গাধা আমি মোট বইতে এসেছি, মোট বয়ে চলে যাবো। যে ফর্সা কাপড় পরবার সে পরবে।...কিন্তু এটাও না বলে পারছি না, খুব তো বাপের মুখের ওপর জ্ঞান অর্জনের বড়াই দেখালে, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষার গোড়ার কথাটা কি তা ভেবে দেখেছ কোনোদিন? কর্তব্য, বুঝলে? ওই গোড়ার কথাটা হচ্ছে কর্তব্য। জ্ঞান মানেই কর্তব্যজ্ঞান। কই এটা তো মনে হল না তোমার, বাবা ব্যাটা সেই বাইশ বছর থেকে এই বাহান্ন বছর পর্যন্ত খেটেই চলেছে, তাকে সাহায্য করার কেউ নেই! তোমার এম. এ. পাসের কেরিয়ার তৈরি হতে হতে সে ব্যাটা পটল তুলতে পারে!'

হ্যাঁ, এই ভাবেই মেয়ের ব্যঙ্গ হাসির জবাব দেয় রমাপতি।

নিজের প্রায় অসুরের মত শক্তিসম্পন্ন দেহটা নিয়েও 'পটল তোলা'র ভয় দেখাতে বাধে না তার। এবং কথাগুলো বলে হাঁপাতেও বাধে না।

উজ্জ্বলা এই হাঁপানোর দিকে একমিনিট তাকিয়ে সহসা শান্ত আর নম্র গলায় বলে, 'আমার ভুল হয়েছিল বাবা! ঠিক আছে, কালই এ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে দেব।'

রমাপতি মেয়ের এই সহসা নম্রতায় একটু অপ্রতিভ হয়। আর সেটা ঢাকতেই বোধ করি পুরনো টোন্‌টা ছাড়তে পারে না। বলে,

'দরকার নেই। আমার মুখ চাইবার দরকার নেই কারো। সাহেবের মুখটা গেল এই যা! বড় মুখ করে বললো—'

উজ্জ্বলা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুমতি বললো, 'দেখলে মেয়ের মেজাজ?'

রমাপতি নিঃশ্বাস ফেলে বললো 'দেখলাম!'

কিন্তু এই সব 'দেখাদেখি' সত্ত্বেও উজ্জ্বলা আর তার সংকল্প ত্যাগ করল না। উজ্জ্বলা ইনটারভ্যু দিয়ে এল, এবং চাকরিটা পেয়েও গেল।

এরপরও কি আর রমাপতি সেই অপ্রতিভ হয়ে থাকার জের টানবে?

তা টানে না। রমাপতি সেসব ভুলে গেল।

রমাপতি মেয়েকে নিজের পাশে বসিয়ে খাইয়ে, নিজের সঙ্গে ট্রামে চাপিয়ে অফিসে নিয়ে এল।

আর তার পর তাকে বসিয়ে রেখে একমুখ হাসি নিয়ে সাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'নিয়ে এলাম স্যর!'

সাহেব চোখ তুলে বিস্মিতের সুর চোখে ফুটিয়ে বললেন, 'কী নিয়ে এলেন?'

হাসিটা একটু নিষ্প্রভ হল।

রমাপতি আস্তে বললো, 'মেয়েকে স্যর!'

'মেয়েকে!'

সাহেব যেন স্মৃতির সমুদ্রের অতলে ডুবুরি নামিয়েছেন। যেন 'মেয়ে' শব্দটার মানে খুঁজছেন। মানে পেলেন না, বললেন, 'মেয়ের কথা কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো'!

মুখের সব আলো নিভে গেল।

তমসাচ্ছন্ন রমাপতি আরো আস্তে বললো, সেই যে 'ডেসপ্যাচে লোক নেবার কথা ছিল—'

'ও হো হো!'

সাহেব যেন অথই জল থেকে উঠে এলেন। বললেন, 'মনে

পড়েছে, একটা ইনটারভ্যু হলো সেদিন, তাই না ? মেয়ে ছিল একটিই মনে হচ্ছে—'

রমাপতি নীরবে মাথা হেলালো।

সাহেব বললেন, 'সে মেয়ে কি আপনারই নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গুড্। কাজ টাজ বুঝিয়ে দেবেন !'

বলে সাহেব হঠাৎ আবার কাজের সমুদ্রে ডুবে গেলেন, রমাপতি নামক লোকটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে।

রমাপতি ফিরে এসে বসলো নিজের চেয়ারে। অনেকক্ষণ বসে রইল, আর তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলো, তার মেয়েও যেন ভুলে গেছে সে কথা।

এ অফিসে যে উজ্জ্বলা আজ নতুন এসেছে, এবং তার বাবার হাত ধরেই এসেছে, সেটা মনে রাখার সৌজন্য নেই যেন উজ্জ্বলার।

একবারও বাবার খোঁজ করলো না এতক্ষণের মধ্যে।

রমাপতি অতএব নিজেই উঠে গেল। দেখলো মৃগাঙ্কবাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিচ্ছে সে। ডেস্প্যাচের প্রধান মৃগাঙ্ক ঘোষ।

রমাপতিকে দেখে মৃগাঙ্ক বলে উঠলো, 'এই যে রমাপতিবাবু, আপনার মেয়ে তো দেখছি ভেরি ইন্‌টেলিজেন্ট ! এই দু'ঘণ্টার মধ্যেই—'

উজ্জ্বলা কৃতিত্বের গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে বাবার দিকে তাকাল না, যেমন কাজ করছিল করতেই লাগলো।

রমাপতি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আচ্ছা শেখান !'

চলে এল।

তবু টিফিনের সময় আবার নিজেই মান খুইয়ে মেয়ের কাছে আসতে হলো, বার করতে হলো সুমতির দেওয়া বড় সাইজের টিফিন কৌটো

কিন্তু উজ্জ্বলার যদি খিদে না থাকে, সে কি করবে?

রমাপতিকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে? উপায় কি?

অফিসের অন্যরা বললো, 'আপনার মেয়ে খুব 'শাই' দেখছি রমাপতিবাবু! অন্য মেয়ে হলে এতক্ষণ পাঁচবার বাপের কাছে হুট হুট করে আসতো!'

অতএব রমাপতিকে বলতেই হলো 'আর বলবেন না! ওই লজ্জার জন্যে—' ইত্যাদি।

সেদিন অবশ্য ফেরার সময় বাপের সঙ্গেই ফিরলো উজ্জ্বলা, কিন্তু পরদিনই স্বচ্ছন্দে বললো, 'তুমি বরং ততক্ষণ এগোও বাবা, আমার একটু দেরি আছে।'

রমাপতির মনে হলো তক্ষুনি জুতো মস্‌মসিয়ে চলে আসে। কিন্তু মেয়ে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরলে সুমতির ধিক্কার বাণীটা এত প্রবল হবে সেটা স্মরণ করে কপাল কুঁচকে বললে, 'দেরি আবার কিসের? অফিস টাইম হয়ে গেছে—'

উজ্জ্বলা মাথা না তুলেই বললো, 'তা' হোক, আমার নিজেরই কাজটা একটু 'শ্লো' হচ্ছে। যে চিঠিগুলো হয়ে ওঠেনি—যাচ্ছি একটু পরেই যাচ্ছি। তুমি কেন মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

কথাটা মিথ্যে নয়।

মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো যুক্তি নেই। উজ্জ্বলাকে কি এতাবৎ কাল তার বাবা স্কুলে কলেজে পৌঁছে দিয়েছে?

দু'চার দিন পর থেকে অফিস যাবার সময়ও উজ্জ্বলার বাপের সঙ্গে যাওয়া হয়ে ওঠে না। হয়তো শাড়ি পরা হয় না। বলে, 'তুমি এগোও বাবা, আমি যাচ্ছি?'

সুমতি তীব্র আপত্তি করে, বলে, 'বাপের সঙ্গে যাবি আসবি, এত সুখের চাকরি হলো, সেটা সুবিধে হচ্ছে না?'

উজ্জ্বলা বলে, 'সেরে না নিতে পারলে কী করবো?'

রমাপতি বিষণ্ণমুখে বলে, 'রোজ রোজ লেট্ হচ্ছে সেটা লজ্জার বিষয় নয় ?'

উজ্জ্বলা অম্লান মুখে বলে, 'লজ্জার আবার কি! ওদিকে তো কতক্ষণ থাকি! তা' ছাড়া খাতায় তো আর লেট্ মার্ক পড়ে না!'

'পড়ে না ? যখন ইচ্ছে তখন যাচ্ছো, লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার! আর ওঁর লেট্ মার্ক পড়ে না!'

'খাতাটা উল্টে দেখো।'

বলে মৃদু হেসে চলে যায় উজ্জ্বলা, বোধ হয় কেয়ারি করে চুল বাঁধতে!

রমাপতি অস্ফুটে বলে, 'হারামজাদীকে নিজের অফিসে নেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে!'

সুমতি সেই অস্ফুটেরই অস্ফুট উত্তর দেয়, 'এত বড় বজ্জাতি করবে কে জানতো বল ? তুমি ওর ও চাকরি ঘোচাও।'

কিন্তু রমাপতির কি এখন আর সাধ্য আছে ওর চাকরি ঘোচাবার ? ওতো আর ওখানে রমাপতির মেয়ে মাত্র নয়! একজন কর্মী! সহ-কর্মীর চাকরি খাবার ক্ষমতা কোথায় পাবে রমাপতি ?

আর বাড়িতে ?

যেখানে 'মেয়ে' পরিচয়টাই একমাত্র ? সেখানে কি রমাপতি জোর করে দাবিয়ে রাখতে পারে না ? বলতে পারে না, 'থাক্, তোমার আর চাকরি করতে হবে না!'

না, এখন আর বলা যায় না।

রমাপতি নিজেই চেষ্টাযত্ন করে উজ্জ্বলাকে যে ক্ষমতার অধিকারিণী করে দিয়েছে, সেই ক্ষমতার বলেই উজ্জ্বলা তার সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ওকে রুখবার ক্ষমতা আর নেই রমাপতির।

হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আর সমকক্ষও থাকবে না রমাপতির, হয়তো ছাড়িয়ে যাবে তাকে। কারণ পদোন্নতির সবচেয়ে সহজ আর সংক্ষিপ্ত পথটাই ক্রমশঃ রপ্ত করছে উজ্জ্বলা।

কোথা দিয়ে যে কি হচ্ছে ঠিক ধরা যাচ্ছে না, অথচ দেখা যাচ্ছে সামান্য ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক উজ্জ্বলা বোস যখন তখন সেন সাহেবের সুইং-ডোর ঠেলে ঢুকছে বেরোচ্ছে।

রমাপতি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে টিফিন করতে বেরিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বলা, হাসির ঝর্না ঝরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে, আর প্রত্যেক দিনই রমাপতি যখন ফাইল গুটিয়ে চলে আসছে, তখন উজ্জ্বলা টেবিলে কাজের স্তূপ ছড়িয়ে বসে আছে!

ফিরছে রাত আটটায় নটায়!

সুমতি তীব্র অভিযোগ করে, 'চোখের সামনে মেয়েটা উচ্ছন্নে যাবে, বাপ হয়ে দেখবে বসে বসে? প্রতিকার করবে না?'

রমাপতি বলে, 'কী করবো'?

'কী আবার করবে? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে যতক্ষণ থাকে, তুমি থাকবে একদিন বসে। কার সঙ্গে কোথায় যায় দেখবে। আর 'থাকে ফাঁড়া খণ্ডে যাক' বলে পাঁচজনের সামনে যাচ্ছেতাই করবে। সবাইতো জানে তুমি বাপ, হাসে না তারা তোমার আড়ালে? লোকের সামনে অপমান হলে তবে যদি চৈতন্য হয় মেয়ের! আর ওই মৃগাঙ্কটারও—'

নিত্য প্ররোচনায় ব্যাঙ্‌কেও রণক্ষেত্রে পাঠানো যায়। রমাপতিও অতএব মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করলো। সেদিন ফেরার সময় কঠিন গলায় হুকুম জারি করলো, 'তোমার মা বলে দিয়েছেন একসঙ্গে যেতে!'

উজ্জ্বলা টেবিলের স্তূপের দিকে বাপের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়ে বললো, 'দেখছো তো?'

'থাক্! কাল হবে! সব তুলে রেখে চলে এসো!'

উজ্জ্বলা বললো, 'তা হয় না!'

তা হয় না!

আরো একদিন কবে যেন বলেছিল না উজ্জ্বলা এই কথাটা? তবু তো হয়েছিল। রমাপতির ধিক্কারে হয়েছিল।

আজও কি সেই পথ ধরবে? আজকের ধিক্কারের ভাষাটা ঠিক

খুঁজে পায় না রমাপতি। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে।

মেয়ে বলে, 'মার আদেশ যদি নেহাতই অমান্য করা না যায় বাবা, তোমাকে একটু বসতে হবে!'

তারপর ভুলে যায় বাবার কথা।

রমাপতি বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ করতে করতে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে যায় না। দ্বারোয়ানের কাছ থেকে একটা টুল নিয়ে বসে থাকে সিঁড়ির নীচে।

না থেকে করবে কি ?

সুমতি বলেছে, 'মেয়েকে যদি একটা দিনও সঙ্গে আনতে না পারো তো বুঝবো তুমি ওর বাপ নও।'

পিতৃত্বের প্রমাণ দিতেই অতএব—যতক্ষণ বসে থাকতে হয় হোক।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে হয় না। একটু পরেই নেমে আসে উজ্জ্বলা। সিঁড়ি দিয়ে নয়, 'লিফ্‌টে' চড়ে।

আর অজ্ঞাতসারেই রমাপতি উঠে দাঁড়ায়।…

উজ্জ্বলা থমকে দাঁড়ায়।

যেন ভয়ানক বিপন্নতা বোধ করছে এইভাবে বলে, 'ও তুমি এখনো বসে রয়েছো ?…ভীষণ ভুলে গিয়েছিলাম!…মিস্টার সেন, বাবার সঙ্গে ফেরার কথা ছিল—'

সেন সাহেব অমায়িক হাস্যে বলেন, 'তাই বুঝি ?…রমাপতিবাবু, কিছু মনে করবেন না, মিস বোসকে আমি একটু মার্কেটিঙের সাহায্য-কারিণী হিসেবে নিচ্ছি। প্রেজেনটেশান বাবদ কিছু মেয়েলি জিনিস কেনবার রয়েছে।…আসুন না, আপনাকে ধর্মতলার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যাই—'

রমাপতি মাথা নেড়ে বলে, 'না থাক্! একটু হাঁটা ভাল।'

হ্যাঁ বলে।

সাহেবের কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকা, অথবা উদ্ধত উত্তর দেওয়া, কোনোটাই সম্ভব মনে হয় না রমাপতির।

সেন সাহেব আর একটু মধুর হাসি হাসেন। 'তা' অবশ্য! এ বয়সে একটু হাঁটা ভাল। ডিসপেপটিক্ হয়ে পড়বার ভয় থাকে না! আচ্ছা!'......

বেরিয়ে যায় দু'জনে।...গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ পায় রমাপতি। তবু দাঁড়িয়ে থাকে বসতে ভুলে গিয়ে।

যান্ত্রিক

ঝন ঝন ঝন ঝন ঝন, ঝন।

বাজিয়েই চলেছে ডাকের ঘণ্টা।

ধৈর্য ধরতে জানে না, অপেক্ষা করতে শেখেনি। ছুটে এসো, তুলে ধরো নচেৎ নিস্তার নেই। কান ফুটো করবে। এক পায়ে চটি, এক পা খালি, কোঁচার আগাটা লুটিয়ে পড়েছে, ছুটে এসে রিসিভারটা তুলে নিলেন সরোজাক্ষ।

রসিক সাহিত্যিক সরোজাক্ষ ঘোষাল।

হ্যাঁ, সাহিত্যরসিক নয়, রসিক সাহিত্যিক। অবশ্য সাহিত্যরসিক নয় বলাটা বোধহয় ভুল হল, তবে রসিক সাহিত্যিক হিসেবেই বিখ্যাত সরোজাক্ষ। হাসির গল্পের রাজা। পত্র-পত্রিকায় নামের তালিকায় সরোজাক্ষ ঘোষালের নাম দেখলেই বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে হাসির গল্প। খুব মজার, খুব কৌতুকের।

ছেলে বুড়ো সবাই 'সরোজাক্ষ ঘোষাল' বলতে পাগল! সম্পাদকরাই বা তবে পাগল করবেন না কেন তাঁকে? আর সরোজাক্ষর দুর্বলতা, অনুরোধ মোটেই এড়াতে পারেন না। বন্ধুরা অবশ্য বলে, 'ওসব এড়াতে চাওয়ার গল্পটা রাখো বাবা, ওটাও হাসির গল্প! কা দুঃখে চাইবে? লগন চাঁদা ছেলে তুমি, 'হাসলে পরে, মানিক ঝরে।' এক ফোঁটা-হাসি এক মুঠো টাকা! বাবাঃ!'

'বাবাঃ!'

অতএব সরোজাক্ষরও বলার উপায় নেই, বাবাঃ আর হাসাতে ইচ্ছে করে না। জীবনে একটা সিরিয়াস লেখা লিখতে পেলাম না।

একদা কোন একজন সম্পাদককে নাকি বলেছিলেন সরোজাক্ষ। প্রস্তাব করেছিলেন, 'একটা সিরিয়াস গল্প—' শুনে ভদ্রলোক 'হাঁ হাঁ' করে উঠেছিলেন—'চাইবে না, কেউ পড়তে চাইবে না, পাঠক আমায়

মারবে!' এরপর আর কি বলা যায়—'আমার জন্যে আপনি মারই খান?' বলা যায় কি?

বলা যায় না।

তাই সরোজাক্ষর সেই মোটা খাতাটা, যেটা হাসিরও নয়, কান্নারও নয়, শুধু একটি বিষণ্ণ-বিধুর আনন্দে স্পন্দিত, সেটা আর লোকচক্ষে পড়ল না কোনোদিন। অথচ সবিতা বলেছিল, 'কলম ধরে পর্যন্ত বিদূষকের পার্টই প্লে করে গেলে, আমাদের গল্পটা লেখ না?'

সরোজাক্ষ বলেছিলেন, 'পাগল! আমাদের সেকালের চেনা-জানারা আছে, তোমার ছেলেমেয়েরা আছে—'

'থাক্ না! তাতে কি? ঠিক ঠিক নাম তো আর দিচ্ছ না? নাম ধাম বদলে তোমার নিজের ধরনে লিখবে। অন্য আর কেউ বুঝতে পারবে না, শুধু তুমি আর আমি।'

'তাতে লাভ?'

সবিতা একটু মিষ্টি হাসি হেসেছিল।

চল্লিশ পার হয়ে গেছে সবিতার, তবু হাসিটা বিবর্ণ হয়ে যায়নি। সেই তাজা আর মিষ্টি হাসিটা হেসে বলেছিল, 'বাঃ লাভ নেই বুঝি? তোমার মনে যে কী ভাবের তরঙ্গ খেলতো তখন, সে কি তুমি কোনোদিন খুলে বলেছ আমায়? তোমার গল্পের নায়কের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে টের পাবো সেটা! অবিশ্যি এখানেরটাও যোগ কোরো।' আর সবিতা এখানে একটু চাপা আর দুষ্টু হাসি হেসেছিল, 'আর নায়িকার মন নিয়ে কি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করবে, তাও দেখবো। ...দেখবো তুমি কত ওস্তাদ লিখিয়ে!'

বলে পর্যন্ত সবিতা হয়তো প্রতীক্ষা করছে। হয়তো যত পত্র-পত্রিকায় সরোজাক্ষ ঘোষালের লেখা বেরোয়, সব কিনছে। কিনছে, পড়ছে, আর হতাশ হচ্ছে। হয়তো বা এও ভাবছে, 'সরোজটা কী ছোটলোক! এত করে বললাম—'

কিন্তু উপায় নেই।

উপায় হচ্ছে না।

সম্পাদক নেবে না। প্রকাশক নেবে না।

ওকথার আভাস দিতে গেলেই বলে ওঠে, 'উপন্যাস? সিরিয়াস? আপনিও আবার সিরিয়াস উপন্যাস লিখে জাত নষ্ট করতে চান মশাই? কেন? উপন্যাস লিখিয়ের তো অভাব নেই দেশে? সিরিয়াস ছাড়া তো তাঁরা কিছু ভাবতেই পারেন না। বাঙ্গালী হাসতে জানে না— একথা আমাদের সাহিত্যিকরাই প্রমাণ করেছেন। বলতে গেলে আপনিই আমাদের সবেধন নীলমণি! আপনি আর আপনার রসের কলমটা বদলাবেন না।'

অতএব জাত নষ্ট করেন না সরোজাক্ষ। রসের কলম বদলান না।

'নিজেই পয়সা খরচ করে ছদ্মনামে ছাপিয়ে ফেলবো ওই মোটা খাতার লেখাটা—' এমন কথাও মনে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তেমন উৎসাহ আসে না। 'করলে হয়' গোছের একটা মনোভাব তলিয়ে আছে মনের একটা কোণায়।

হয়তো ওই উৎসাহের অভাবটা সবিতার সেই হুকুমের ফল।

হ্যাঁ, হুকুমই বলেছিল সবিতা।

'কিন্তু একটি হুকুম, কিছুতেই তোমার ওই নায়িকাকে বিরহিণী দুঃখিনী, প্রেমহীন বিবাহের যন্ত্রণায় চিরবিষাদিনী করতে পাবে না।'

'করতে পাবো না?'

'নিশ্চয় না! তোমার নায়িকা হবে বেশ সুখী সন্তুষ্ট হাসিখুশী আর—'

সরোজাক্ষ হেসে বলেছিলেন—'তবে আর লেখার উদ্দেশ্যটা কি? প্লটটা তাহলে কি হচ্ছে? একদা একটি মেয়ে আর একটি ছেলের মধ্যে ভালবাসা হল। প্রগাঢ় ভালবাসা, সাংঘাতিক ভালবাসা, দুর্দান্ত ভালবাসা! অতঃপর যথারীতি তাদের বিয়ে হ'ল না। মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে বললেন—'

'আঃ সে যাহোক একটা বানিয়ে লিখোনা বাবু! সেটা যে নিখুঁত সত্যি লিখতে হবে, তার কোনো মানে নেই। বাবা এখনো বেঁচে রয়েছেন।' সবিতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল।

'বেশ না হয় ওটা একটা কল্পিত কাহিনীই জোড়া হল—' সরোজাক্ষ বলেছিলেন, 'বিয়ে হল না সেটাই বক্তব্য, কেমন তো? বেশ দু'জনের বিয়ে হল না, তবে মেয়েটার চটপট অন্য একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হতভাগা ব্যর্থপ্রেমিক ছোকরা রাগ করে জন্মে আর বিয়েই করল না। 'পৃথিবীটাই হাস্যকর' এমনি একটা দার্শনিক মনোভাব নিয়ে হাসির গল্প লিখতে শুরু করল—'

'এই খবরদার!' সবিতা বলেছিল, 'ওটা লিখোনা, হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবে! গায়ক-টায়ক গোছের কিছু একটা কোরো বরং—'

সরোজাক্ষ হেসে ফেলে বলেছিলেন 'তা মন্দ বলনি! ওটা লিখলে ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করে বসবে না। যাক্ নায়কটার তো তবু একটা ভদ্র মত ব্যবস্থা হল। কিন্তু নায়িকার?'

'নায়িকারও যা যা হল লিখবে', সবিতা বকে উঠেছিল, 'তাকে কি অব্যবস্থায় ফেলে রাখবে?'

'যা যা হল! ওঃ! তার তো সেই অন্য একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল, কেমন? তারপর? হ্যাঁ তারপর বরের সঙ্গে খু—ব ভাব হল—'

'আহা ভাষার কী ছিরি! 'খুব' আবার একটা সাহিত্যের ভাষা না কি? লিখবে—লিখবে—বেশ ভাব হল।'

'অলরাইট। বেশ ভাব হল। মা লক্ষ্মীর কৃপায় বাড়বাড়ন্ত মন্দ হল না, মা ষষ্ঠীও কৃপাটৃপা করলেন, তারপর?'

সবিতা ভুরু তুলে বলল, 'তারপর কি তার সবই আমি বলব? তাহলে আমার লিখতেই বা বাধা কি ছিল?'

'বাঃ নায়িকার কথাটা তুমি না বুঝিয়ে দিলে? আমি তো তারপর আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'রাগিও না ইচ্ছে করে। বানানো বানানো সব মানুষদের নিয়ে এত সব লিখতে পারো তোমরা, আর এখন কিছু খুঁজে পাচ্ছ না?'

'আমি তো হাসির গল্পের লেখক। বিদূষক। আমি তাহলে তোমার গল্পকে আমার এলাকাতেই টেনে আনবো। লিখবো—তারপর বিদেশে বেড়াতে এসে আবার দু'জনের দেখা হ'ল। নায়কটা উড়ে মালীর হাতের কাঁচা ভাত আর পোড়া ডাল খাচ্ছে দেখে নায়িকার পুরনো প্রেম উথলে উঠল, নায়কটাকে ডেকে ডেকে ধরে এনে ঠেসে চারবেলা খাইয়ে খাইয়ে মোটা করে তুললো—'

'দেখ, সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করে করে তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমাদের গল্পটা ঠাট্টার জিনিস?'

সরোজাক্ষ হেসে বলেছিলেন, 'ঠাট্টার নয়, একথা জোর করে বলা শক্ত। তবে একেবারে সাধারণ তাতেও সন্দেহ নেই।'

সবিতা চোখ তুলে বলে, 'কলমের তবে মহিমা কী, যদি সাধারণের ওপর অসাধারণত্ব আরোপ করতে না পারবে? লেখক কথাটারই বা অর্থ কি? ওটুকুতো কাগজের রিপোর্টাররাও লিখতে পারে। তিলটা তো কিছু না? অথচ তা দিয়েই তিলোত্তমা!'

হয়তো তারপর থেকেই ওই মোটা খাতাটায় হাত দিয়েছিলেন সরোজাক্ষ। কে জানে ওর মধ্যেই আছে কি না সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার নজীর?

তিল তিল করে কি তিলোত্তমা গড়েছেন সরোজাক্ষ? সবিতার দেওয়া কাঠামোয়? হ্যাঁ কাঠামোটাও সবিতারই দেওয়া।

বলেছিল সে, 'তুমি যেন কিছুতেই বুঝতে রাজী নও, যেন কাঠামোটাই বাঁধতে পারবে না, এমনি আলগা ভাব। অথচ আমার এত ইচ্ছে করে আমাদের গল্পটা পাকা খাতায় উঠে থাক! নিজে যদি লিখতে পারতাম—'

সরোজাক্ষ বলেছিলেন বোধ হয় 'কি আর হবে ওসব, এই বুড়ো বয়সে?'

'শোনো কথা। তোমার আমারই না হয় এখন বুড়ো বয়েস হলো, ওরাও বুড়ো হয়ে গেছে তাই বলে? ওরা তো সেই যেখানে ছিল সেখানেই আছে! সেই তেরশো তেতাল্লিশ সালে।"

'বেশতো উঁচু তাকে তোলা আছে, থাক্ না। পাড়লেই তো ভাবতে বসতে হবে, কি ছিল, কি ছিল না, কি ছিল, এখন আর নেই—'

'মোটেই না! লিখবে সব ছিল, সব আছে, সব থাকবে!...এই কাঠামোটা দিলাম বেঁধে—'

'সব ছিল, সব থাকবে! সবিতা, তুমি একটি পাগল? থাকা না থাকার হিসেবটা কি এমন ঢালা হিসেব?'

সবিতা বলে, 'কেন নয়? আমি বলছি—সুখও থাকবে, ভালবাসাও থাকবে। প্রথম ভালবাসা, যাকে বলে তোমার গিয়ে প্রথম প্রেম, ওকি হারিয়ে যাবার?...না বাবু, ও একেবারে আত্মার মত। হারায় না ফুরোয় না, শুকোয় না মরে না।...কিন্তু ভালবাসা আছে—অতএব সুখ থাকবে না, অথবা সুখ রয়েছে তো ভালবাসা থাকা চলবে না, এই পচা পুরনো থিয়োরিটা ছাড়ো তো তোমরা! নতুন কিছু তত্ত্ব শোনাতে পার না? নতুন কোনো সত্য?'

নতুন সত্য!

সরোজাক্ষ হেসে উঠেছিলেন।

'কতকগুলো চিরন্তন সত্য তো থাকবেই। আমি যদি তালঠুকে নতুন কথা শোনাতে চেয়ে বলি, 'একই পাত্রে জলও রইল, আগুনও রইল' আর সেটা রইলই! সেটা কি হাস্যকর হবে না? জল আর আগুন কিছুতেই একই পাত্রে বসবাস করতে পারে না। হয় জলে আগুন নিভবে, নয় আগুন জল শুষবে। এটাই হচ্ছে জীবনের অমোঘ সত্য।'

'ছাতী সত্য!'

সবিতা প্রায় 'ক্ষ্যান্ত পিসিদের' মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল।

'জগতের সব কিছু একেবারে ছাঁচে ঢালা ?...তোমরা লেখকরা বড় অহঙ্কারী, যেন যা কিছু জানবার সবই তোমাদের জানা হয়ে গেছে, যা কিছু বোঝবার সবই বোঝা হয়ে গেছে। আর কিছু বাকি নেই। মনস্তত্ত্বের শেষকথা তোমরাই শেখাচ্ছ নিখুঁত নির্ভুল। ওই তত্ত্বটি কী জটিল তত্ত্ব তা জানো ? ঈশ্বর তত্ত্ব কোথায় লাগে ?···তোমরা ওকে অঙ্কশাস্ত্রের ছাঁচে ফেলে বলবে—'এ হলে ও হয় না, ওটা আদৌ হয় না'— সাধে বলছি অহঙ্কারী ?...আমার থিয়োরিতেই আমাদের গল্পটা লিখবে বুঝলে ?'

সরোজাক্ষ মৃদু হেসে ঘাড় কাত করেছিলেন, 'বুঝলাম।'

'তবে বাবু এইবেলা যা করবার করে ফেলো, মরার আগে দেখে যাই।'

'মরার আগে দেখে যাই ! চমৎকার !'

'আহা তা বলা কি যায় ? সবিতা চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়েছিল, 'জীবন হচ্ছে পদ্মপাতায় জলবিন্দু।...গল্পটা কিন্তু না পড়ে গেলে মরেও সুখ পাবো না।'

সরোজাক্ষ হেসে উঠে বলেছিলেন, 'দিব্যি তো সুখে আহ্লাদে আছো, হঠাৎ মরণদশার চিন্তা কেন ?'

'ওই তো বললাম জীবন ক্ষণভঙ্গুর।'

এতকথা বলবার অবকাশ পেয়েছিল সবিতা সেবার হাজারিবাগে বেড়াতে গিয়ে। সরোজাক্ষ গিয়েছিলেন পূজোর পর কিছুটা ক্লান্তি দূর করতে। হাসির গল্প লেখকেরও ক্লান্তি আসে বৈ কি। অন্তত সরোজাক্ষ ঘোষালের আসে।

হাজারিবাগে বন্ধুর একটা বাড়ি পড়ে আছে, মালীও আছে একটা, 'রান্না জানে' এ আশ্বাস দিয়েছিল বন্ধু।

গিয়ে দেখেন পাশের বাসায় সবিতারা।

ছেলে মেয়ে, বর দ্যাওর, ঠাকুর চাকর নিয়ে সে একেবারে এলাহি

কাণ্ড! সরোজাক্ষকে দেখে হৈ চৈ করে বলেছিল, 'তুমি ওই মালীটার হাতে খাবে, আর আমি দু'চোখ মেলে দেখব?……তার থেকে সোজা কলকাতার টিকিট কাটো গিয়ে। ভাড়ার টাকা না থাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

সরোজাক্ষ হেসেছিলেন, 'মনে করোনা কেন, আমি একজন অপরিচিত ভদ্রব্যক্তি নিজমনে আছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই তোমার—'

সবিতা তখন আর হৈ চৈ করেনি, শুধু চোখে মুখে লাবণ্য ঝরিয়ে বলেছিল, 'ওটা তোমার কিছু এমন মৌলিক উপদেশ হল না। ওসব সাধনা অনেক করেছি। কতদিন ভেবেছি যেন কোনোদিন ঘোষালদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, যেন ঘোষাল কথাটার বানানই জানি না—সে সাধনা ধোপে টিকলো না। তবে কী দরকার বাবা ওই অবাস্তব কল্পনায়? তার থেকে অনেক বেশী সত্য, আবার তুমি আমি পাশাপাশি বাড়িতে আছি। তুমি যদি ওই মালীটার হাতে খাবেই প্রতিজ্ঞা করো, আর এইখানেই থাকবো প্রতিজ্ঞা করো, আমাকেই বিদেয় হতে হবে।'

অতএব কারুরই বিদেয় হওয়া হয়নি।

সরোজাক্ষ হিসেব করে দেখেছিলেন সবিতার তখন চল্লিশ পার 'হয় হয়, কি হয়েছে! ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। সেই সময় এত কথা বলার সময় পেয়েছিল সবিতা।

সবিতার বর বলেছিলো, 'আপনারা মশাই গুণী লোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পাওয়া ভাগ্যের কথা! আপনার বাল্যবান্ধবীর কাছ থেকে সাহস না পেলে এগোতেই পারতাম না।'……

সবিতার ছাওর বলেছিলো, 'বৌদির সঙ্গে আপনার এতদিনের পরিচয়? আশ্চর্য! আপনার লেখা নিয়ে তো ভীষণ ঠাট্টা-টাট্টা—'

আধাপথে থেমে গিয়েছিল বেচারা। বুঝেছিল বলাটা সমীচীন হয়নি।

সেদিন বিকেলে সেই পাথরের চাঁইটার ওপর বসে গল্প করতে করতে সবিতা বলেছিল, 'করিই তো ঠাট্টা! কেন করবো না? সারাজীবন শুধু তো বিদূষকের পার্টই প্লে করে গেলে!'

'উপায় কি? জীবনের প্রারম্ভে যে যা-ভূমিকা বেছে নেয়, তার থেকে তা'র উদ্ধার আছে না কি?' বলেছিলেন সরোজাক্ষ। তা সত্যিই নেই।

নইলে, এই যাকে বলে মেঘমেদুর আকাশ, পঞ্চাশ ঘেঁষা প্রৌঢ়ের মন উদাস করে দেবার মত উতলা বাতাস, এ হেন সময়ে টেলিফোন দূত বার্তা বয়ে বয়ে আনছে,......'আমার গল্পটা হয়নি? বলেন কি? সর্বনাশ! লিখুন, লিখে ফেলুন স্যর! আপনার তো কলম ধরতে যা দেরি। সিদ্ধ কলম। খুব হাসির হওয়া চাই কিন্তু—মানে আপনি যেমন লেখেন—'

আলস্যের সুখ ত্যাগ করতে হল।

সেই 'খুব হাসি'র গল্পটার জন্যে একটা প্লট হাতড়াতে থাকলেন কলম নিয়ে বসে। তা সম্পাদক মশাই খুব ভুল বলেননি, কলম নিয়ে বসতেই হয়ে গেল খানিকটা। এবার সহজে এগিয়ে যাবে।...এক পেয়ালা চা কি চাইবেন এ সময়?

বলতে যাচ্ছিলেন, আবার টেলিফোন। ঝন ঝন ঝন ঝন।... বিরক্তিকর অস্বস্তিকর! কলমে ঢাকনি না পরিয়েই উঠে গেলেন সরোজাক্ষ, বললেন, 'কে কথা বলছেন?'

তারপর আর কিছু বললেন না।

না, আর কিছু না।

ও পক্ষই বলছে।

কী বলছে?

মনে হচ্ছে সরোজাক্ষ যেন ধরতে পারছেন না কথাটা।

কিংবা ধরতে পেরেছিলেন, শুধু বলবার কিছু নেই বলেই কিছু বলছেন না।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'যাচ্ছি।'

রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রাখলেন।

তারপর আরো আস্তে বললেন, 'যাচ্ছি তা'হলে?' কাকে বললেন?

না কাউকে বললেন না।

ঘরে তো কেউ ছিল না। এমনি উচ্চারণ করলেন।

কলমটা তেমনি মুখখোলাই পড়ে থাকলো, জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আরও আস্তে চুপিচুপি বললেন, 'গল্পটা তা হলে পড়লে না?'

সবিতার ছেলেমেয়েরা হাউ হাউ করে কাঁদছিল, সবিতার বর পাথরের মত বসেছিল খাটের ধারে। সবিতার ছাওর বলল, 'হ্যাঁ, আমিই ফোন্ করেছিলাম। বৌদি আপনাকে খুব ইয়ে করতেন— কিচ্ছু হয়নি! কিছুটি না। সকালেও তো চা খেয়েছেন, কুটনো কুটে দিয়েছেন। তারপর এসে বললেন, "শরীরটা খারাপ লাগছে।' ব্যস্! ···আপনার সঙ্গে সেই হাজারিবাগে শেষ দেখা, কী আনন্দ, কী ইয়ে—'

একটু সামলে নিয়ে বলল, 'দাদার দিকে তো তাকাতে সাহস পাচ্ছি না, আপনি যদি শেষ অবধি—'

সরোজাক্ষ থামিয়ে দিলেন।

শান্তভাবে বললেন, 'আছি!'

মনে মনে বললেন, 'জীবন পদ্মপত্রে জল, জীবন ক্ষণভঙ্গুর', এসব কথা তুমি কেন বলেছিলে সবিতা? শুধু ঠাট্টা করে?'

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল, আগুনের তাত আসছিল, সরোজাক্ষ

একটু সরে এলেন। দেখলেন সবিতার বর আগুনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে, সবিতার গুাওর আস্তে বলল, 'দাদা একটু সরে এসো', এল না। বলল, 'থাক্ !'

অনেক পরে, যখন শ্মশান থেকে চলে আসছে, সরোজাক্ষর খুব কাছে এসে দাঁড়াল সবিতার বর। বলল, 'ওর কাছে দেওয়া কথা রাখতে পারলাম না।···বলেছিল, যেখানেই থাকুক, আর যখনই হোক, ওর মরবার সময় যেন আপনাকে খবর দিই ! হল না, সময় পেলাম না। শেষ কথায় সেই অভিযোগ জানিয়ে গেল !...সব শেষ উচ্চারণ করেছিল—

'কথা রাখলে না তো ?'

সরোজাক্ষ চমকে তাকালেন।

একটা তীব্র প্রশ্নের ধাক্কা খেলেন যেন।

কাকে ?

কাকে অভিযোগ করেছিল সবিতা ?

সবিতার বর আর একবার বলল, 'ও কি বুঝবে সত্যিই সময় পেলাম না !'

সময় পেলাম না ! সময় পাওয়া গেল না ! এইটাই তো শেষ কথা। সময় যে পাওয়া যায় না একথা কে মনে রাখে ?

সরোজাক্ষ মনে মনে বললেন, 'আমি মনে রাখিনি, তোমার কথাও রাখিনি আমি।···আমি তোমায় পড়াতে পারিনি, তোমার গল্প, আমার গল্প, আমাদের গল্প। আমি শুধু ভেবেছিলাম, লিখলে আমাদের ওই গল্পটা নেহাত সাধারণ ছাড়া আর কিছুই হবে না...সাধারণ আর হালকা।

অথচ তুমি তোমার মন দিয়ে ওজন করবে। ওজন করে হতাশ হবে। তোমার সেই হতাশার ছবিটা ভেবেই আমি আমাদের গল্পটা ঠেলে রেখেছিলাম, ফেলে রেখেছিলাম।

কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে হয় তো নেহাত সাধারণ হতো না। তোমার দেওয়া নতুন সত্যিই সে গল্প অসাধারণ হয়ে উঠতো।...

সবিতা তোমার বর তোমার কাছে দেওয়া কথা রাখতে পারেনি বলে—আপসোস রাখতে জায়গা পাচ্ছে না, তবু আমার কেন মনে হচ্ছে, কাকে? কাকে?

সবিতার ছাওর অস্ফুটে বলল, 'আমাদের সঙ্গেই ওখানে ফিরে একটু শরবৎ টরবৎ—'

সরোজাক্ষ মাপ চাইলেন।

'শ্মশান থেকেই বাড়ি ফিরবেন?'

সরোজাক্ষ একটু হাসলেন, 'তা তো ফিরছিই, শ্মশানেই থেকে যেতে পারা যায় কই?'

নাঃ থেকে যাবার ইচ্ছেও নেই।

বাড়ি ফিরে একটু টান্ টান্ করে শুতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে একা চুপি চুপি জিগ্যেস করতে—সবিতা, কাকে?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি ইচ্ছে মেটে?

জীবন যন্ত্রণার এক যন্ত্রণা সেই অসহিষ্ণু যন্ত্রটা নেই? যার ভিতর থেকে অনর্গল কথা বেরিয়ে আসছে, হয়ে ওঠেনি? কিছু হয়ে ওঠেনি? বলেন কি? সকালে যে বললেন—কথা রাখতে পারলেন না? শরীর খারাপ? বেরিয়েছিলেন? তা' এই বৃষ্টি বাদলে বেরোতে গেলেন কেন?...কিন্তু আমি যে মারা যাচ্ছি, প্রেস খেয়ে ফেলছে। একটু আদা-চা খেয়ে বসে পড়ুন স্যর! নইলে রেলের নিচে গলা দিতে হবে আমাকে। অবস্থা বুঝতে পারছেন না...পয়লা সেপ্টেম্বর কাগজ বার করতে না পারলে—লিখছেন?...বাঁচালেন! কাল সকালেই যাচ্ছি তা হলে? সত্যি বাঁচালেন!'

বাঁচালেন !

সরোজাক্ষ ঘোষালের তবে ক্ষমতা রয়েছে কাউকে বাঁচাবার !··· সময় রয়েছে কথা রাখবার ।

টেবিলের ধারে এসে বসলেন। দেখলেন কলমের মুখটা সকাল থেকে খোলা পড়েছিল, শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। নতুন করে কালি ভরে অসমাপ্ত গল্পটা টেনে নিয়ে বসলেন। সেই খুব হাসির গল্পটা। খানিকটা হয়ে আছে। সহজে এগিয়ে যাবে। প্লটটা তো স্পষ্ট মনেও পড়ছে। ভীষণ মজার ! নিশ্চিত জানেন পড়ে লোকে হেসে কুটিকুটি হবে ।

গল্পটা এগোতে থাকল। সিদ্ধকলম !

অথচ—

আজকের ডাকে আর কোনো চিঠি আসে নি, শুধু অভয়মামার ওই চিঠিটা এসেছে। পড়ে নামিয়ে রাখলাম, গভীর একটা নিশ্বাস পড়ল।

সেদিনও এমনি একটা গভীর নিশ্বাস পড়েছিল। সেই গত বছর মেদিনীপুর জেলার 'খণ্ডখোলা' গ্রামে একখানা মাটির ঘরে অভয়-মামাকে দেখে।

না, অভয়মামাকে দেখতে ওই অজানা অচেনা গ্রামটায় যাই নি আমি, গিয়েছিলাম দায়ে পড়ে। ফাংশানবাজ ক'টি ছেলের আপ্রাণ পীড়াপীড়িতে। আমার ঢাল এবং তাদের তলওয়ারের প্রবল লড়াইতে তারাই জিতেছিল।

সভাটা কি উপলক্ষে ছিল মনে নেই, তবে প্রোগ্রাম সুদীর্ঘ ছিল তা মনে আছে। এই রেলস্টেশন-বিহীন গ্রামে একটা ফাংশানের আয়োজন করে তোলা চারটিখানি কথা নয়, অতএব করে' যখন তুলেছে এই মানসভোজের আয়োজন, পেট ভরেই খেয়ে নেবে, এটাই স্বাভাবিক।

অনেক রকম সব হচ্ছিল মনে আছে।

বিকেলের সভা রাতের অনেকখানিটা পর্যন্ত ধাবিত হয়েছিল তাও মনে আছে। চোখের সামনের 'হ্যাজাক' লণ্ঠন দুটো চোখে শূল বিঁধাচ্ছিল আর আলোগুলোকে ঘিরে একটি দুটি করে ক্রমশঃ অনেকগুলো পোকা জমে উঠেছিল।

সভা ভাঙতেই দিশেহারা হয়ে কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সেই চেনা মুখটি স্মরণ করেছিলাম, যে মুখটিই আপাততঃ আমার এই ভবার্ণবের ভেলা, যে মুখের অধিকারীর অনশন ধর্মঘটের ভয়েই এই চির অজানা ভূমিতে পদার্পণ। স্টেশন থেকেই সভায় নিয়ে এসেছে, জানি না এর পর কোথায় নিয়ে যাবে। কোন্ গহন অরণ্যে, কোন্ অজগর-বিজন বনে।

শুনলে হাসির কথা মনে হতে পারে, তবে সেই শেষ কার্তিকের হিম-হিম কুয়াশা-কুয়াশা রাতে রাত দশটার পটভূমিতে 'খণ্ডখোলা' গ্রামের নিবিড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওই রকম একটা মনোভাবেরই সৃষ্টি করেছিল।

এমন সময় আমার সেই ভবার্ণবের কাণ্ডারী এসে বলে উঠল, 'আপনি অভয় মজুমদারকে চেনেন? অভয়শঙ্কর মজুমদার?'

সত্যি কথা বলতে, প্রথমটা দিশেহারা হয়েছিলাম, তারপরই একটা কথা স্মরণে এল। জিগ্যেস করলাম, 'বয়েস হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব! সত্তর আশী হবে।'

যে বয়সের কাছে ষাটের সঙ্গে সত্তরের এবং সত্তরের সঙ্গে আশীর কোনো পার্থক্য নেই, ওর সেই বয়েস। অতএব না হেসেই ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'তিনিও এসেছেন না কি! কই দেখলাম না তো—'

'তিনি তো এখানেই থাকেন!' ছেলেটি জোর দিয়ে বলে, 'আসতে পারলে আসতেন। তবে বয়েস হয়েছে তো? বিছানাতেই থাকেন প্রায়। আপনি আসছেন শুনে পর্যন্ত আমাদের সবাইকে বলে রেখেছিলেন যেন আপনাকে একবার নিয়ে যাই।'

বয়সগ্রস্ত অভয়মামা তাঁর পাটনার সেই বিরাট বাড়িঘর ছেড়ে এই খণ্ডখোলা গ্রামে 'থাকেন' কেন, কিছুতেই অনুধাবন করতে পারলাম না।···কী হওয়া সম্ভব! ভাবতে ভাবতেই চললাম।

না, গাড়ী-পালকীর কথা ওঠে না, এরা বলেছে 'এই পাশেই!'··· মিনিট কুড়ি ধরে সেই 'পাশে'র উদ্দেশে হাঁটছি। এরা অবশ্য অবিবেচক নয়—সামনে পিছনে পাশে চলেছে জনা তিনেক হারিকেন আর টর্চবাতি নিয়ে।

অভয়মামা এখানে কী সূত্রে আছেন, এবং কতদিনই বা আছেন, কে আছে ওঁর এখানে, এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করছিল, কিন্তু এই হিমরাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। ভাবলাম খোদ মানুষটাকেই জিগ্যেস করবো।

কিন্তু খোদ মানুষটাকে এইভাবে দেখবো এ কল্পনা কি স্বপ্নেও ছিল? এই জীর্ণ একখানা মাটির ঘরে ভাঙা তক্তপোশের ময়লা বিছানায় অভয়মামা কেন, এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকতে চাইল না।

বারবার অভয়মামাদের পাটনার সেই সমারোহময় বাড়িটার দৃশ্যই মনের চোখে ভাসতে লাগল। অভয়মামারা আমাদের নিজের মামা নয়, বলতে কি হিসেব মত মামাই নয়, কাকীমার দূরসম্পর্কের ভাই নাকি যেন ওঁরা! তিন চার ভাই। অভয়মামাই বোধ করি বড়। আর ছেলেবেলায় এই অভয়মামাকেই আসতে দেখতাম আমাদের বাড়িতে।

মানে যখন কাকারা আমরা সকলে একত্রে থাকতাম।

আমরা বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ে অভয়মামার প্রতি ভীষণ একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। অভয়মামার দরাজ গলা, প্রবল হাসি, নবাবী নজর, এবং বহুবিধ গল্পের স্টক্ আমাদের মোহিত করে ফেলতো।

অভয়মামা এলে রাস্তা থেকেই সাড়া পাওয়া যেত, গাড়ি থেকে স্যুটকেস নামাবার জন্যে ডাক-হাঁক জুড়ে দিতেন, এবং বাড়ি ঢুকেই হাঁক পাড়তেন, কই, বড়দি মেজদি ছোড়দি, সব গেলেন কোথা?

বড়দি আমার জেঠাইমা, মেজদি মা, এবং ছোড়দি কাকিমা। অভয়মামার থেকে তিনজনই অনেক ছোট, তবু আহ্লাদ করে দিদিই বলতেন উনি।...আর কোন্‌টি যে ওঁর নিজের বোন, আর কোন্‌টি নয়, ব্যবহারে তা বোঝা যেত না।

তিনজনকেই শাড়ি কিনে দিতেন, তিনজনের ছেলেমেয়েকেই সমান করে খেলনা খাবার। গোটা আষ্টেক ছেলেমেয়েকে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতেন চিড়িয়াখানায়, নিয়ে যেতেন জাদুঘরে, মালাই বরফ খাওয়াতেন, অবাকজলপান খাওয়াতেন এবং গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে আসতেন।

বলতে লজ্জা করলেও স্বীকার করতে হয়, অভয়মামার দৌলতেই আমরা প্রথম মোটরগাড়ি চড়ি, প্রথম দোকানে ঢুকে শরবত খাই!

আর শিকারের গল্পই বা প্রথম কার দৌলতে শুনেছি? ওই অভয়মামা! আমাদের বাড়িটা ছিল মধ্যবিত্ততার প্রতীক। অবস্থায় ব্যবস্থায় চিন্তায় কর্মে আচরণে আভরণে ওই একটাই বিশেষণ দেওয়া যায় তাকে। মধ্যবিত্ত।

অভয়মামা আসতেন উচ্চবিত্ত আর উচ্চচিত্তের হাওয়া বয়ে। অভয়মামা যে কদিন থাকতেন, রোজই ভোজ। আর বলাই বাহুল্য, সেটা অভয়মামার পকেট থেকেই।

সকালবেলা হয়তো চায়ের আসরেই হাঁকতেন, 'ওহে ভগ্নীপতি, রসগোল্লার সের তোমাদের এখানে কত করে?'

ছোটকাকা সবিনয়ে যা জানাতেন, তার সারমর্ম এই, প্রয়োজন অনুসারে আটআনা একটাকা পর্যন্তই দৌড় আমাদের, সের-টেরের খোঁজ রাখি না!

অভয়মামা অপ্রতিভ হতেন না।

বলতেন, 'রাখবে, সব খোঁজই রাখবে। বিলেত যাবার তো তোমার দরকার নেই। তবু ভূগোল পড় কেন? চল দিকি একবার তোমাদের নবীন ময়রার দোকানে!'...

যেতেন, পাঁচ সাত সের রসগোল্লা এনে হাজির করতেন। তার সঙ্গে রাবড়িও এসে যেত হয়তো হাঁড়ি ভর্তি।...অভয়মামার বাজার যাওয়ার জ্বালায় মাছ খেয়ে হাঁপিয়ে যেতে হতো। মনে আছে একদিন জেঠাইমা বলেছিলেন, 'আপনার এই দেওয়ার জ্বালায় লজ্জায় মারা যাই আমরা, অভয়দা! এত খরচ করবেন তো আমাদের বাড়ি এসে উঠতে হবে না। সাহেবের হোটেলে উঠবেন, বাবুর্চি বেয়ারার ওপর আরামে থাকবেন।'

সেদিন, সেই একটা মাত্র দিন অভয়মামাকে দেখেছিলাম রেগে উঠতে।

চোখ দিয়ে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'কী বললি? তোদের এখানে এসে উঠি বলে তার শোধ দিই আমি?

একথা উচ্চারণ করতে সাহস হল তোর? নাকে খৎ দে, মেপে সাত হাত নাকে খৎ দে!'

তা বাস্তবিকই দিয়েছিলেন তাই জেঠাইমা!

আমরা ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়েছিলাম তাঁর দুর্দশায়।

তারপর অবশ্য প্রসন্ন হয়েছিলেন অভয়মামা। বলেছিলেন, 'বলি, টাকার বাণ্ডিল নিয়ে আমি করবোটা কি শুনি? দশটা ছেলেমেয়ে আছে আমার যে তাদের জন্যে রেখে যাবো? সেখানে ভাইপো ভাইঝি, এখানে ভাগ্নে ভাগ্নী, তফাতটা কি? খাবো খাওয়াবো, ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব, ব্যস!'

চিরকুমার অভয়মামার এই কৌতুক-কথার মধ্যে যে করুণ রস ছিল, তাতে অভিযোগকারিণীরা যে বিশেষ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলেন তা তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় গল্পের আসরে অভয়মামা আমাদের কাছে খুব স্ফূর্তি দেখিয়েছিলেন, 'দেখলি তো, তোদের জেঠিকে কেমন নাকে খৎ দেওয়ালাম? হুঁঃ, আমি একটা বাঘ ভালুক মারনেওলা শিকারী, আমায় এসেছে শিকার করতে!'

আমরা ও কথায় কর্ণপাত না করে সেই বাঘ ভালুক সম্পর্কেই উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, এবং অভয়মামাও শুরু করে দিয়েছিলেন, 'কাল কোন্ পর্যন্ত হয়েছিল রে? সেই মাচা বাঁধা পর্যন্ত তাই না?'

তা সেই অভয়মামাই একবার আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন পাটনায়। বাবা ভুগছিলেন অনেকদিন ধরে, অভয়মামা এসে দেখে বললেন, 'চলো দিকি মেজ বোনাই, একবার আমাদের ওখানে। পশ্চিমী হাওয়া, গঙ্গার ওপর বাড়ি, দু'দিনে তোমার ওই "পেট ভুট-ভুট" সেরে যাবে!'

সেই সময় দেখেছিলাম অভয়মামার বাড়ি।

মা বলেছিলেন, 'লক্ষ্মী-উথলোনো সংসার!' বাস্তবিক সে বাড়ি

যেন সর্বদাই বিয়ে-বাড়ি। অভয়মামার আরো যে তিনজন ভাই ছিলেন, তাঁদের প্রতি ষষ্ঠীর কৃপার ত্রুটি ছিল না। সর্বদাই খাওয়া মাখা হৈ চৈ।

বাবা বেশ সেরে উঠেছিলেন, রাত্রে মাতে-বাবাতে গল্প হতো শুনতে পেতাম। মানে ওঁরা অবশ্য আমরা ঘুমিয়ে পাথর হয়ে শুনতে পাচ্ছি না ভেবেই বলতেন, 'অভয়দাই এই রকম খোলামেলা দরাজ প্রাণ, ভাইগুলি বেশ গোছালো আছে, সংসারে কেউ একটি পয়সা দেয় না, সব খরচ অভয়দার।'…

বাবা বলতেন, 'উনি তো নেনও না।'

মা বলতেন, 'থামো! ওই বলে সুযোগ নেয়। ছেলেমেয়েদের বই খাতা, স্কুলের মাইনের বেলাতেও কি রকম ঠেলে পাঠিয়ে দেয় দেখ না, "আমি জানি না ওসব! যা, জেঠামণির কাছে যা!" বৌ'রাও ফি-কথায় কোন কিছু ফুরোলেই চাকর-বাকরদের বলবে, "আমাদের বলতে এসেছ কেন, বড়বাবুকে বলগে না!"

মনে আছে, বাবা একদিন অভয়মামাকে বলেছিলেন, 'এইভাবে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে খরচ করছেন অভয়বাবু, ভবিষ্যৎ বলেও তো কিছু ভাবতে হয়? কনট্রাক্টরীর কাজ কখন আছে কখন নেই! ছেলে নেই আপনার—'

অভয়মামা আহত হয়েছিলেন।

সেই বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম।

যেন বাবার মুখ থেকে এরকম অসভ্য কথা শোনবার আশা করেন নি। কালো হয়ে ওঠা মুখে বলেছিলেন, 'ওরা কি আমার ছেলে নয়, মেজ বোনাই? শোভন, মোহন, কানু, সোমু, গৌর? ওরা কেউ আমাকে দু' মুঠো ভাত দেবে না?…ব্যাঙ্ক কি ওদের চেয়ে বেশী নির্ভরের জায়গা?'

সেই অভয়মামাকে দেখলাম এইখানে এইভাবে।

শোভন মোহন কানু সোমু গৌর, এরা কি সবাই মারা গেছে? অভয়মামার ভাইয়েরা ভাইবৌ-রা কেউ বেঁচে নেই?…

ওমা, সে কি কথা! আছে বৈকি! সুখে স্বচ্ছন্দে যশে গৌরবে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে প্রত্যেকেই এক এক 'জন'।

ওদের ছেলেরাই তো কেউ জার্মানীতে, কেউ আমেরিকায়, কেউ বিলেতে পড়তে গেছে, মেয়েও বিলেত গেছে কার যেন দুটো! ভাইঝি-জামাইরাও কম কেষ্টবিষ্টু নয়।…

তাহলে?

'তাহলে—,' যে বিধবা মহিলাটিকে প্রথমে ঝি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি নি আমি, এবং পরে জানলাম অভয়মামার উনি পিসতুতো ভাগ্নী, সেই দুঃস্থ চেহারার মহিলাটি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন—'তাহলে আর কি! দুনিয়ার খেলা! বড়মামার যখন বয়েস হলো, কাজকর্ম আর তেমন পারলেন না, তখনই সংসারে অসন্তোষ দেখা দিল, হঠাৎ একদিন ভাইয়েরা মনোমালিন্য করে আলাদা হয়ে গেল, বড়মামা কার ভাগে পড়বেন তাই নিয়ে লাঠালাঠি। ভাইপোরা বলল, "আপনার উচিত এসব অশান্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে কোনো তীর্থস্থানে থাকা!"…পাটনার বাড়িটা যে বড়মামার টাকায়, সে কথা যেন ভুলেই গেল।…বড়মামাও তো তখন দেখে শুনে লজ্জায় ধিক্কারে অভিমানে অন্য রকম হয়ে গেছেন। বললেন, "বেশ তাই থাকবো, তোরা তবে সব ভাইতে মিলে আমায় মাসোহারা দে—"

'ওরা মুখ ভারী করে বলল, "নিয়ম করে কে কত পাঠাতে পারবো প্রমিস্ করি কি করে?…টাকা যখন ছিল অজ্ঞান হয়ে খরচ করেছেন, এখন অন্যের কাছে হাত পাততে হচ্ছে—"

…সেইদিনই এক কাপড়ে শূন্যহাতে এখানে এসে উঠলেন। আমার তো দেখছেন এই অবস্থা, আর—ওঁরা চিরদিন রাজার হালে থেকেছেন, ভয়ে মরি।…বড়মামা বললেন, 'সে ভয় করিস না! আমিই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি কখন তুই দূর করে দিস্!'…

মহিলাটি একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'সে তো কথা নয়। তবে আমার অবস্থা তো দেখছেন? ওই রোগা বুড়ো মানুষকে খেতে দিই কি, তার ঠিক পাই না। যখন শাকচচ্চড়ি ভাত খেয়ে বলেন, "বেশ খাচ্ছি—" চোখে জল আসে আমার!···তাও তো ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে

উঠে গিয়ে অভয়মামার কাছে বসলাম। স্নেহে হাত বাড়িয়ে একটু ছুঁয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'জানতাম খবর পেলেই তুই ঠিক আসবি!'

গভীর একটা নিশ্বাস পড়ল।

বললাম, 'কী অকৃতজ্ঞ পৃথিবী! অভয়মামা, শুনলাম সব!···আপনি আমার কাছে চলুন! আপনার চিকিৎসা করানো দরকার।—'

সেই অন্ধকার পৃথিবীর মাঝখানে হ্যারিকেনের আলোজ্বালা ঘরে অভয়মামার প্রায় আশীবছরের দেহখানাকে কঙ্কালের মতই দেখতে লাগছিল, তবু সেই মুখে হেসে বললেন অভয়মামা—'পাগল!'

আমি অনেক নির্বেদ প্রকাশ করেছিলাম এবং ঈশ্বর জানেন আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছিলাম, কিন্তু অভয়মামা রাজী হলেন না। শুধু সস্নেহে পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'তুই যে বললি এই আমার অনেক। এই শেষ অবস্থায় আর খাঁচাখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে নেই। তবে তুই আমার শরীর নিয়ে যখন এত ব্যস্ত হচ্ছিস তখন একটা কাজের ভার দিচ্ছি···'

বালিশের তলা থেকে একটা পুরনো চশমার খাপ বার করলেন অভয়মামা, তার থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ। কোনো একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশান।

বললেন, 'এই ওষুধটা পাটনার ডাক্তার দিয়েছিল একবার। খেলে হার্টের কষ্টটা কমে, এখানে পাওয়া যায় নি।···যাবার নয়ও। পাটনাতেই পাওয়া যায় নি, কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে হয়েছিল।··· তা এই ওষুধটা যদি একটু চেষ্টা করে পাঠাতে পারিস! তুই আগ্রহ

করছিস বলেই বলছি !—এক এক সময় ওই হার্টের কষ্টটাতেই বড় ইয়ে করে দেয়—'

গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'অত করে বলতে হবে না মামা, আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব।'

স্নেহে শ্রদ্ধায় তৃপ্তিতে আর বোধ করি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আনন্দে বুকটা অত ওঠাপড়া করে অভয়মামার। সেই বিহ্বল বিগলিত সুরে বললেন, 'জানতাম ! পৃথিবীটা যে ভগবানের তৈরি এ বিশ্বাস এখনো ফুরোয় নি। ওরা বলছিল, "কবে কোন ছেলেবেলায় দেখেছেন, এমন কিছু আত্মীয়তাও নেই, তিনি কি আর চিনতে পারবেন ?···এখন তাঁর কত নামডাক—", আমি বলেছিলাম—'পারবে পারবে। তাই গোড়া থেকে বলে রেখেছিলাম ওদের—'

উঠে আসার সময় সেই মহিলাটি বললেন, 'ওষুধটা যাতে তাড়াতাড়ি আসে—'

বললাম, 'নিশ্চয় নিশ্চয় !'

মহিলা বললেন, 'কারো তো কিছু নিতে চান না, আপনার ওপর খুব স্নেহ শ্রদ্ধা দেখলাম। তাহলে দেবেন পাঠিয়ে শীগগির ! বুকের কষ্টটা যখন বাড়ে, চোখে দেখা যায় না।'

বললাম, 'অত বলতে হবে না। আমার নিজের যা মনোকষ্ট হচ্ছে ! ঠিকানাটা দিন, কলকাতায় পৌঁছেই—'

মহিলাটি ঠিকানাটি লিখে এনে দিলেন, তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

হ্যাঁ, কলকাতায় পৌঁছেই পরিচিত ডাক্তারখানায় খোঁজ করেছিলাম, বলল, 'নেই ! দে'জ মেডিকেলে, কি ফ্র্যাঙ্ক রসে দেখুন চেষ্টা করে।'

ওটা দূরের পাড়া, চেষ্টা করতে দুটো দিন দেরি হয়ে গেল, ওখানে বলল, 'ফুরিয়ে গেছে, সামনের সপ্তাহে আসবে !'

কিন্তু সামনের সপ্তাহে এমন একটা জটিল কাজে আটকে পড়লাম যে যাওয়াই হল না। ভাবলাম, কী না জানি মনে করছেন অভয়মামা,

কী ধারণা জন্মাচ্ছে আমার উপর ! মহিলাটির সেই শেষকথাটা মনে পড়ে কাঁটা বিঁধছে—'কারো তো কিছু নিতে চান না ! আপনার ওপর খুব—'

লিখি লিখি করি, আবার ভাবি নাঃ, ওষুধটা আনিয়ে নিয়েই একেবারে—অথচ রোজই একটা-না-একটা কাজ পড়ে যায়, যাওয়া হয় না।

নাঃ, পোস্টকার্ড একখানা ফেলে দেওয়া খুব উচিত ছিল। কেন যে গড়িমসি করলাম !

দেব লিখে ?

কিন্তু ওষুধটা না পাঠিয়েই ?

এতদিন পরে ওই 'পাওয়া যাচ্ছিল না, যোগাড় হয়েছে শীঘ্র পাঠাচ্ছি' কথাটা লিখি কোন্ লজ্জায় ? যাক্, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পঁয়ষট্টি, ও কালই একেবারে হেস্ত-নেস্ত করে ফেলব।

কাল হয় না। বেরোবার মুখে বন্ধু এসে আটকাল।

বিশেষ বন্ধু। মেয়ের বিয়ে লেগেছে, আমার সঙ্গে কেনাকাটা করতে না পারলে জীবন মিথ্যে তার।···খুব দরকারী কাজ আছে ? শুনছে কে ? চল চল। শুধু সেদিন নয়, বেশ কয়েকটা দিনই সেই বিয়ের ঘূর্ণাবর্তে কেটে গেল, সত্যি বলতে এই সমারোহেই একটু ভুলেও গেলাম সেই 'খণ্ডখোলা' গ্রামের মাটির ঘরের ছবিটা। সেই নিষ্প্রভ-দৃষ্টি বৃদ্ধের আশার উজ্জ্বল চোখ।···

বিয়ে চুকে যাওয়ার পর হঠাৎই মনে পড়ল। আর মনে পড়ে লজ্জায় মরে গেলাম !···অকারণ এমন একটা কাজ করেছি, যাতে অভয়মামার চোখে হাস্যকর রকমের হেয় হয়ে গেছি।···আমায় বলেছিলেন, 'তোকে দেখে আবার যেন মানুষের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছি রে—'

এখন আমার প্রতি কোন্ ধারণা পোষণ করছেন অভয়মামা? এবং সেই মহিলাটিও?

কত অসার, কত অন্তঃসারশূন্য, কত ভেজাল! ভাবতে থাকি আর বুকে শূল বেঁধে। না, না, এ অবস্থায় থাকা চলবে না। একে ম্যানেজ করে নিতেই হবে···

যাক, না হয় একটু অনৃতভাষণই হোক।

অভয়মামার মানুষের প্রতি শেষ বিশ্বাস হারানোকে বাঁধ দিতে, ওটুকু পাপ করা দোষের নয়।···ঠিক করলাম সেই দেখা হওয়ার কাছাকাছি সময়-ঘেঁষা পুরনো তারিখ দিয়ে ওষুধটা পাঠিয়ে দিই। তার সঙ্গে তেমনি তারিখেই একটা চিঠি।

চিঠির তারিখ দেখে তাজ্জব হয়ে যাবেন অভয়মামা! ডাক বিভাগের অবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়ে যাবেন। তার সঙ্গে—আমার প্রতি যে ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন, তার জন্যে লজ্জিত হবেন। ডাকের কেলেঙ্কারিতে কত চিঠি কত পার্শেল দু চার বছর পার করে ফেলে। আর এ তো মাত্র দেড় দুটো মাস!

ডাকের ছাপ? সে আর সেই বার্ধক্যে নিষ্প্রভ চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে না। চিঠিতে পরিষ্কার ছাপ তো আজকাল দেখাই যায় না। হয় কালিশূন্য, নয় কালি ধ্যাবড়া! কাজ যে কত অযত্নে করা যায় তার পরিচয়পত্র ওই কালির পরিমাণ!···এই 'কালি'র কথা ভেবে 'খালি খালি' বুকে বেশ বল পেলাম।···এবার তো অভয়মামার পুরনো ধারণা কাটবে? এরপর নিশ্চয়ই পর পর চিঠি দিয়ে চলবো। লিখবো, 'অভয়মামা, কেমন আছেন? অভয়মামা, ওষুধটা ব্যবহার করে কোনো উপকার পাচ্ছেন কি না? অভয়মামা, মনে করছি শীতটা একটু কমলেই ওখানে যাবো। এবার আর ছাড়ছি না, টেনে নিয়ে আসবো।'

এই ম্যানেজ করার চিন্তায় বুকের বোঝা নামলো। চিঠিখানা লিখে ফেললাম পুরনো তারিখ দিয়ে। ওষুধটা কিনেই, আর কোনো

কথা নয়। সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল, পরদিন বেরোবার মুখে, হ্যাঁ, একেবারে বেরোবার মুখেই আবিষ্কৃত হল ভয়ঙ্কর ঘটনাটা!

ভাঁজকরা আধময়লা ছোট্ট সেই কাগজটুকু হারিয়ে গেছে! তার সঙ্গে অভয়মামার ঠিকানাও। দুটো কাগজের কোনোটাই ভাঁজ খুলে পড়ি নি কোনোদিন, যেমন ছিল, ছিল। এখন আর নেই। হয়তো বহুবিধ জঞ্জালের সঙ্গে চলে গেছে পথের ধুলোয়, ডাস্টবীনে!

অর্থাৎ সেই একই পথে চলে গেল অভয়মামার সেই বিশ্বাসটাও।

'পৃথিবীটা যে ভগবানের তৈরি' এ বিশ্বাস আর কিসের উপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন অভয়মামা?

তেমন চেষ্টা করলে কি অভয়মামার ঠিকানা সংগ্রহ করা যেত না? যেত বৈকি! ওই ফাংশানের দলের ঠিকানা পেলেই হয়ে যেত।··· আর সেটা পাওয়া অসম্ভব হত না। কিন্তু দিন যত পার হয়, বাধা ততই প্রবল হতে থাকে।···আর ভাবতেও ইচ্ছে হয় না।

অভয়মামার চিন্তাটাই যেন একটা অস্বস্তির মূর্তি নিয়ে ডেলা পাকিয়ে বসে থাকে। আর তারই নিচে খচ্ খচ্ করতে থাকে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা। একটা লোকের 'কিছু মনে করা'র ভার এত পাষাণভার?

অথচ কারণ কিছুই ছিল না। 'আজ করি কাল করি,···চিঠি লিখি কি না লিখি, খামে লিখি কি পোস্টকার্ডে লিখি', এই ভাবতে ভাবতেই ইচ্ছেটা কাজে পরিণত হয়ে ওঠে নি।···হয়ে ওঠে নি প্রথম ঝোঁকের মুখেই ওষুধটা না পেয়ে।···

জীবনে এমন হয়তো কতই হয়!

কত কাজই 'করি করি' করে কোনো দিনই আর করা হয়ে ওঠে না।···কত জায়গায় 'যাবো যাবো' করে যাওয়া হয় না। তবু অভয়মামার সেই নিষ্প্রভ চোখ দুটো প্রতিদিন পিয়নের পদধ্বনির আশায় আরো কত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ভাবতে ভয় করে।

আরো ভয় করে অন্য এক সম্ভাবনায়।

হয়তো বিষণ্ণও হন নি অভয়মামা, হয়তো মৃদু হেসেছেন। অভিজ্ঞতার হাসি! হাসিকে কথায় দাঁড় করালে এই দাঁড়াবে, 'জানতাম! এ আমি জানতাম! দেখলাম তো দুনিয়াখানা!'

হ্যাঁ, মন বলছে বিষণ্ণ হন নি অভয়মামা, এই হাসিই হেসেছেন!··· সেই হাসির সামনে নিজেকে সেই অবধি দাঁড়িয়ে রেখেছি হেঁটমুণ্ডে। যে মাথাটা আর কোনদিনই সোজা হয়ে বলতে পারবে না, 'অভয়মামা, সেদিনের সেই নিশ্বাসটা কিন্তু ভেজাল ছিল না!'

আজকের ডাকে অন্য কোনো চিঠি আসে নি। শুধু অভয়মামার দরুন ওই চিঠিটা! নেড়ে চেড়ে দেখছি। ভাইপোরা খরচ করেছে। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, খামটা দামী! রুচি আছে।

ভাষাও সভ্য মার্জিত!

যথাবিহিত বিনয় নিবেদনান্তে লিখেছে—'মহাশয়, বিগত ষোলই আশ্বিন আমাদের পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত অভয়শঙ্কর মজুমদার মহাশয় সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। আগামী পঁচিশে আশ্বিন—' ইত্যাদি।

ওরা ওদের পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাতের শেষকৃত্য সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করল, তা আর মনে এল না। চিঠিটা নামিয়ে রেখে গভীর একটা নিশ্বাস ফেললাম। স্বস্তির নিশ্বাস! অনেকদিন পরে নিজেকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে আনতে পারার স্বস্তি!

মোড়

স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে যেন বিস্মৃত হয়েই নবাগত অতিথির কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রমাপদবাবু মেয়ের গুণবর্ণনায়। 'আশ্চর্য ক্ষমতা মশাই, আশ্চর্য ক্ষমতা! দেখে শুনে আমি তো একেবারে তাজ্জব বনে গেছি! কীই বা বয়েস, এই তো সেদিনও ফ্রক পরে লাট্টু ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে! আর আজ? আজ একেবারে কি বলব'—জোরে হেসে ওঠেন রমাপদবাবু, 'একেবারে ওই আপনার গিয়ে "চিত্রাকাশের উজ্জ্বল তারকা"।'

নবাগত অতিথি সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আমি জানি বলেই তো! এঁদেরই বলে জাতশিল্পী। ওঁর প্রথম ছবি তো ওই "সোনালী স্বপ্ন"?'

'হ্যাঁ।' হৃষ্টচিত্তে বলেন রমাপদবাবু, 'ওই এক ছবিতেই বাজার মাৎ। সঙ্গে সঙ্গে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এই তো এখন একসঙ্গে ছ খানা ছবির কাজ চলছে, আরও খান তিনেক কণ্ট্রাক্ট করা রয়েছে। মেয়ে তো বলে, "আর পারছি না বাবা, এবার কেউ এলে বোলো ভীষণ অসুস্থ, ডাক্তারের বারণ!" আমি বলি—'

তিনি কি বলেন সেকথা শোনবার আগেই আগন্তুক ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'সে আপনি অন্য পার্টিকে বলবেন, আমি কোন আপত্তি শুনব না। একেবারে তৈরী হয়েই এসেছি, কণ্ট্রাক্ট করিয়ে নিয়ে তবে উঠব।'

'এই তো মুশকিল!' রমাপদবাবু যেন ভারি মুষড়ে গেছেন, যেন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন! 'সবাই এই একই কথা বলবেন আপনারা, তা হলে তো নাচার! অথচ দেখুন, নেমেছিল নেহাত শখের খাতিরে। ওই যে প্রোডিউসার গোপীকান্ত রায়? উনি হচ্ছেন—' রীতিমত গর্বিত সুরে বলেন রমাপদ, 'আমাদের একেবারে আত্মীয়ের মত। ওঁরই অনুরোধে—'

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, সে সব জানি। আজকাল ওই সব সিনেমাপত্রিকাগুলির কল্যাণে তো কোন আর্টিস্টেরই হাঁড়ির খবর জানতে বাকী থাকে না কারও। আপনার মেয়ে কোন্ খাবার পছন্দ করেন, অথবা কোন্ রঙের শাড়ি, কী তাঁর 'হবি' কিংবা কী তাঁর আদর্শ, সেকথা আপনার থেকে বেশী জানে জনসাধারণ!'

হেসে ওঠেন দু' জনেই।

রমাপদ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে কিসে যেন জীবনী বেরিয়েছিল ওর। পড়া হয় নি। মেয়ে আমার—' আর একবার গর্বে গদগদ কণ্ঠে বলে ফেলেন রমাপদবাবু, 'একটু খামখেয়ালী কিনা! কোনখানে কিছু নেই, হঠাৎ পত্রিকাখানা জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিল!'

'সে কী? কেন?' ভদ্রলোক বলে ওঠেন।

'আর কেন!' রমাপদবাবু পুলকিত উৎসাহে বলেন, 'বললাম তো—মহা খেয়ালী মেয়ে! বলে কি না, "আমি কী বললাম, আর ওরা কা লিখল! যত সব বাজে ন্যাকামি।" আসল কথা পাবলিসিটি একেবারে চায় না।'

ভদ্রলোক হেসে উঠে বলেন, 'উনি পাবলিসিটি না চাইলে কি হবে, পাবলিসিটি ওঁকে চায়। এখন অনুগ্রহ করে যদি ওঁকে একবার—'

'আচ্ছা, আচ্ছা সে তো হবেই!' রমাপদবাবু এবার উচ্ছ্বসিত সুর ছেড়ে ব্যবসাদারী সুরে বলেন, 'টাকাকড়ির কথাটা আগে হয়ে যাক!'

'সেটা উনি না এলে—' সসঙ্কোচ বিনয়ে বলেন ভদ্রলোক, 'মানে ওঁর সামনাসামনি না হলে, কি করে হতে পারে?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়েন রমাপদবাবু, 'দরকার নেই, তার কোন দরকার নেই, ও যা কিছু বলবার কইবার সবই এই আমি—বুঝলেন? মেয়ে শুধু কণ্ট্রাক্টে সই করে খালাস। আর সত্যি বলতে কি, সে এসব দরাদরির বোঝেই বা কি? বললাম তো আপনাকে, এদিকে একেবারে বাচ্চা! শুনলে বিশ্বাস করবেন না মশাই, এখনও পোষা খরগোশ দুটোকে নিয়ে খেলতে পেলে আর কিচ্ছু চায় না। কবে

কখন কোথায় শুটিং থাকে, সে-সব সে নিজে খেয়াল রাখে নাকি? সে-সব জানবে ওর মা। শুধু জানা? বাচ্চা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর মত ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে বেঁধে পাঠাতে হবে। অথচ অভিনয় যখন করে, দেখেছেনই তো? তাজ্জব বনে যেতে হয়।'

আগন্তুক স্মিতমুখে বলেন, 'বললামই তো জাতশিল্পী! না হলে এত কাড়াকাড়িই বা কেন বলুন? আমরা তো আমাদের পর পর তুটো ছবিতেই ওঁকে রাখব ঠিক করেছি। কিন্তু ওঁকে না দেখে তো কোন কথা হতে পারে না।'

'দেখবার আর আছে কি—' রমাপদবাবু ঝেঁজে ওঠেন, 'দেখা তো করবেই। তাড়াতাড়ি কিসের? কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি ওর বাপ?'

'আহা-হা, ওকি কথা? চটছেন কেন আপনি?' ভদ্রলোক কিছুটা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'ওঁর অনুপস্থিতিতে পাকা কথা কি করে হয় বলুন?'

'হয় না? পাকা কথা হয় না?' রমাপদবাবু আগুন হয়ে ওঠেন, 'আমি তার বাপ, আমি তার গার্জেন, আমার সঙ্গে পাকা কথা হবে না? ভারি তালেবর হল সে? জানেন সে এখনও নাবালিকা?'

ভদ্রলোক হচ্ছেন ঘুঘু ব্যক্তি। তাই মনের বিরক্তি সম্পূর্ণ হজম করে নিয়ে সহসা প্রসন্ন হাস্যে বলে ওঠেন, 'আহা-হা, সে কি আমি অস্বীকার করছি? তবে কিনা তিনিই যখন—'

'হ্যাঁ আমিই যখন—' তু' জনের কথার মাঝখানে একটি নাটকীয় আবির্ভাব ঘটল! "এক ছবিতে বাজার মাৎ করে দেওয়া উজ্জ্বল তারকা" নন্দিতা রায় এসে ঘরে ঢুকলেন, কথা বলতে বলতেই।

পাশের ঘরে থেকে রমাপদর কথাবার্তাগুলো এত অসহ্য ঠেকছিল তার যে, শেষ পর্যন্ত বোধ করি ধৈর্য রাখতে পারলে না। এসে বসে পড়ে বলল, 'বাবা, ঠিকই বলছেন ইনি। আমিই যখন কাজটা করব,

আর সাইনটাও আমাকেই করতে হবে, তখন আমাকে বাদ দিয়ে পাকা কথা কওয়ার সত্যিই কি কোন অর্থ আছে?'

এযাবৎকাল রমাপদবাবু মেয়ের গুণপনায় তাজ্জব বনে এসেছেন কিনা ঈশ্বর জানেন, তবে আজ বনলেন। গুণপনায় নয়, ব্যবহারে। নন্দিতার পক্ষে এ ধরনের ব্যবহার খুবই আশ্চর্যের বৈ কি। এ তো বাপকে প্রায় অপমান করাই! এর আগে এমনটা কখনও হয় নি!

অন্তরে অন্তরে মেয়েকে কি সম্বোধন করলেন, সেকথা রমাপদবাবুর অন্তরই জানে, তবে বহিরঙ্গ লোকে দেখল কন্যার আবির্ভাবে, রমাপদবাবু যেন 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন। হৈ হৈ করে বলে উঠলেন, 'এই দেখ কাণ্ড! তুমি আবার এসব কচকচির মধ্যে কেন মা? বেশী কথা কইলে তোমার শরীর খারাপ লাগে, মাথা ধরে, সেকথা আর কেউ না জানলেও, আমি তো জানি। তাই তোমাকে আগে আগে ডাকতে চাইছিলাম না। দরে বনলে, কন্ট্রাক্টে সই করতে তো তোমায় ডাকতেই হত মা! শুধু তোমার স্বাস্থ্যের জন্যেই—'

দরে বনা!

কথাটার সমস্ত অসৌন্দর্য আর গ্লানি নিঃশব্দে পরিপাক করে নন্দিতা আশ্চর্য সুন্দর একটু হাসি হেসে বলে, 'সে আমি জানি বৈকি বাবা! কিন্তু এঁদেরও তো একটা স্বস্তি-অস্বস্তি আছে? আচ্ছা বলুন আপনার বক্তব্য'—দোদুল্যমান বেণীযুগলের একটাকে টেনে নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সহাস্য মুখে বলে নন্দিতা, 'ডিরেক্টর পছন্দ না হলে কিন্তু আমি রাজী হচ্ছি না। ডবল দক্ষিণা পেলেও না।'

রমাপদ প্রমাদ গণেন।

দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া মেয়ের আজকের মতিগতি সুবিধের নয়। অথচ নিউ আলিপুরে যে জমিটা তিনি সম্প্রতি কিনে ফেলেছেন, আর খানদুই ছবির কন্ট্রাক্ট হলেই সেটাতে বাড়ি শুরু করে দেওয়া যায়। কোথা দিয়ে কি হল, এই তিন চারটে বছরের মধ্যেই যেন মা-লক্ষ্মী বন্যার স্রোতের মত এসে ঘরে ঢুকলেন। এরই মধ্যে সারা সংসারের

হালচাল বদলে গেছে। সকলের অভ্যাসও বদলে গেছে। আহারে, বিহারে। চিরদিনের দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত বুভুক্ষু মনগুলো যেন আকণ্ঠ ভোজে তৃপ্ত হতে চায়। গাড়ি হয়েছে, এখন বাড়ির দরকার। আর নেহাত যেমন-তেমন বাড়ির কথা তো এখন আর ভাবাই চলে না! করলে ভাল বাড়িই করতে হবে। কিন্তু, মনে মনে মেয়ের সম্বন্ধে একটা কটূক্তি করে ভাবেন রমাপদ, দিন দিন যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে হতভাগা মেয়ে। কিছুদিন শুরু করেছিল 'আর করব না, আর পারছি না'—অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বাড়িখানা হয়ে গেলেই ওসব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করে দেবেন এই সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটু বশে এনেছিলেন, এবং দর-কষাকষির ব্যাপারটা নিজের হাতে রেখেছিলেন, কিন্তু আজ আবার তার এ কী আচরণ? নিজেই কর্তা হতে চায় না কি? চায় ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে? কিন্তু এখন মেজাজ দেখানো চলে না, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আহা সে কি আর উনি বোঝেন না? অবশ্যই নামকরা ডিরেক্টর, তোমাকে যখন চাইছেন—'

'আমাকে তো—' নন্দিতার মুখে এক টুকরো ব্যঙ্গহাসি ফুটে ওঠে, 'সকলেই চায় বাবা! কিন্তু সেকথা যাক, পরিচালকের নামটা বলুন শুনি। কি কি বই করেছেন এর আগে?'

ভদ্রলোক যুগল করতল একত্রিত করে বিনয়-গদগদ কণ্ঠে বলেন, 'আগে যে কোন ছবি করেছেন তা নয়, তবে বরাবর এইদিকে ন্যাক আছে। প্রচুর পয়সাওলা লোক। মানে প্রোডিউসারও উনিই। আর বইও ওনারই লেখা। নাম হচ্ছে গিয়ে গোবর্ধন মাইতি।'

'মাপ করবেন।' প্রায় সশব্দেই হেসে ওঠে নন্দিতা, 'মাপ করবেন আমাকে। ও আমার দ্বারা হবে না। মানে একেবারে আনকোরার কাছে কাজ করা? উঁহু অসম্ভব!'

রমাপদ মনে মনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। জ্বলে ওঠেন, কারণ 'প্রচুর পয়সাওলা' শব্দটা তখন তাঁর মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে ধাক্কা

দিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে মনে বলেন, 'ওঃ, একেবারে নবাব খাঞ্জাখাঁর বেটি! একটু নাম হয়েছে বলে ধরাকে সরা দেখছিস! আনকোরার কাছে কাজ করতে পারবি না! এই সেদিনও তুই নিজে আনকোরা ছিলি না? হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া মেয়ে, মা-লক্ষ্মীর দয়ায় যদি একটু সুদিন এসেছে তো, দু হাতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গুছিয়ে নে। তা নয়, দিন দিন অহঙ্কারে মটমট করছেন।' তবে মুখে বলেন, 'একেবারে 'অসম্ভব' বলে ছেড়ে দিচ্ছ কেন মা? কার মধ্যে যে কী প্রতিভা লুকনো থাকে কে বলতে পারে? এই তো তুমিই তো তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।'

আগন্তুক ভদ্রলোক মহোৎসাহে বলে ওঠেন, 'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন আপনি। মাইতিমশাইয়েরও খুব ইয়ে আছে। তা ছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপারে, বুঝলেন কিনা, উনি একেবারে দিলদরিয়া! বলে দিয়েছেন আপনি যা বলবেন তাই।'

হঠাৎ দু'দুজন সা-জোয়ান পুরুষকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নন্দিতা, 'কিছু আর বলব কি? ও আপনার ডিরেক্টরের নাম-টাম শুনেই আমার কেমন যেন ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। কি করি বলুন? বাবা, আমি উঠি!'

ভদ্রলোক কালিবর্ণ মুখে বলেন, 'আর একবার ভেবে দেখলে হত না?'

'না না অসম্ভব।'

'টাকা সম্বন্ধে যদি—'

'না না, কোন সম্বন্ধেই কিছু নয়, মাপ করবেন।' হঠাৎ বেণী দুলিয়ে সত্যিই বাচ্চা মেয়ের মত ছুটে পালায় নন্দিতা। আর রমাপদবাবু তাঁর চেষ্টাকৃত সমস্ত পালিশ বিস্মৃত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে শেখো নি অসভ্য মেয়ে! ভারি অহঙ্কার হয়েছে তোমার। ···আপনাকে আর কি বলব মশাই—'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝে নিয়েছি। আচ্ছা নমস্কার!'

ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

আর রমাপদর মনে হল ওই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিউ আলিপুরের সেই দক্ষিণমুখী পাঁচ কাঠা প্লটটার ওপর বুক সোজা করে দাঁড়ানো একখানা প্রাসাদ ছায়ার মত শূন্যে মিলিয়ে গেল!

হবে না, হবে না। বাড়ি আর হবে না। ওই হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া সর্বনাশী মেয়ে হতে দেবে না। কিছুদিন থেকেই এ সন্দেহ হচ্ছে তাঁর। শত্রু, শত্রু! সাধে আর বলেছে মেয়ে সন্তান চির পর!

রাগে দুঃখে অপমানের জ্বালায় অদ্ভুত বীভৎস দেখাল রমাপদবাবুর মুখটা। তিনি যেভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলেন, মনে হতে পারে হয়তো বা কুড়ি বছরের মেয়েটাকে ধরে ঠেঙাবেন। কিন্তু আসলে কিছু করলেন না, শুধু ভিতরে গিয়ে অনেকদিন পরে খালি মেজেয় বসে পড়লেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

হ্যাঁ, মেজেয় বসা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছেন এঁরা। ঘরে ঘরে সোফা সেটি চেয়ার আর শৌখিন বেতের মোড়ার আমদানি হয়েছে এখন। আজ মাটিতে বসলেন। বসলেন না, বসে পড়লেন।

ইন্দিরা একখানা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে একটা সিনেমা-পত্রিকা উল্টোচ্ছিলেন। আগে যে জিনিস এবাড়ি ওবাড়ি থেকে এক-আধখানা চেয়েচিন্তে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হত, আজ সেই জিনিসে বাড়ি ভর্তি। যেখানে যত সিনেমা-পত্রিকা বেরোচ্ছে সব আসছে নন্দিতা রায়ের নামে। অবাক হয়ে যান ইন্দিরা, আর নিজের মেয়েটিকে একটি মূল্যবান সম্পত্তির মত মনে করলেও কেমন যেন একটু জ্বালা অনুভব করেন।

কিসের জ্বালা? ঈর্ষার?

হয়তো বা তাই। এ যুগে জন্মালে ইন্দিরাই কি— ? না, এটা প্রথম

প্রথম হয় নি, তখন মেয়ের গৌরবে আহ্লাদে প্রাণ উথলে উঠত। হয়েছে ইদানীং। নন্দিতার 'মেজাজ' বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

যে মেয়েকে চিরদিন চোখ-রাঙানির তলায় রেখে এসেছিলেন, হঠাৎ সে যেন নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাকে এখন সমীহ করতে হয়, ভয় করে চলতে হয়। 'দূর হ, বেরো, তোকে দরকার নেই' বলবার উপায় নেই। সেই নিরুপায়তার জ্বালাই আজকাল ভারি কষ্ট দিচ্ছে ইন্দিরাকে।

স্বামীর বসে পড়ার ধরনেই ইন্দিরা বুঝলেন ব্যাপার সুবিধের নয় বই রেখে হাই তুলে বললেন, 'কি হল?'

'হবে আর কি!' রমাপদ একটি অগ্নি-নিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'কালসাপ পুষছি, তার ছোবল খেতে হবে না?'

ইন্দিরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলেন, 'নতুন কেউ এসেছিল বুঝি?'

'হুঁ! আর যে-সে লোক নয়। মহা পয়সাওলা দরাজ লোক! এখুনি একটু মোচড় দিলেই হাজার কুড়ি-বাইশ ঘরে তুলতে পারা যেত!'

'কুড়ি—বা-ইশ!'

'তবে না তো কি? এসব কাজে এবেলা ওবেলা রেট বাড়ে না? মোচড়ই বা কেন, যেচে দিতে চায় লোকে।'

ইন্দিরা আর একবার স্তব্ধ হয়ে থেকে ফের বলেন, 'কি বলল? করবে না?'

'হুঁ! কী, না পরিচালকের নাম পছন্দ হল না মহারাণীর! "মলয়কুমার" কেন নয়, "গোবর্ধন" কেন?'

'শুধু নামের জন্যে?' ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ইন্দিরা! ক'দিনেরই বা কথা, মাসের শেষের দিকে বিশ-বাইশটা টাকার স্বপ্ন দেখাও তখন পাগলামি ছিল। নন্দিতা কি এখুনি সেদিনের কথা ভুলে গেল? আর কিছু নয়, টাকার গরম ধরেছে মেয়ের! আর শুধু টাকাই বা কেন? নাম যশ আদর! কাঁচা মাথা, বিগড়ে গেছে।

'মেয়ে হতে খুব গৌরব বাড়ল আমার! এ-গালে চুন, ও-গালে কালি!' নিজের তুই গালে তুই চড় মেরে বলেন রমাপদ।

ইন্দিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ইচ্ছে হয় না, তবু—বলছি কি, আমি একবার বোঝাবার চেষ্টা করে দেখব?'

'পারবে না—পারবে না—' রমাপদ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও একেবারে বিচ্ছু হয়ে উঠেছে। শুধু এটা কেন, আর কখনও করে কি না তাই দেখ। ওর ভাবগতিক ভাল নয়।'

ইন্দিরা গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন।

পেটের সন্তান এত শত্তুর হয়?

কত স্বপ্ন কত আশা! মনে মনে কত ভাঙছেন, কত গড়ছেন! এ মেয়ের বিয়ের কথা অবিশ্যি ভাবা যায় না আর, কিন্তু আরও তুটো মেয়ে রয়েছে, তাদের ভাল ঘরে-বরে বিয়ে দেবেন, আশা মিটিয়ে ঘটা করবেন, ছেলেটাকে বড় করে তুলে বিলেত পাঠাবেন, মনের মত করে বাড়ি সাজাবেন, সব কিছুই সহসা থেমে যাবে? আত্মীয়সমাজে চিরদিনই তো ছোট হয়ে থেকে এসেছেন, মাত্র এই তু-তিনটে বছর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল, সে মোড় আবার ঘুরে যাবে?

বললেন, 'সাধনকে দিয়ে একবার বলে দেখব? ওকে তো খুব ইয়ে করে। ছেলেবেলার খেলুড়ি!'

সাধন পাশের বাড়ির ছেলে।

একদা নন্দিতা যখন সত্ত কিশোরী তখন তাকে খুব ইয়ে করার জন্যে নন্দিতাকে শাস্তির কিছু কসুর করেন নি ইন্দিরা। তবে এখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখন নন্দিতাকে চোখে চোখে রাখার কথাই হাস্যকর।

রমাপদর অগ্নিগোলক চোখ তুটো নিভে-আসা কয়লার মত হয়ে আসে।

'ওর কথা শুনবে বলে মনে হয়?'

'আশা তো করছি।'

'ও ছোকরাকেও বোঝা যায় না। কখনো মনে হয় বেশ মান্য ভক্তি করে আমাদের, কখনো মনে হয় যেন ব্যঙ্গ করছে।'

'ব্যঙ্গ? ব্যঙ্গ কেন?' অবাক হন ইন্দিরা।

'কেন তার কি জানি।'

রমাপদর মেয়েও সেই কথাই বলে, 'কেন তার কি জানি। মন লাগল না।'

সাধন ভুরু কুঁচকে বলে, 'এতে মন লাগা না-লাগার কথা ওঠে কিসে? ডিরেক্টরকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ না!'

নন্দিতা বুকের নিচে একটা সাটিনের বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে শুধু ঘাড়টা তুলে কথা বলছিল। এখন কনুইটায় একটু ঠেস দিয়ে এক পাশ হয়ে বলল, 'যাচ্ছি না—তাই বা কি করে বলা যায়? যেতেও পারি।'

সাধনের হাতে বাজারের থলি। সেটা লোফালুফি করতে করতে মুচকে হেসে বলে, 'তাড়াতাড়ি কি? আগে নিউ আলিপুরের বাড়িটা উঠুক! নতুন মডেলের আরও দু-একখানা গাড়ি কেনো, তবে তো?'

নন্দিতা গম্ভীরভাবে বলে, 'ব্যঙ্গটা হচ্ছে দুর্বলের সম্বল, বুঝলে সাধনদা? কিন্তু যাক্, ওসব আর হবে না। আমি আর অভিনয় করব না।'

সাধন থলিটা নিয়ে ফের লোফালুফি করতে করতে বলে, 'তা হলে কি করবে? তুলসীর মালা গলায় দিয়ে বৃন্দাবন যাবে?'

নন্দিতা চোখ দুটো জানলার দিকে ফিরিয়ে উদাস কণ্ঠে বলে, 'তাও অসম্ভব নয়। ওই রকম একটা কিছু করা ছাড়া উপায় কি! কোন ভদ্রলোকের ছেলে তো আমাকে বিয়ে করবে না?'

'কী সর্বনাশ!' সাধন হো হো করে হেসে ওঠে, 'করবে না মানে? কৃতকৃতার্থ হয়ে করবে। করে ধন্য হয়ে যাবে।'

নন্দিতা হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তা হাতের কাছেই যখন ধন্য হবার উপায় রয়েছে—তুমিই বা চেষ্টা করছ না কেন ?'

'আমি !'

'আকাশ থেকে পড়লে যে ! কেন নয় ? ঘেন্না করে ? না সাহস হয় না ?'

'কই, মনে পড়ছে না তো কি হয়। আসলে হয়তো কিছুই হয় না, কারণ ও নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাই নি।'

নন্দিতা উঠে বসে বলে, 'শুনে খুশী হলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলে কেন ?'

'নিজে থেকে বসি নি ঠিক। কাকীমা বললেন—'

'ওঃ, ওকালতি !'

'ওকালতি নয়। সৎপরামর্শ দান।'

'কে চায় তোমার পরামর্শ ?' ফের শুয়ে পড়ে বলে নন্দিতা, 'যা করতে যাচ্ছিলে তাই কর গে যাও। বাজারে গিয়ে বেছে বেছে ঢেঁড়স কেন গে।'

'শুধু ঢেঁড়স ?' হেসে ওঠে সাধন, 'ঝিঙে, ধুঁধুল, থোড়, কচু যা এই সেদিনও তোমার বাবা বাজারে গিয়ে বেছে বেছে কিনেছেন !'

'মনে করিয়ে না দিলেও ক্ষতি ছিল না সাধনদা ! আমার মনে আছে। তার স্বাদও ভুলে যাই নি, রাঁধতেও ভুলে যাই নি।'

সাধন হঠাৎ লোফালুফি খেলাটা স্থগিত রেখে কেমন একরকম দৃষ্টিতে একবার নন্দিতাকে দেখে নিয়ে বলে, 'যাও নি নাকি ? তা হলে স্বীকার করতেই হবে তোমার স্মৃতিশক্তিটা অন্তত তোমাদের বাড়ির আর সকলের চেয়ে জোরালো।'

নন্দিতার দুই চোখে কালো কাজল, দুই ঠোঁটে লাল রং, আর হাতের পায়ের দশ দশ কুড়িটা আঙুলের নখে কেমন একটা চকচকে বেগুনে আভা। নন্দিতার পরনের শাড়িখানার দাম আন্দাজ করবার কথা সাধন অন্তত ভাবতেই পারে না। তবু নন্দিতাকে যেন

অনেকদিন আগেকার মত দেখাল। যখন সব সময় তার চুলটা থাকত রুখু-রুখু আর মুখটা শুকনো-শুকনো, পরনে সস্তা ছিটের একটা ব্লাউস আর হয়তো মায়ের পুরনো দিনের একটা রং-জ্বলা পাড়-ছেঁড়া পোশাকী শাড়ি।

সেই আগের দিনের মত মুখে নন্দিতা বলে, 'জানি এরা আর তোমাদের দেখলে চিনতে পারে না। নেহাত তুমি মান খুইয়ে মাঝে মাঝে আস বলেই—'

সাধন জোরে হেসে ওঠে, 'চিনতে পারেন না বললে ওঁদের ওপর একটু বেশী অবিচার করা হবে নন্দিতা! চিনতে না পারলে তোমাদের নতুন কেনা আসবাবপত্রগুলোয় কত দাম পড়েছে, তোমাদের গাড়ি-ধোওয়ার চাকরটাকে কত মাইনে দিতে হয়, এসব সংবাদ পরিবেশিত হবে কোন্ পাতে?'

'এদের জন্যে আমার করুণা হয় সাধনদা! তাই ভাবছি এর থেকে, এই লজ্জা থেকে এদের মুক্তি দেওয়া দরকার।'

সাধন একটু চুপ করে থেকে, ফের হাতের জিনিসটা লুফতে লুফতে বলে, 'আমি বলি কি নিউ আলিপুরের বাড়িটা হয়ে যাক না?'

'তাতে তোমার লাভ?'

'লাভ? সব লাভ কি মানে দিয়ে বোঝানো যায়? কাকীমার অনেকদিনের আশা—'

'অর্থাৎ তোমাদের কাছ থেকে দূর হয়ে যাই এই চাও, কেমন? চাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাকে সহ্য করা শক্ত।'

সাধন আর একবার চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর তেমনি একরকম হাসি হেসে বলে, 'অনেক সময় শক্ত কাজও আকর্ষণীয়। যাক, আপাততঃ জগতের সবচেয়ে কঠিনতম কাজটা করে আসি।'

নন্দিতা চকিত হয়ে বলে, 'কি?'

'ওই যে টেঁড়স ঝিঙে ধুঁধুল—' বলে হাসতে হাসতে চলে যায়। চলে যায় কিন্তু এদের বাড়ি ছেড়ে তখুনি নয়। যায় ইন্দিরার কাছে।

সাধন চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে নন্দিতা বালিশে মুখ ডুবিয়ে। শুয়ে শুয়ে ভাবে। সাধনদাটা এখনও বাস্তবজ্ঞান-বর্জিত। ভাবছে বাড়িটা হলেই আশা মিটে যাবে ইন্দিরার। আশা মিটে যাবে তার পরিবারের।

কিন্তু শুধু নিউ আলিপুরে বাড়ি হলেই চলবে? আর কোনখানে একখানা স্বাস্থ্যনিবাস থাকলে ভাল নয়? কাশী, পুরী, কি নিদেনপক্ষে ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম? মানসকে বিলেত পাঠাতে হবে না? হবে না চোখ-ঝলসানো ঘটা করে চন্দনা আর বন্দনার বিয়ে দিতে? ইন্দিরার গাঁটের বাতের জন্যে শহরের সেরা সেরা ডাক্তার চাই না? আর রমাপদর চোখের ছানি কাটাতে সুইজারল্যাণ্ড যাওয়ার দরকার হওয়াই কি অসম্ভব? নন্দিতাকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে যদি এ সবই সম্ভব হতে পারে, রাগ করেই কি ওরা ছেড়ে দিতে পারবে নন্দিতাকে?

নাঃ। এই সর্বনাশা মোহ থেকে ওদের মুক্ত করতেই হবে।

কিন্তু নন্দিতা নিজেও কি এই লোভের চক্রে বন্দিনী নয়?

তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করল নন্দিতা। না না, নন্দিতা এসব চায় না। সমস্ত মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল একটা বিধুর স্বপ্নে। ছোট ছোট ত্থখানা ঘর, আর তার কর্মব্যস্ত ঘরণী নিয়ে একখানি সুন্দর গল্পের স্বপ্ন।

একটু পরে উঠল নন্দিতা।

সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করে নিল। মাকে স্পষ্ট করে বলবে, 'তোমরা রেহাই দাও নন্দিতাকে।' বসবার ঘরে মা নেই। কোথায়? শোবার ঘরে বাবা আর মা, কি এক গভীর পরামর্শয় মগ্ন। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল নন্দিতা। ইন্দিরা বলছেন, 'শুনে তো আমি অবাক। ছোঁড়া বলে কি না নন্দিতা তাকে বিয়ে করতে রাজী।'

'হুঁ, যে-ই রক্ষক সে-ই ভক্ষক—' রমাপদ বলেন, 'তুমি আবার ওকে ধরেছিলে বোঝাতে! তবে ভাবছি মেয়েটার কি প্রবৃত্তি! মা

নেই বাপ নেই, মামার বাড়ি পড়ে-থাকা এই হ্যাংলা ছোঁড়াটাকে ওর বিয়ে করতে ইচ্ছে হল !'

ইন্দিরা একটু থেমে বললেন, 'বলা যায় না, চিরদিনের চেনা-জানা তো ! আচ্ছা আমি ভাবছিলাম কি, ধর যদি ও ঘরজামাই থাকতে রাজী হয়, বিয়ে দিলে ক্ষতি কি ? হয়তো তাতে মেয়ের মেজাজ-টেজাজ একটু ঠাণ্ডা—'

রমাপদ চাপা গলায় ধমকে ওঠেন, 'থাম তুমি ! তোমার বুদ্ধিতে চললে আর করে খেতে হত না ! বিয়ে হলেই এখুনি পাঁচটা ছেলেপুলে হবে না ? আর পারবে এভাবে খাটতে ? আর তখন দেবে তোমাকে সব টাকা ? ওসব কুবুদ্ধি ছাড়। ওই সব অপমান গিলে ওকেই তোয়াজ করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে হবে।'

ইন্দিরা সসংকোচে ফিসফিস করে বলেন, 'কিন্তু এসব লাইনে চলাফেরা ! বয়েস-কাল ! উচ্ছন্ন যেতে কতক্ষণ ? বিয়েটা হলে তবু—'

'থাম থাম ! খবরদার, বিয়ে-বিয়ে কোরো না আর। বিয়ে হলে যেন আর উচ্ছন্ন যায় না। আর—' চাপা গলায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন রমাপদ, 'উচ্ছন্ন যেতে যেন বাকীই আছে। বলে বাঘের গর্তয় গতিবিধি !'

হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে নন্দিতা।

খুব শান্ত গলায় বলে, 'বাবা, ভেবে দেখলাম এখানে থাকায় আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করব।'

'ভেবে দেখলে অসুবিধে হচ্ছে ! অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করবে !' মন্ত্রের মত উচ্চারণ করেন দুজনে একত্রে।

'হ্যাঁ।' তেমনি শান্ত গলায় বলে নন্দিতা, 'চেষ্টা করলে ভাল দাম দিয়ে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করা শক্ত হবে না।'

তার পর ?

তার পরের কথা তো ক্রমশঃ সকলেই জানতে পারছেন।

ফ্ল্যাটবাড়িতে একা থাকা মেয়েকে মা-বাপমরা মামার বাড়ি পড়ে-থাকা অখদ্যে পাত্রও বিয়ে করতে চায় নি। আর—পরে নন্দিতারই ভীষণ হাসি পেয়েছে নিজের একসময়ের ওই পাগলামির জন্যে। পাগলামি ছাড়া আর কি ?

কোথায় দেশবন্দিতা নন্দিতা রায়, আর কোথায় রেল-অফিসের ছোট কেরানী সাধন বোস !

মা-বাপ আর মুখ দেখে না, বলে, 'মেয়ে আমাদের মরে গেছে।' কিন্তু তাতে কি? বন্ধুবান্ধব হিতৈষী আত্মীয়ের কি অভাব আছে নন্দিতার? শুধু হঠাৎ এক-এক দিন যখন একা থাকতে ভাল লাগে, তখন ভাবতে চেষ্টা করে নন্দিতা, সাধন সেদিন ওকথা বলেছিল কেন ? নন্দিতা তাকে বিয়ে করতে রাজী আছে—একথা কখন তাকে বলেছিল নন্দিতা ?

তিন পুরুষ আগের আমলের বাড়ি।

যে আমলে বাড়ি বানানোর সময় কর্পোরেশনের আইনকানুন মানবার বালাই ছিল না। তাই দুটো বাড়ির ছাদে ছাদে ছিল ঠেকাঠেকি।

কিন্তু এই ঠেকাঠেকির সূত্রে দুটো পরিবারে কখনো ঠোকাঠুকি হয় নি। ছাদটাকে ওরা উঠোনে পরিণত করেছিল। হরদম যাওয়া আসা ওই ছাদ দিয়ে।

নেহাত 'নাম-কা-ওয়াস্তে' ভাতের হাঁড়িটা যার যার নিজের, নইলে নিত্য দুবেলাই এরা ওদের বাড়িতে চা খাচ্ছে, ওরা এদের বাড়ির জলখাবারে ভাগ বসাচ্ছে। এদের বাড়িতে রান্নার দেরি ঘটলে এদের ছেলে ওদের রান্নাঘরে খেয়ে নিয়ে ইস্কুল যাচ্ছে, ওদের বাড়িতে হঠাৎ জামাই কুটুম এসে গেলে এরা নিজেদের হেঁসেলের মাছ তরকারির ভাগ ধরে দিয়ে আসছে, এমনই প্রেমবন্ধন!

নতুন-ফল, তত্ত্বর মিষ্টি, গঙ্গার ইলিশ, এসব তো ভাগ না করে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না কোনও পক্ষ।

কিন্তু শুধুই কি খাওয়া দাওয়া? সব কিছুতেই বন্ধনডোর। এদের গিন্নী ওদের গিন্নীর সঙ্গে তীর্থে গেছেন, ওদের কর্তা এদের কর্তাদের সঙ্গে চেঞ্জে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অলিখিত আইনে ওই নিয়মই বলবৎ থেকেছে দু' পুরুষ ধরে। দু' বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি সদস্যের হৃদয়ের লেনদেন। কিন্তু সেটা একেবারে নিকট আত্মীয়ের মত। ছেলেতে ছেলেতে ভাই-ভাই, মেয়েতে মেয়েতে সখী-বান্ধবী-বোন। হ্যাঁ, ঠিক এই ভাব, কদাপি কখনো এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছেলেতে মেয়েতে 'ভাব' ঘটেনি।

ঘটেনি বলেই বোধহয় দু' পুরুষ ধরে এমন সুশৃঙ্খলে চলে আসছে। এদের মেয়ের বিয়েতে ওদের ছেলেরা, এবং ওদের মেয়ের বিয়েতে এদের ছেলেরা, বেদম খেটেছে, বেদম খেয়েছে, বর আর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে মেয়েগুলোকে ক্ষেপিয়েছে এই পর্যন্ত, মেয়েগুলোও শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে আগে ছুটেছে ওবাড়ি প্রণাম করতে।

ছেলেরাও পরীক্ষায় পাশ করলে প্রণাম পর্বটা ওবাড়িতেই আগে মিটিয়েছে। নিত্য, অনিত্য, দৈবাৎ, প্রত্যহ, সংসারলীলার যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে দু বাড়ির মিলন-পাত্র কানায় কানায় টলটল করেছে, মিলন-সঙ্গীত মধুর ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে।

পাড়ার মধ্যে এই দু' বাড়ি ভাবের দৃষ্টান্ত।

দু পুরুষের এই মিলন-সূত্রে জট বাধল একটি প্রস্তাবের সূত্র ধরে। যে ধরণের প্রস্তাব এই দু' পুরুষের মধ্যে আসেনি।

কিন্তু এই ধরণের হৃদয়-সমস্যাই কি কখনো এসেছিল ?

ঈশ্বর জানেন এসেছিল কিনা, অথবা সেটা কারুর চোখে পড়েছিল কিনা ! মোট কথা, রায়বাড়ির মেজগিন্নী মাধুরীলতা একদিন দুপুরে সেন-বাড়িতে গা গড়িয়ে পান খেতে খেতে, বিগলিত হাস্যে তাদের ছোটগিন্নী সুধারাণীকে বলে বসল, 'তোর পূরবীর সঙ্গে আমার বিনুর বেশ মানায়।'

শুনে কিন্তু সুধারাণী আদৌ বিগলিত হল না, কারণ মাধুরীলতার বিনু অর্থাৎ বিনায়ক কেবলমাত্র বি. এ. পাস করে সাধারণ একটা চাকরিতে ঢুকেছে, আর সুধারাণীর পূরবী রূপে গুণে বিদ্যেয় বুদ্ধিতে রীতিমত একখানা দামী মেয়ে হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। সুধারাণীরা বিদেশ-ঘুরে-আসা কেষ্টবিষ্টু জামাইয়ের স্বপ্ন লালন করছে মনে মনে।

তাই সুধারাণী মাধুরীর কথাটা শুনতে না পাওয়ার ভান করে, 'বাবাঃ কী গরম !' বলে পাখার স্পীডটা বাড়াতে উঠল।

কিন্তু উঠলেও তো উঠে চলে যাওয়া যায় না। বৃথা খানিকটা এদিক্ ওদিক্ করে আবার এসে বসতে হল সুধারাণীকে।

ছাতে দু'বাড়িরই জামাকাপড় শুকোয়, শুকোয় বড়ি আচার গুল।

চিরকালের নীতি ছিল, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এলে, অথবা নিয়মমাফিক সময়েই তুলতে হলে, দু' পক্ষের যে কেউ একজন গিয়ে উদ্ধার করবে সেগুলো। এখন দেখা যেতে লাগল, একপক্ষ ছাতের পর্ব সেরে যাবার পরও অপর পক্ষের কাপড় কাঁথা ঝড়ে লুটোচ্ছে, বড়ি আচার বৃষ্টিতে ভিজছে।

পূরবী একদিন বলেছিল, 'তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে?'

পূরবীর জেঠী বলল, 'থাম তুই! যা ব্যাভার ওরা করছে!'

প্রথম 'ব্যাভারটা' কে শুরু করেছিল সে-কথা কেউ মনে রাখে না। তবে চালু মেশিন চলতে লাগল জোরদমে। দুটো বাড়ির মধ্যে অহরহ যেন একটা নিরবয়ব লড়াই চলছে।

এরা বলে, 'অহঙ্কারটা দেখ! আমাদের ছেলে যেন ফেল্না—'

ওরা বলে, 'আবদারটি দেখ! আমাদের মেয়ে যেন রাস্তায় পড়ে আছে।'

এরা বলে 'এতদিনে চিনলাম।'

ওরা বলে, 'চিরকালই জানতাম। শুধু—'

রোগটা সংক্রামক। ক্রমশঃ কর্তাদের মধ্যেও ঘোরতর লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। বাজার থেকে ফিরে রায়েদের বড়কর্তা মন্তব্য করেন, 'কাঁচা পয়সার গরমে চক্ষুলজ্জাও হারিয়েছে। বড় গলদা চিংড়ি আমি দর করছি, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবগুলো নিয়ে গেল! ছিঃ! ছিঃ!'

সেনবাড়ির কর্তা বাজার থেকে ফিরে বলেন, 'উঃ, কঞ্জুস বটে একখানা! এই তো দেখছো বাজারে কী ভাল ভাল মাছ! কিনে নিয়ে গেলেন কি না বরফ-দেওয়া ইলিশ আর পচা ট্যাংরা!'

কেউ কারুর নামোল্লেখ করে না, তবু সবাই বুঝে নেয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে বা কাহারা।

অতএব ছোট মেয়েছেলেরাও খেলে এসে বলে, 'জানো মা, ওদের শচীনটা এমন পাজী—'···'জানো মা, বুলিটা এমন অসভ্য—'

যেন হঠাৎ কোন গুহার অন্ধকার থেকে একটা দাঁতালো জানোয়ার তার বড় বড় লোমশ পা ফেলে বেরিয়ে পড়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

কিন্তু এ জানোয়ার তো বিশেষ একটা লক্ষ্যে পৌঁছে থামতে জানে না। এ শুধু লম্বা পা বাড়িয়ে এগোতেই জানে। পায়ের চাপে তচনচ করে দেয় চিরকালের সভ্যতা ভব্যতা রুচি সংযম। তচনচ করে দেয় ন্যায় নীতি চক্ষুলজ্জা।

কাজেই একদিন এ-বাড়ি ও-বাড়িতে মুখোমুখি কোঁদল হয়ে গেল। আর দেখা গেল জিভের বিষের সঞ্চয়ে কেউ খাটো নয়। আবার কারণটা হাস্যকর। এ-বাড়ির হাঁসের ডিমের খোলা কাকে মুখে করে নিয়ে গিয়ে ও-বাড়ির কোনো বিশুদ্ধ বস্তুর ওপর নিক্ষেপ করেছিল।

এইমাত্র।

ও-বাড়ি বলল, 'কাক না হাতী! নিজের চক্ষে দেখেছি, ইচ্ছে করে ছুঁড়ে মারা হয়েছে।'

এ-বাড়ি বলল, 'এতবড় মিথ্যে দৃশ্য যে স্বচক্ষে দেখতে পায়, নির্ঘাৎ তার চোখে পোকা পড়েছে।'

অতঃপর ইত্যাদি।

অর্থাৎ ও-বাড়ী বলল, 'বাড়ি বিক্রি করে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এত উৎপাত অসহ্য!'

ও-বাড়ি একগাড়ি ইঁট আনিয়ে ছাতের মাঝখানে হাত চারেক উঁচু একটা পাঁচিল তুলে দিল।

কিন্তু এই ঘোরতর কাণ্ডের মূল নায়ক নায়িকা? পূরবী আর বিনায়ক?

তারা কোথায়?

তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

তারা মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করল কবে ?

কিন্তু মঞ্চে এসে দাঁড়ালই বা কবে তারা ?

না দাঁড়ায় নি।

প্রথম যখন অপমানে দিশেহারা পাত্রপক্ষ অহঙ্কারী পাত্রীপক্ষের সমালোচনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, বিনায়ক বলেছিল, 'কেন মিছিমিছি এই পাগলামি করতে গেলে মা ? তোমার ছেলের বাজারদরটা তো দেখলে ?'

তারপরই হঠাৎ অফিসের কাজে চারমাসের জন্যে এলাহাবাদ না কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।

আর পূরবী ? পূরবী বাড়ির লোকের অসভ্যতা দেখে অস্থির হয়ে একদিন জোর করে টাটায় চলে গিয়েছিল মামার বাড়ি।

চার মাস পরে ফিরে বিনায়ক দেখল মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আর পূরবী কিছুদিন পরে এসে দেখলো বাড়ির ছাতের মাঝখানে পাঁচিল !

আর দুজনেই দেখল দু' বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। পাত্র-পাত্রী যোগাড় হয় নি। কিন্তু 'নাকের সামনে' দেখিয়ে দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে মার্কেটিংটা শুরু হয়ে গেছে।

এ বলল, 'চমৎকার' !

ও বলল, 'ফাইন্' !

তারপর একদিন পূরবী এসে বিনায়কের কাছে হানা দিল।

ছাতেই পাঁচিল পড়েছে, পৃথিবীটা তো কাঁটাতারের বেড়ায় আটকা পড়ে নি। দেখা করলো বাইরে।

পূরবী বলল, 'তা'হলে এই অসহ্য অবস্থা চলতে থাকবে ?'

বিনায়ক বলল, 'অবস্থাটা অসহ্য বটে, কিন্তু প্রতিকার তো খুঁজে পাচ্ছি না—'

'তা পাবে কেন ? ভেতরে কিছু থাকলে তো ? নইলে আর—'

বিনায়ক ওর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'কী নইলে ?'

পূরবী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'থাক্ থাক্, আর হাত ধরতে হবে না। কাপুরুষের রাজা!'

'তা রিজেক্ট মালের আর পৌরুষ জাগবে কিসের জোরে?'

'থামো! কব্জির জোর বলেও একটা জিনিস আছে জগতে। তোমার মত লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যুর মুখ দেখাও পাপ। কিন্তু কি করবো, ছ'ছুটো সংসারের এই অধঃপতন তো চোখে দেখতে পারছি না আর। এখন বিয়েটাই শেষ ভরসা।'

'বিয়ে!'

বিনায়ক প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'কে দিচ্ছে?'

'দেওয়াতে হবে—' পূরবী দৃঢ়স্বরে বলে, 'উপায় বাৎলাও।'

বিনায়ক মৃদু হেসে বলে, 'বিয়েটার উপায় বাৎলাতে অবশ্য পারি। মানে যদি রাজী থাকো,—পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে—'

'থামো থামো, ছোটলোক কোথাকার!' পূরবী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কী ভাবছ বল দেখি, তোমার জন্যে একেবারে মরে যাচ্ছি? মোটেও ভেবো না। বলেছি তো তোমার মত কাওয়ার্ডের মুখ দেখাও পাপ। আমি শুধু ভাঙা ব্রীজটা মেরামত করতে চাই—'

বিনায়ক আস্তে বলে, 'যেখানে ভালবাসাটা ছায়াবাজি মাত্র, সম্পর্কটা হাস্যকর রকমের মূল্যহীন, সেখানে আর এই মেরামতের চেষ্টা কেন? কি হবে এই মিথ্যাকে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টায়?'

পূরবী আর ঝঙ্কার দেয় না।

আস্তে আর দৃঢ়স্বরে বলে, 'জীবনটাও তো শুনি ছায়াবাজি, তবু তাকে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি আছে? আর কোন্‌টা মিথ্যে কোন্‌টা সত্যি তাই কি জোর করে বলতে পারো তুমি? এখনকার এই নির্লজ্জ ক্ষ্যাপামিটাকেই পরম সত্যি বলে ধরে নিতে হবে তার কি মানে আছে? হয়তো সামান্য একটা ঘটনার সূত্র ধরেই বাতাসের মোড় ঘুরে যেতে পারে। হয়তো—'

বিনায়ক বলে, 'কিন্তু কী সেই অসামান্য সামান্য?'

পূরবী ওকে কড়া একটা চিমটি কেটে বলে, 'হাতে যদি একখানা ধারালো ছুরি থাকতো তো তোমায় কেটে কুচি কুচি করতাম। নেই, তাই বেঁচে গেলে। গল্প বানাতে পারবে না একটা? গুণ্ডা ধরতে আসছিল আমায়, তুমি হীরো হয়ে গুণ্ডাকে মেরে আমাকে উদ্ধার করলে। অথবা মনের ঘেন্নায় গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম আমি, তুমি লাফিয়ে জলে পড়ে সাঁতরে তুলে আনলে! কিচ্ছু মাথায় আসছে না? দেখো, এমনি কিছু একটায় এক মিনিটে হাওয়া বদলে যাবে। সত্যবিপদমুক্ত এবাড়ি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে—'

বিনায়ক হেসে বলে, 'গুণ্ডার গল্পে অনেক ঝামেলা। তবে শেষেরটা মন্দ না। অবশ্য তাতে এই সন্ধ্যাবেলা গায়ের জামা কাপড়গুলো ভিজোতে হবে। শুকনো পোশাকে গল্পটা মানাবে না।'

পূরবী বলে, 'হাসছো তুমি? কিন্তু মনে জেনো আমি সিরিয়াসলি বলছি। এমনি একটা কিছু করতেই হবে—না করে উপায় নেই।'

বিনায়ক আস্তে বলে, 'পূরবী, কত ভুলই না করি আমরা! সেদিন যদি তোমাকে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করতাম! তা না করে ভাবলাম তুমিও আমায় ঘেন্না কর। তাই না—'

পূরবী তীব্রস্বরে বলে, 'সেটা ভুল নাকি? করিই তো ঘেন্না। শুধু নিজের জন্যে হলে তোমার মতন ভীরু কাপুরুষ লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধুর কাছে মান খোয়াতে আসতাম ভেবেছ? গলায় দিতে দড়ি জুটতো না? কি করবো, ছুটো সংসারকে তো ডুবতে দিতে পারি না। তুচ্ছ একটু আত্ম-অহমিকার দায়ে চিরকালের সম্পর্কটা ঘুচবে?'

'কিন্তু পূরবী!' বিনায়ক দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে, 'এতর পর সম্পর্কটা আবার জুড়বে বলেই কি বিশ্বাস তোমার?'

পূরবী দৃঢ়স্বরে বলে, 'নিশ্চয়! মানুষ কি না পারে? সে যেমন ভাঙতেও ওস্তাদ, তেমনি গড়তেও পটু।'

সমস্ত কুলি বস্তিতে একটা চাপা উত্তেজনার ঝড় বইছিল।···সেই তখন থেকে মেয়েরা এক জায়গায়, আর পুরুষেরা এক জায়গায় গোল হয়ে ঘিরে বসে জটলা করছিল, এবং তাদের আলোচনার ভাষা মধ্যে মধ্যেই অধিক তপ্ত হয়ে উঠছিল।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে উঠেছে, আলোও পর্যাপ্ত নয়, তাই ওদের কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবে দেখা গেলে দেখা যেত প্রত্যেকের মুখেই একটা উগ্র সংকল্পের আভাস।

যেন এই মুহূর্তে জান কবুল করে, ভয়ানক একটা কিছু করতে বেরিয়ে যেতে চায় ওরা, যে যার হাতিয়ার হাতে নিয়ে। লাঠি-সোঁটা গাঁইতি শাবল যার যা আছে। শুধু কিছুর একটা অপেক্ষা করছে।···

আজ ওদের মেয়েরা এই উষ্ণ জটলার সুযোগ নিয়ে রান্না করেনি, তাই ক্ষুধার্ত জঠর ওদের ভিতরের উষ্ণতা আর উত্তেজনাকে ক্রমশঃই মাত্রার বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রোধের উত্তেজনাটা পাত্র বদলে এখন যেন শরতের ওপর গিয়েই পড়ছে।

হলো কী শরতের ?

সে কী আর আসবে না ?

মরেই গেছে ?

মেয়েরা বলছে, নির্ঘাৎ শরৎ বাইরে থেকেই এ ঘটনা শুনে মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হয়ে গেছে !

কিন্তু মেয়েদের কথা পুরুষদের কানে আসছে না। তাই পুরুষেরা অধীর হয়ে উঠছে।···শরৎ এসে না পড়া পর্যন্ত শরতের বোনের চরম অবমাননার প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়া যাচ্ছে না।···অথচ প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তগুলি অপচয় হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঝাঁকড়াচুল বংশী মাথাটা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ও হবে না। শালার শরতের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না। শালা নিয্যস রেলে কাটা পড়েছে!'

এই উষ্ণ পরিমণ্ডলে এমন কেউ উপস্থিত ছিল না, যে শরৎ সম্পর্কে এই অলক্ষণে কথায় ষাট্ ষাট্ করে উঠবে।...বরং সকলেই ওইভাবে আক্রোশ মেটাবার জন্যেই মুখ খুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ করে গেল। ঠাহর করে দেখল, সামনের মাঠে যাকে দেখা যাচ্ছে সে মানুষটা কে, নিশ্চিত হলো।

আর তার পরই এতক্ষণের চাপা ঝড়টা যেন ভেঙে আছড়ে পড়লো!

ঝড়টা শুধু এতগুলো লোকের মুখনিঃসৃত একটা অভিযোগ। একই অভিযোগ।

কোথায় ছিল শরৎ সারাটা দিন।

লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে এগিয়ে এসে শরৎ বিমূঢ় প্রশ্ন করে, 'হয়েছে কি?'

হয়েছে কী?

হয়নিটা কী?

যার বড়ো কিছু হবার নেই তাই হয়েছে। আর হয়েছে শরতেরই ঘরে।

শরৎ এবার চটে ওঠে। বলে, 'সকলে মিলে একসঙ্গে চেঁচালে কাজ হবে কিছু? ঢুকবে আমার মাথায়? একজন স্পষ্ট করে বল, শুনি আমার কোন্ সর্বনাশটা হয়ে গেল।'

এবার সব লোকগুলো একটু গুম হলো। আর সেই ঝাঁকড়াচুল বংশী এসে বলে উঠলো, 'টুনিকে ধরে নিয়ে গেছে!'

টুনিকে ধরে নিয়ে গেছে!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি দুলে উঠলো শরতের চোখের সামনে? বোকার মত বলল, 'ধরে নিয়ে গেছে? কে ধরে নিয়ে গেছে? ধরে নিয়ে গেছে কেন?'

বংশী খিঁচিয়ে উঠলো 'বোকার মত কথা বলিসনে শরৎ!' বংশী ঝেঁজে ওঠে, 'মেয়েছেলেকে ধরে নিয়ে যায় কেন জানিস না? আর কারা ধরে তাও জানিস না? ধরে নিয়ে গেছে সাহেবের লোক।…টিপ্‌কলে জল নিতে গিয়েছিল, ভরা ভরা বিকেল, সন্ধ্যে হয় হয়, টিপ্‌কলে আর কেউ ছিল না তখন, সাহেবের গাড়ি যাচ্ছিল উই ওখান দিয়ে, ঝপ্‌ করে থামলো, আর দুটো লোক নেমে এসে টুনিকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললো।…কলসীটা পড়ে রইল টিপ্‌কলের মুখে।'

শরৎ এবার আর বোকা রইল না।

শরতের মাথা থেকে পা অবধি আগুন ধরে গেছে।…ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠল শরৎ, 'তা যারা দেখলো, তারা কি মরে গিছলো?'

বংশী তিক্তস্বরে বলে, 'শুধু তারা কেন, মরে তো গেছে সবাই। এই বস্তির আমরা কেউ জ্যান্ত আছি নাকি? পচা মড়ারা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সাহেবদের জুতো মুছবো বলে, আর সাহেবদের কলে তিন শিফ্‌টে ডিউটি দেব বলে।'

'তোর প্যাঁচালে কথা রাখ। বলি দেখলো কে? সেখানে ছিল কে?'

'ছিল?'…

বংশী হেসে ওঠে।

'ছিল তোর ছেলে শম্ভু। পিসির কোলে চড়ে গিয়েছিল, ফেরার সময় পিসি ঘড়া বইবে বলে হেঁটে আসবার "কড়ার" ছিল। টুনিকে ধরে নিয়ে যাবার পর কাঁদতে কাঁদতে এসে খবরটা দিল সে-ই।'

শরতের হাতে একটা লাঠি ছিল।

শরৎ হঠাৎ সেই লাঠিটাকে নিয়ে মাথার ওপর শূন্যে একটা পাক খাইয়ে রূঢ় রুক্ষ গলায় বলে উঠলো, 'আমি ছিলাম না, খড়্গপুর গেছলাম, তা' তোরা বসে বসে গুলতান করছিস কেন? সবাই মিলে এক-একখানা লাঠি নিয়ে গিয়ে চড়াও হতে পারিস নি, সাহেবের বাংলোয়? মার দুধ খাস নি, বোন নেই তোদের ঘরে?'

হঠাৎ 'রে-রে' করে একটা রব তুলে লোকগুলো ঝাড়া দিয়ে পড়লো। যে উত্তেজনার ঝড় বইছিল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, আর সময়ের স্পর্শে একটু স্তিমিত হয়ে আসছিল, সেটা আবার উদ্দাম হয়ে

কে একজন গর্জে বলে উঠলো, 'কোন্ কালে সাহেবের বাংলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেত রে শরৎ, শুধু তোর জন্যে! তুই না এলে—'

শরৎ এদের এই শৌর্য-বীর্যে বিশেষ মুগ্ধ হলো না। লাঠিটা ঠুকে বললো, 'আমার জন্যে কি! আমি যদি না আসতাম, আমি যদি রেলে কাটা পড়ে থাকতাম, তোরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবি না? মা-বোনের ইজ্জত রাখবি না?...চল দেখি কে যাবি আমার সঙ্গে! কার কি হিম্মৎ আছে দেখি!'

হিম্মৎ! গর্জে ওঠে লোকগুলো।

লাঠি বাগিয়েই বসে আছে সবাই। দরকার হলে বাংলোয় আগুন দেবে বলে, তেল মশাল গুছিয়ে রেখেছে।

এই দেহাতি বাঙালী শ্রমিককুল স্বাস্থ্যে শক্তিতে কেউই 'প্রতাপ' 'প্রতাপাদিত্য' নয়, কিন্তু ওদের ঘরের মেয়ের ইজ্জতের প্রশ্নে ওদের রক্তে আগুন ধরে গেছে।

এতক্ষণের প্রতীক্ষায় যে রক্ত ঝিমিয়ে আসছিল, শরতের ওই 'হিম্মতে'র আহ্বানে তা' আবার জ্বলে ওঠে। ঝপ করে মশালে আগুন ধরায় ওরা। বলে, 'চল, শালাকে শেষ করে আসি।'

সেই গভীর রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত মশাল হাতে ক্ষিপ্ত জনতার ছবিটা, যেন একটা ঐতিহাসিক বর্বরতার নাটকীয় দৃশ্যের মত দেখায়। দূরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে অরণ্যে আগুন ধরেছে।

শরৎ এই প্রস্তুতির দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎই একটা সংসারী মানুষের মত কথা বলে বসলো, 'শম্ভু কোথায়?'

এই দুরন্ত বর্বর উল্লাসের মধ্যে মাতৃহীন শিশুটার কথা মনে পড়লো শরতের?

তা মনে পড়লো হয়তো হঠাৎ টুনির দীর্ঘ অনুপস্থিতি স্মরণ করেই। টুনির কাছেই তো থাকে ছেলেটা চব্বিশ ঘণ্টা।···আঠারো উনিশ বছরের টুনির যে এখনো বিয়ে হয়নি, সে ওই ছেলেটার জন্যেই। টুনি বরের ঘরে চলে গেলে ছেলেটার কী গতি হবে!

এক উপায় ছেলেটাকেও নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সম্ভাবিত বর বংশী তাতে রাজী নয়। সে বলে, 'বিয়ে করলে একটা মেয়েমানুষকেই করবো, মা যশোদাকে নয়।'

অথচ এই পর্যন্ত বিয়ে করছেও না। একভাবেই দিন চলছে, এবং ওপরওলার 'দাব'হীন টুনি ক্রমশই মুখরা প্রখরা আর পুষ্টাঙ্গী হয়ে উঠছে!

ওর ওই দেহসৌন্দর্য নিয়ে বাইরের টিউবওয়েলে স্নান করা যে উচিত হতো না, একথা এখানের কেউ জানে না! সবাই যায় ওখানে। শুধু মেয়েরাই যায়, জল নেয়, স্নান করে। আব্রু রক্ষার পক্ষে ওইটাই যথেষ্ট বলে মনে করে ওরা।···কারখানার নতুন সাহেব বিশ্বাস সাহেব যে এত বড় অবিশ্বাসের কাজ করে বসবেন, তা কে জানতো!

কিন্তু ধরে যখন নিয়ে গিয়েছিল, চেঁচায় নি টুনি?

সেই প্রশ্নটা ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে একটা ভয় লজ্জাও ছিল। কে জানে চেঁচিয়েছে কি না। হয়তো চেঁচিয়েছে, কেউ কান করেনি।

এ বস্তির মেয়েরা তো যখন তখনই পরিত্রাহী চেঁচায়। ছেলে শাসন করতে চেঁচায়, ঝগড়া করে চেঁচায়। চিল-চেঁচানি সেই চেঁচানোতে কে কত কান দিচ্ছে?

ঘটনার একমাত্র সাক্ষী চার বছরের শম্ভু! ও বলেছিল, 'পিসিকে ওরা ধরে নিয়ে গাড়িতে পুরে বোঁ করে চলে গেল!'

'পিসি চেঁচাল না?'

শম্ভু বলেছিল, 'হ্যাঁ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল তো—"শম্ভুকে নিই, শম্ভুকে নিই", তা ওরা নিলই না! পিসি গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বললো, "শম্ভু তুই ঘরে যা, আমি আসছি"।'

ব্যাপারটা গোলমেলে।

তবু বিজ্ঞরা এর থেকে সত্য ঘটনা আবিষ্কার করে নিয়েছিল।

ভুলিয়ে কিছু বলে-টলে নিয়ে গেছে। হয়তো বলেছে—'তোর দাদার বিপদ হয়েছে, দেখাব চল—'

এরকম দৃষ্টান্তও তাদের জানা আছে। ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর এই পাঁচ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। অর্থাৎ সর্বনাশ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।...যাক, বিশ্বাস সাহেবকে ছাতু করে ফেলার পক্ষে সেটা বাধা নয়। বরং অনুকূলই।

ক্ষতি যখন চূড়ান্তই হয়েছে নিশ্চিত, তখন প্রতিশোধটাও চূড়ান্ত হোক।

শরতের প্রশ্নে কে একজন বলে, 'শম্ভুকে চরণের মা নিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।'

তবে আর কি, ব্যস !

শরৎ প্রবল একটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। আর সকলের কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি ওঠে। ...তারপর জ্বলন্ত অরণ্য এগোতে থাকে শয়তানের আস্তানার দিকে !

*

বিশ্বাস সাহেবের বাসা এই শ্রমিক বস্তি থেকে অনেকটা দূর। শহরের প্রায় বাইরে কয়েক একর জমি জুড়ে বাংলোর বাগান।

তার মাঝখানে ছবির মত সুন্দর বাংলো—বাঘের মত দুটো কুকুরের প্রহরায় নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলে। ...আগের সাহেবের কুকুর ছিল না। আগের সাহেব নাকি দেবতার মত ছিলেন।

কিন্তু দেবতা দানব দুই নিয়েই তো সৃষ্টির খেলা !

বিজ্ঞজনেরা ভুল বলে নি।

ভুলিয়েই নিয়ে এসেছিল ওরা টুনিকে। বিশ্বাস সাহেবের

লোকেরা। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। বিশ্বাস সাহেব বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে প্রায় রোজই স্নাননিরত টুনিকে অবলোকন করেন। এ ওরাও অবলোকন করেছে। ওঁর চাকর আর ড্রাইভার।

তাই বিশ্বাস সাহেব যখন বললেন, 'দেখ, তোমাদের মেমসাহেব শীগ্‌গির আসবেন। একটা মেড্ সার্ভেন্টের দরকার, কুলি বস্তিতে একবার খোঁজ নিও দিকি। নেহাত বুড়ি-ফুড়ি না হয়, মেমসাহেব একটা বেশ কমবয়সী হেল্‌দি মেয়েছেলের সন্ধান করতে বলেছেন।'

তখনি ওরা মুচকে হেসেছে।

অবশ্য মনে মনে।

সাহেবের বেড়াবার জায়গার পরিবর্তন নেই। তাই ক'দিন পরে আবার ওই টিউবওয়েলের ধারে টুনির বৈকালিক স্নান-দৃশ্য।

সাহেব বলে ওঠেন, 'এই থামাতো থামাতো, ওই মেয়েটাকে একবার ডেকে জিগেস করে দেখতো!'

তখন ওরা মনে মনে প্রমাদ গণলেও নেমে পড়েছিল।

অবশ্য বলেছিল, 'ওরা বড় বোকা সাহেব, ভুলিয়ে অন্য কথা বলে ডাকতে হবে। তবে মাইনের বহর শুনে আর বাড়িঘর দেখে নির্ঘাৎ হামড়ে পড়বে।'

ওরা চিনতো। শরতের বোন টুনিকে চেনে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই। নেমে গিয়ে বলেছিল, 'তোর দাদার খবর জানিস?'

টুনু ভিজে কাপড়টা গায়ে টেনে ভ্রূকুটি করে বলেছিল, 'জানবো না কেন, দাদা সকালবেলা খড়গ্‌পুর গেছে, রাত্রে আসবে।'

ওরা বলেছিল, 'তবে তো সবই জানিস! তোর দাদা রেল অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে কারখানার হাসপাতালে রয়েছে, সাহেব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, দেখতে যাবি তো চল।'

টুনি যতই প্রখর হোক, বুঝতে পারেনি। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছিল, 'ভিজে কাপড়টা বদলে আসি—'

ওরা বলেছিল, 'ওরে আমার কে রে! ততক্ষণ সাহেব দাঁড়িয়ে থাকবে? সাহেব বললেন, ওর বাড়িতে খবর দাও, তা আমরাই বললাম, 'বাড়িতে আর আছে কে সাহেব, থাকবার মধ্যে তো আইবুড়ো বোনটা আর মা মরা ছেলেটা! ওই তো ওইখানে রয়েছে দুজনেই!' তখন সাহেব বললেন, 'বলে দেখ যদি দেখতে যেতে চায়।'

টুনি আর দ্বিরুক্তি করেনি। সেই ভিজে কাপড়েই জড়সড় হয়ে গাড়িতে উঠে বসতে গিয়েছিল শম্ভুর হাত ধরে।

'এতটুকু ছেলে হাসপাতালে যাবে কি? ভয় পাবে—' বলে ওরা শম্ভুকে পিসির হস্তচ্যুত করে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

তার পরের ইতিহাস বাংলোয়।

পথে যদি টুনি চেঁচিয়েও থাকে, জনশূন্য তেপান্তরের পথে, সে চেঁচানি শুধু বাতাস কেটে আকাশেই পৌঁছেছে, মানুষের কানে পৌঁছয়নি।···

কিন্তু আকাশের তো কান নেই!

বিশ্বাস সাহেব প্রথমে চাকরির কথাই বলেছিলেন, মাইনেটা অবিশ্বাস্য, সুখ-সুবিধের শেষ নেই!

কিন্তু হাসপাতালের নাম করে ভুলিয়ে মোটা মাইনের চাকরির অফারে আস্থা স্থাপন করবে, এত বোকা নয় টুনি।

ও তীব্র প্রশ্ন করেছিল, 'মিথ্যা কথা বলে নিয়ে এলে কেন?'

সাহেব বেমালুম সব দোষ ওঁর ভৃত্যদের ওপর চাপিয়েছিলেন। 'এই দেখ তোদের দেশের লোকের বুদ্ধি, ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে! তোকে ডাকতে পাঠালাম, তুই উঠে এলি, আমি বলি কাজ করতেই এলি। ভুলিয়ে এনেছে কেমন করে জানবো বল?··· হারামজাদারা দাঁত বার করে হাসছিস যে? যা সামনে থেকে বেরো! মজা করবার আর জায়গা পাসনি?'

অতঃপর চাকরি নেবার জন্যে সাধ্যসাধনা করেছিলেন। কিন্তু টুনি তো শিশু নয়।

যখন টুনি ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়েছিল, তখন স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বাস সাহেবের।

বলেছিলেন, 'ওঃ, রাস্তার ভিখিরি, তার আবার এত তেজ, কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।'

টুনি তীব্র গলায় বলেছিল, 'খাওয়া কুকুর দিয়ে। তোর হাতে পড়ার থেকে সে অনেক ভাল!'

এ অপমানে ক্ষিপ্ত সাহেব হাণ্টার এনেছিলেন, এবং তখনই টুনি মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'আমায় মেরে ফেল্ হারামজাদা, ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজের প্রাণের জন্যে সাবধান থাকিস। বস্তিতে তিনশো কুকুর বুঝলি? জানিস ঘরের মেয়ের ইজ্জতের দায়ে ছুটে আসবে তারা? তখন তোর ওই দ্বটোতে তোকে রক্ষা করতে পারবে না।'

সাহেব বলেছিল 'ফুঃ! ওই কুলিগুলো! তাদের জানিয়ে দেব, বস্তিতে হঠাৎ আগুনও লাগে।'

ঠিক এই সময় দূর থেকে একটা সোরগোল শুনতে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত আরক্ত করে মশালের আগুন!

সর্বনাশ করেছে!

বিশ্বাস সাহেব ওই প্রচণ্ড আলোতেও চোখে অন্ধকার দেখেন।

আর ভীরু চরিত্রহীনের ভূমিকায় যা সম্ভব তাই করে বসেন। টুনির পা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন, 'রক্ষে কর বাবা! তুই-ই পারবি রক্ষে করতে। নইলে যা ক্ষেপে আসছে ওরা!···হেই দেখ্, তোর গায়ে হাত দিইনি, সে-কথা বলবি!'

টুনি একটা তিক্ত হাসি হেসে বলে, 'বললে বিশ্বাস করবে ওরা?'

'বলবি আমি তোর তেজ দেখে মেয়ে বলেছি।'

টুনি সংক্ষেপে বলে, 'ওরা পাগল নয়।'

'দেখ বাবা, আজ বাদে কাল মেম সাহেব আসবার কথা, তার মুখটা ভাব! মেয়েছেলে তুই, ভেবে দেখ আমাকে যদি ওরা শেষ করে ফেলে—'

টুনি পাথর মুখে বলল, 'শেষ করতেই তো এসেছে। আবার 'যদি'র কি আছে?'

আর কথা শোনা গেল না।

উন্মত্ত কোলাহল বাড়ি ঘেরাও করেছে?

কিন্তু টুনি এ কী করলো?

টুনি কেন বেরিয়ে এল বাংলো থেকে? কেন ওদের নিবৃত্ত করলো?

হ্যাঁ, ওদের নিবৃত্ত করলো টুনি।

বললো, 'এ কী! তোমরা কি ক্ষ্যাপা হয়ে গেছ? সাহেব কি আমায় ধরে এনেছে? সাহেবের বাবার সাধ্যি আছে টুনিকে ধ'রে আনতে পারে? আমি ইচ্ছে করে এসেছি।'

'ইচ্ছে করে এসেছিস!'

'ইচ্ছে করে এসেছিস তুই?'

'হ্যাঁ, তার হয়েছে কি? বাপের তুল্যি সাহেব, একবার এলেই আমায় খেয়ে ফেলবে না কি? মেমসাহেব আসবেন, তাই একটা মেয়েছেলের কথা বলেছিলেন সাহেব, আমি তাই ঘরবাড়ি দেখতে এসেছিলাম। বলি, শম্ভুকে নিয়ে যদি থাকা সম্ভব হয়! নাও চলো, বাবা, একেই বলে মুখ্যু গোঁয়ার! তিলকে তাল।'

ওরা মাথা হেঁট করলো।

মশালের আলো নিভিয়ে দিল।

শরৎ শাসিয়ে গেল, 'আচ্ছা, সাহেববাড়িতে ছাড়া কাপড়ই কাচিস তবে, বাড়ি আর ফিরিসনে।'

টুনি বাংলো থেকে নেমে এসে হনহন করে ওদের সঙ্গেই চলতে চলতে বলেছিল, 'বাড়িতে না ফিরতে দাও, মরণের ফন্দীর অভাব নেই

জগতে। তাই মরবো। মরবার আগে বলে যাবো, 'ভগবান দেখো, মা নেই, বাপ নেই, তাই বিনিদোষে মরতে হলো আমায়!'

শরৎ ঝিমিয়ে গেল।

বললো, 'ওই শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে দেখে খুব কথা শিখেছিস লক্ষ্মীছাড়ি!'

ভিড়ের মধ্যে বংশী কাছাকাছি এসে ঠেকেছিল। বলল, 'মিথ্যে কথা বলাল কেন?' টুকরো টুকরো করে ফেলতাম হারামজাদাকে!'

টুনি বললো, 'হারামজাদা যে আবার ওর পরিবারের কথা তুললো। যদি মেরে ফেলো তার কি হবে।' সাহেবের সুর নকল করে টুনি।

'বিয়ে করতে পারবো তোকে?'

পারবি না? করে সগ্‌গে যাবি। তিন পুরুষে তরে যাবি।'

পৌরুষ

রোগা একটুখানি খাটো-খয়া বামনাকৃতি গড়ন।

শুকনো শুকনো মুখ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, হাড়ের ওপর চামড়াঢাকা দেহ। চোখের চাউনিতে বিশ্বের ক্লান্তি। 'যৌবন' শব্দটাকে এ চেহারার ধারে কাছে আনা যায় না। আনতে গেলে হাসি পায়। তাই ও যখন বলেছিল, 'কাজ যখন মূলেই জুটছে না, তখন কাজের ভালমন্দ বিচার করলে চলবে কেন কাকিমা ? চাকরের কাজই করবো। গলার পৈতেটা না হয় খুলে রেখে দেব। বামুনের গরব ছাড়তে হবে। এই জোয়ান বয়সে কতকাল আর মামার গলায় বসে খাবো ?'

তখন প্রায় হেসে ফেলেছিলাম ওই জোয়ান বয়েস কথাটা শুনে। কষ্টে সেই হাসি চেপে বলেছিলাম, 'বয়েস কত ?' আর উত্তর শুনে স্পষ্টই হেসে উঠেছিলাম, 'পঁচিশ ? দুইয়ের পিঠে পাঁচ ? উল্টোপাল্টা হয়ে যায়নি তো ? পাঁচের পিঠে দুই নয় তো ?'

বাস্তবিক বলতে ও যদি বয়েস বাহান্ন বলতো, হয়তো অবিশ্বাস করতাম না। ও কিন্তু আমার হাসিতে প্রথমটা চমকে উঠল।

তারপর মানেটা বুঝতে পেরে মাথা হেঁট করে বলেছিল, 'না খেতে পেয়ে পেয়ে শরীরের এই হাল হয়েছে কাকিমা। মামাও তো ছাঁপোষা—'

আমি ওর সত্যি কাকিমা হলে এ কথায় আমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। দেশের বাড়ির পড়শীত্বের সুযোগ নিয়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান এ বাড়ির কর্তাকে কাকাবাবু ও আমাকে কাকিমা বলছে এসে অবধি। এবং একটি চাকরি জুটিয়ে দেবার জন্যে নিতান্ত নির্বেদ প্রকাশ করছে। মনে হচ্ছে তার ধারণা ছিল লক্ষ শাখা কলিকাতা বৃক্ষে চাকরি রূপ পাকা ফল অজস্র বিলম্বিত, একবার হাত বাড়াবার ওয়াস্তা। যারা গোছা গোছা বই লেখে, তারা যে অন্ততপক্ষে

ছাপাখানাতেও একটা কাজ দিতে পারে না, এটা তার কাছে শুধু দুর্বোধ্যই নয়, সন্দেহেরও।

কিন্তু কি করা ?

বই লেখকদের ক্ষমতা যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সে কথা বই লেখকরাই জানে। নইলে ওর চাকরি জুটিয়ে দেওয়াটা তো অনেকখানি আমার নিজেরও স্বার্থের ব্যাপার।

দেশের সেই পড়শীত্বের সুযোগে ছোকরা প্রায় মাসখানেক এসে আড্ডা গেড়েছে, চাকরি না হলে যে দেশে ফিরে যাবে, এ ভরসা দেখছি না।

অতএব ওর চাকরির চেষ্টায় আমারও চেষ্টার ক্রুটি ছিল না। কিন্তু কোথায় চাকরি ? দুঃখী বামুনের ঘরের মেয়ে পুরুষের যেটা প্রথমতম কাজ রান্না, সেটাতেই নিতাই একেবারে মা-জননী। দিদিমার ঘরে মানুষ, মামীরা আছে, রান্নাঘরের ভিতরের দৃশ্য কখনো তাকিয়ে দেখেনি।

তা হলে ?

তা হলে এই সিদ্ধান্ত।

'পৈতেটা না হয় খুলেই রাখবো, বলবো শুদ্দুরের ছেলে। চাকরের কাজই সই ! তা বলে তো এই জোয়ান বয়সে—'

হ্যাঁ, চাকরের কাজই একটা হঠাৎ হাতে এসেছিল। টেলিফোনযোগে এক বান্ধবী-কন্যা কাতর আর্তনাদ করছিলেন, 'একটা চাকর দিতে পারেন মাসিমা ? ঝি নেই চাকর নেই, জীবন মহানিশা হয়ে

নিতাই আমার উত্তরগুলো শুনতে পাচ্ছিল, আমি রিসিভারটা নামাতেই বলে উঠল, 'ঠিক আছে কাকিমা, আমায় পাঠিয়ে দিন।'

আমি ইতস্ততঃ করি, 'দেখ, নেহাতই চাকরের দরকার ওদের। জুতো ঝাড়তেও বলবে, ছাড়া জামাকাপড়ও কাচতে বলবে—'

নিতাই মাথা নিচু করে বলে, 'সে তো বলবেই কাকিমা। জেনে বুঝেই স্বীকার পাচ্ছি।'

'দেখ বাপু, শেষকালে আবার মান-অপমানের কথা তুলে মন খারাপ করবে না তো ?'

দেখলাম নিতাইয়ের দৃঢ়তা আছে। দৃঢ়স্বরেই বলল, 'নাঃ কাকিমা, স্বীকার যখন পাচ্ছি, জানি এঁটো পাতও তুলতে হবে, জুতোও ঝাড়তে হবে। তাই করবো। পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চাইতে সে কম অপমানের।'

সত্যি বলতে কি, বাঁচলাম।

বান্ধবী-কন্যার অনুরোধ রাখতে পারার সুখে এবং অকারণ একটা লোককে বসিয়ে খাওয়ানোর দায় থেকে মুক্ত হয়ে। নিজের সামান্যতম দুটি জামাকাপড় বেঁধে নিয়ে কাঁকুলিয়ার দিকে রওনা হ'ল নিতাই আমার দেওয়া ঠিকানার কাগজটুকু হাতে নিয়ে।

কিছুক্ষণ বাদেই বান্ধবী-কন্যার কলহাস্যমুখরিত ধন্যবাদ ভেসে এল টেলিফোনের তার বেয়ে, 'মাসিমা, কি উপকারই যে করলেন! কি কষ্টই যে পাচ্ছিলাম!'

মনে মনে একটু না হেসে পারলাম না।

বড়লোকদের কষ্টটা একটু বেশি!

নইলে কিবা সংসার ওর, বরটি আর নিজেটি, একটি বাচ্চা পর্যন্ত নেই, তবু তিনবেলা চাকর না থাকলে অন্ধকার দেখে। যদিও ফ্রিজি-ডেয়ারের কল্যাণে একদিন বাজার করে সাতদিন বিশ্রাম নিতে পারে, একবেলা রেঁধে চারবেলা চালাতে পারে।

'আমি ওকে রান্নাবান্না শিখিয়ে নেব,'—ক'দিন পরে শীলার হৃষ্টকণ্ঠ টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসে, খুব ভাল লোক দিয়েছেন মাসিমা, সাত চড়ে 'রা' নেই। এর আগেরটা যা পাজি ছিল।' মাঝে মাঝেই কথা বলে শীলা। শীলা অবশ্য আধুনিকা।

খুবই আধুনিকা।

সে রকম আধুনিক সমাজে একবারে প্রধানা হয়ে ওঠবার ক্যাপাসিটি

ও রাখে, কিন্তু মা মাসিদের কাছে স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেখানে শীলার প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল স্পষ্ট।

বিগত চাকর সম্পর্কে আরও যে-সব বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে শীলা, তাতে টেলিফোনের এ ধারে বসেই কান লাল হয়ে ওঠে আমার।

যাক ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে আমার প্রেরিত লোক সম্পর্কে শীলা বিগলিত!

তা বিগলিত নিতাইও।

দু'দিন পরেই দেখা করতে এল সে, দেখি পরনে গায়ে বড় ধবধবে হাওয়াই সার্ট, পায়ে বড় মটমটে পায়জামা। মুখ দাড়ি মুক্ত, সে মুখে হাসি।

'খুব ভাল কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন কাকিমা, চমৎকার মানুষ ওঁরা দুজন। আমি বলিনি, ওঁরা নিজে থেকেই এই সব জামাকাপড় দিলেন—'

মনে মনে হাসলাম।

এদিকে চাকরের কাজ নিতে পৈতে খুলে রাখার চিন্তা, অথচ বামুনের ছেলে হয়ে পুরনো জামাকাপড় পরতে লেশমাত্র লজ্জা দেখছি না।

সত্যিই বটে ভাতের কাছে জাত নেই।

উৎফুল্ল নিতাই আরো বলে চলে, 'খাওয়া দাওয়া, বুঝলেন কাকিমা, একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ! যা নিজেরা খাবে তাই আমায় দেবে। একেই বলে উঁচু নজর। আমিও অবিশ্যি ভাবি, মনিব পিতৃতুল্য, গুরুজন, অত পাতের এঁটোর ছোঁয়াছুঁয়ি বাছাবাছি করলে চলবে কেন! তাতে ওদের লোকসান, আমারও লোকসান! খায় তো কত, কেবল রাজ্যের ভাল ভাল জিনিস এনে জড় করার বাতিক।

আনছে টানছে ফেলছে, আমায় ডাক দিয়ে বলছে, 'নিতাই ও আর আমরা খাব না, তুই যদি খাস তো খেয়ে নে।' কেক্, 'পেস্ট্রি' কতরকম সব খাবার, নামও জানি না।'

শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভাবি ব্রাহ্মণ বলে গর্ব ছিল ওর, বলেছিল পৈতেটা খুলে রাখবো। এখন বিনা দ্বিধায় জুতো ঝাড়ছে, পাতের এঁটো খাচ্ছে।

যাক, আমাকে আর ঝামেলা পোহাতে না হলেই হল। তবু মনটা একটু কেমন কেমন হয়।

বলি, 'বেশ বেশ, মন টিঁকিয়ে থাকিস। ওই তো দুটো লোকের সংসার। যা করবি তুই। সেই ভাবে—'

নিতাই গাল ভর্তি হেসে হেসে বলে, 'সে আর বলতে হবে না। দাদাবাবু বৌদি তো তাকিয়েও দেখে না। যা করবো আমি'

সন্তোষ প্রকাশ করি।

ওদিকে শীলার বার্তা বাজে। 'মাসিমা দু'বেলা আপনাকে 'আশীর্বাদ' করছি। কী গোছালো কাজ, আমাকে সংসার তাকিয়ে দেখতেও হয় না। নিতাই-ই বাজার করছে, দোকান করছে, কি রান্না হবে ভাবছে—'

ভাবি, যাক জীবনে এই একটা ব্যতিক্রম, কাউকে চাকর ঠাকুর জুটিয়ে দিয়ে অথবা কারো বিয়ের ঘটকালি করে কখনো উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জোটেনি ভাগ্যে। অভিযোগ অনুযোগই পুরস্কার লাভ হয়েছে। নিতাইয়ের নম্রতা, বাধ্যতা, বিনয়ে বিগলিততা, আমার মুখ রেখেছে।

হাঁ, ওই রকমই ছিল নিতাই। কিন্তু থাকল না।

সেই কথাই বলি।

হঠাৎ আজ দুপুরবেলা, খেয়ে দেয়ে একখানি গল্পের বই হাতে একটু শোবার উদ্‌যোগ করেছি, দেখি নিতাই তার সেই ছোট্ট পুঁটলিটুকু হাতে হাজির।

'কী নিতাই, কী খবর?'

নিতাইয়ের সেই ভীতু-ভীতু বোকা-বোকা চোখ দুটোয় ধ্বক করে যেন দু'ডেলা আগুন জ্বলে উঠল। আর ওর চিরকালীন ভঙ্গী 'হেটমুণ্ড' ত্যাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি হল ? কাপড় চোপড় নিয়ে চলে এলে যে ?'

'ওখানে আর কাজ করব না !'

স্পষ্ট গলায় ঘোষণা ক'রে নিতাই।

আমি তো অবাক !

যেন সুর-বাঁধা যন্ত্র হঠাৎ একটা তার ছিড়ে ফেলে ঝনঝনিয়ে বেসুরো বেজে উঠল।

দু' পক্ষের এত সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা, হঠাৎ হল কি !

জিগ্যেস করলাম সে কথা।

নিতাই চুপ।

বুঝলাম কোনও কারণে তিরস্কৃত হয়েছে। ভৃত্য জাতটাই এমনই। শত ভাল ব্যবহার কর, একবার একটু বকেছ কি সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে জবাব। মরছিলি না খেতে পেয়ে, তবু তো হাড়ের খোঁচাগুলো ঢাকতে শুরু করেছিল।

বিরক্তিটা চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'হলটা কি ? বকাবকি ? তা বাপু দোষঘাট করলেই বকুনি আছে। মনিব বলে তো চোরদায়ে ধরা পড়েনি যে সব সয়ে যাবে ? এই তো বললে খুব ভাল, হঠাৎ যদি একটু—।

নিতাই এবার মুখ তুলে বলে, না কাকিমা, বকাবকি ওঁরা করেন নি। কথাবার্তা ওঁদের খুব ভাল।'

'তবে ? কাজ বেশি পড়েছিল বুঝি ? তা বাপু গেরস্তর বাড়ি কাজ কি আর মাপা থাকে ? একদিন কমও হয়, একদিন বেশিও হয়—'

নিতাই হেঁটমুণ্ডে বলে, 'না কাকিমা, কাজ বেশি নয়। আপনার আশীর্বাদে নিতাই এই রোগা হাড়ে ভেলকি খেলাতে পারে—'

আমি অবাক্ হই।

বলি, 'তা হলে ? তা হলে কাজ না করার কি হল্ ?'

হেটমুণ্ড নিতাই হঠাৎ আবার দৃঢ়ভঙ্গী আনে। দৃপ্তস্বরে বলে ওঠে, 'ওখানে আমার মান মর্যেদা থাকছিল না !'

মান মর্যেদা থাকছিল না !

শুনে আমি বিমূঢ় ।

বকাবকি নেই, কাজ বেশি নেই, দুর্ব্যবহার নেই, খাওয়ার কষ্ট ও শোওয়ার কষ্ট নেই, পরার সুখেরও অবধি নেই, মান-মর্যেদা নামক বস্তুটা তবে কোন্ পথ দিয়ে উধাও হল নিতাইয়ের !

সেই কথাই বলি, 'এই তো বলছ বকাঝকা করেনি, তবে মানটা আবার কোন্ পাখীর ডানায় ভর করে উড়ে গেল তোমার ?'

নিতাই আবার স্বভাবে এল ।

হেটমুণ্ড করল ।

বলল, 'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না কাকিমা ।'

বলতে পারব না !

এ আবার কোন্ ভাষা !

আমার বান্ধবী-কন্যাকে তো আমি জানি । একটু হয়তো আহ্লাদী, একটু বা অহঙ্কারী, কিন্তু—

আমিও দৃঢ় হলাম এবার ।

বললাম, 'বলতে না পারলে তো চলবে না নিতাই, অকারণ একটা দোষ দিয়ে তুমি যদি কাজ ছেড়ে দাও, আমি শীলাকে কি বলব ? এক্ষুণি তো ফোন করে জিজ্ঞেস করবে আমায় ।'

নিতাই তেমনি ঘাড় গুঁজে বলে, 'বলবেন, হঠাৎ দিদিমার অসুখ শুনে চলে গেছে—'

'চমৎকার ! সে কথা তুমিই তো বলে আসতে পারতে ওদের ! সেটা তো কিছু লুকোচুরির ব্যাপার নয় ?'

'তা হলে আপনার যা ইচ্ছে তাই বলবেন ।'

ভারি রাগ ধরে গেল ।

সব সহ্য হয়, এই বুনোমি সহ্য হয় না ।

কড়াগলায় বললাম, 'ওসব বাজে কথা রাখো । খামাখো তোমার মস্ত দামী মান-মর্যেদাটি গেল কেন, তার জবাব দিতে হবে ।'

নিতাই বোধকরি একবার ইতস্ততঃ করল।

বোধকরি ওর কালচে কালচে শীর্ণ ঠোঁট দুটো একবার কাঁপল, তারপর হঠাৎ সবলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলে উঠল, 'ওঁরা ভাল, খুব ভাল, কিন্তু ওঁরা আমায় মানুষ বলে গণ্য করেন না। হতে পারি আমি গরীব হতভাগা মুখ্যু, তবু শিশু তো নই, জোয়ান বয়সের একটা বেটাছেলে তো বটে? ওনাদের স্বামী-স্ত্রীর সব দৃশ্য আমার সামনে—'

হঠাৎ চুপ করে যায় নিতাই।

গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায় বলেই চুপ করে যায়।

চুপ হয়ে যাই আমিও।

স্তব্ধ হয়ে যাই বলেই।

রোগা একটুখানি খাটোখয়া বামনাকৃতি মানুষটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত। তবু বুঝতে পারছি কোথায় ঘা পড়েছে ওর।

বামুনের ছেলে হয়ে চাকরের কাজ করতে পেরেছে নিতাই, পেরেছে জুতো ঝাড়তে, পাতের এঁটো খেতে, পুরনো জামাকাপড় পরতে, মান মর্যাদার হানি হয়নি তাতে ওর, মর্যাদায় ঘা পড়েছে ওর যৌবন-সত্তার অবহেলায়।

নিজেকে নিতাই 'জোয়ান বয়সের পুরুষ' বলে অভিহিত করায় আজ আর হাসি পেল না, এই আহত পৌরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না।

অনুভব করছি নিতাইয়ের কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে জল পড়ছে, আর সে জল টগবগে ফুটন্ত।

নিরীক্ষা

'—অন্ততঃ তিনমাস—' বেশ সহজে আর স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করল ডাক্তার!

যেন তিনমাস বিছানায় পড়ে থাকাটা কিছুই নয়! যেন সুজাতা তিনমাসকাল বিছানায় পড়ে থাকলে অচল হয়ে উঠবে না সুজাতার সংসার। সুজাতার স্বামী কাজে যাবার সময় ঠিকমত ভাত পাবে, আর সুজাতার বাচ্চা ছেলেটা স্কুলে যাবার সময় ঠিকমত তদারকি পাবে।

অভিমানে চোখ ফেটে জল এল সুজাতার। ভারী গলায় বলল, 'তবে যে বললেন, বেশী ভাঙেনি, শুধু হাড়টা একটু ছেঁচে গিয়ে—'

'বলেছি। এখনও বলছি', ডাক্তার নিজের সরঞ্জাম গোছাতে গোছাতে বলে, 'ছেঁচে গেছে বলেই তো মুস্কিল, সোজাসুজি ফ্র্যাকচার হলে, আমি আপনাকে তিন সপ্তাহে রাস্তায় ছোটাতাম। কিন্তু এ ধরণের ফ্র্যাকচারে ডিফিকাল্‌টি কি জানেন—'

সুজাতা অভিমানে ছলছলে হয়ে বলে, 'থাক আর জানতে চাই না। যা জেনেছি তাতেই যথেষ্ট কাজ চলে যাবে আপনার। তিনমাস শুয়ে থাকতে হবে! তিনমাস সময়টা যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার!'

'দিন না ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে'—ডাক্তার হেসে ওঠে, 'বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, পারেন তো কবিতা লিখুন।'

'হ্যাঁ। আর—আপনি এসে আমার সংসারটি চালিয়ে দিয়ে যান!'

অনেক দিনের ডাক্তার, তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা আবদার অভিমান সবই চলে।

ডাক্তার হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'কী এত সংসারের বড়াই করছেন? সংসারের আছে কি আপনার? এই তো আপনি আপনার

বাচ্চাটি আর দত্ত সাহেব, ব্যস ! চাকর রয়েছে আপনার, অসুবিধেটা কী ? শুয়ে শুয়ে ডিরেক্‌শান দেবেন—'

'হুঁ ! ডিরেকশান দিলেই যদি হতো !' সুজাতা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে, 'যা না একখানি চাকর আমার ! দেখলে মনে হয় গন্ধমাদন তুলতে পারবে, কিন্তু কাজের বেলায়—'

অনিল এ অন্তরঙ্গতায় একটু অস্বস্তি বোধ করে।

যতই ডাক্তার বন্ধু লোক হোক, তার সঙ্গে এত ঘরোয়া কথায় কী দরকার ? তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আশা করি ডাক্তার মুখার্জী তোমার হাড় ভেঙে দেন নি ? যে ভাবে ওঁকে এ্যাটাক্ করছ তুমি—'

ডাক্তার হেসে বিদায় নেয়।

বাইরে এসে বলে—'তিনমাসে যদি মেটে তো বলব বিধাতার আশীর্বাদ। নড়াচড়া একেবারে—'

অনিল ক্ষুব্ধহাসি হেসে বলে, 'নড়াচড়ার আর উপায় কোথা ?'

কথাটা সত্যি, পায়ে প্লাস্টার করে যাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, তার সম্পর্কে আবার নড়ার প্রশ্ন কি ?

'নাও, এবার আর একটা বিয়ে কর—'

ক্ষুব্ধ আর ক্লান্ত হাসি হেসে বলে সুজাতা। অনিল খাটের ধারে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ে উত্তর দেয়, 'যাক, তুমিই তাহলে তুললে কথাটা ? শুনে বাঁচলাম ! ভাবছিলাম কনে খুঁজতে বেরোই।'

'না, সত্যি কী অসম্ভব খারাপ যে লাগছে আমার—'

'খারাপ লাগছে ? আশ্চর্য তো !' অনিল হেসে বলে, 'আমার ধারণা হচ্ছিল খুব ভাল লাগছে তোমার। অবস্থাটা তো আইডিয়াল।'

'আইডিয়াল !'

'তবে ? ওই তো—ডাক্তার তো বলল, 'বই পড়, রেডিও শোনো, ইচ্ছে হয় কবিতা লেখ—'

সুজাতা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'দেখ, হয়তো সত্যিই তাও ভাল লাগত, যদি বুঝতাম সংসারটা সুশৃঙ্খলে চলছে। কে রান্নার দিক দেখবে, কে 'বাবুয়া'কে স্কুলে যাবার সময় তৈরি করে দেবে—'

অনিল ক্ষুব্ধ হাস্যে বলে, 'ওই ভাবনাগুলো তোমার কাছে মস্ত হতে পারে, আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কে তোমাকে দেখবে তাই ভাবনা আমার। স্যুটেব্‌ল একটা ঝি টি—'

হ্যাঁ, উপযুক্ত একটি ঝিয়ের দরকার। গেরস্ত লোক কতদিন নার্স রাখতে পারবে? অতএব ঝি খোঁজা চলতে থাকে। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে, মানে যারা সর্বদা এসে সহানুভূতির মলম প্রয়োগ আর উপদেশের শান্তিবারি বর্ষণ করছে, তাদের কাছে আবেদন পেশ করা হয়েছে, তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। এমন ঝি হওয়া চাই যে সংসারও দেখবে।

সুজাতার দিদি বিনতা এঁদের মধ্যে প্রধানতম। বোনকে দেখতে তিনি প্রায় প্রতিদিনই আসেন। তবে বোনের সেবায় লাগতে পারবেন এত সময় নেই তাঁর। তবু তাঁকেই বেশী করে মুরুব্বি ধরে অনিল। বলে, 'দিদি আপনি চেষ্টা করলেই—'

তা' অনিলের কথার মান থাকে।

দিদি ঝি খুঁজতে থাকেন। বলেন, 'মনের মতনটি না হলে—'

সুজাতা বলে, 'দেখছ তো? গোড়ায় বলেছিলাম তোমায়, আর একটা বিয়ে কর! কনে খোঁজা এর থেকে সহজ ছিল—'

অনিল ভাবে, 'সত্যি একটা ঝি পাওয়া কি এতই শক্ত?'

বিনতা তার নিজের স্বামীকে বলে, 'যেমন তেমন হলে শক্ত ছিল না। কিন্তু তা করলে তো চলবে না? সুজির পায়ের হাড় জুড়তে জুড়তে সুজির সংসারের মেরুদণ্ড-ভেঙে পড়বে কি না, সেটাও তো দেখতে হবে আমায়? এই তো এনেছিল আমাদের মানুকে একটাকে লটুকে, পত্রপাঠ বিদায় দিতে হ'ল তাকে। এই ঢলঢলে গতর, ভরা জোয়ান বয়েস! তাকে—'

বাকিটা আর স্পষ্ট করে বলে না বিনতা, ব্যঞ্জনার ওপর ছেড়ে দেয়। অবশ্য তাতেই যথেষ্ট।

বিনতার বর স্ত্রীর কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করে বলেন, 'তা তো বটেই, তাকে কি আর রাখা চলে?'

'চলে না' কথাটা যে কতটা অসভ্য, সে কথা ভাবে না কেউ।

সুজাতা বলে 'যতদূর দেখছি, আমি সেরে উঠে রান্না-বান্না করব, সংসার দেখব, তখন তোমাদের লোক জুটবে।'

'তা হলে উঠেই পড়—' বলে ফিকে হাসি হাসে অনিল।

সত্যি কষ্ট হচ্ছে তার।

যতই হোক পুরুষ মানুষ পা-ভাঙা রুগীর সেবার কী জানে? তাও আবার সুজাতার মত ফিটফাট ছিমছাম প্রকৃতির মেয়ের। বিছানার চাদরটা একটু কুঁচকে থাকলে যার যম-যন্ত্রণা হয়, টেবিলে ওষুধের শিশিটা একটু বাঁকা করে বসানো থাকলে চোখে শূল বেঁধে।

অথচ নার্সকে ক'দিন পরেই বিদায় দিয়েছে!

এ বাড়িতে ফোন নেই, বিনতার বাড়িতে আছে। অনিল চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে অফিস থেকেই ফোন করে, 'কি হ'ল দিদি? লোকের কি হল? আপনার বোন তো—'

বিনতাও চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দরবারি গলাটি খোলে, 'হ্যাঁ ভাই বুঝছি তো—কিন্তু মুস্কিল যে অনেক রকম। এই তো পেয়েছিলাম একটা—একেবারে তোমার গিয়ে কি বলবো, তরুণী! তাকে দিই কী করে? যাই হোক, বেশী ভেবো না, একটি গিন্নী-বান্নী ঝি নিয়ে যাচ্ছি আজকালের মধ্যে—'

তা ভাঁওতা দেয় না অনিলের শালী। পরদিন ঝি নিয়ে আসে সে। দিব্যি কালোকোলো মোটাসোটা, বয়েসওলা।

বসিয়ে আসে বাইরে ঘরের দরজার সামনে।

'এই যে—' বিনতা বলে, 'এইবারে দুঃখু ঘুচল আমার ভগ্নীপতির। আহা পুরুষ মানুষ কম দুর্গতিটা হচ্ছে! নে, এর সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক

কর। আমি অবিশ্যি বলে এসেছি, মাইনে যেমন বেশি দেবে তেমনি জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে—'

আপন কৃতিত্বে পুলকিত হন দিদি।

পুলকিত হয় অনিলও।

বহুবিধ মেয়েলি কাজের দায় থেকে মুক্তি পাবার আশায়। মোটা-সোটা কালোকোলোটিও পুলকিত হয় ঘরবাড়ি দেখে। বাড়িটা ভালই মনে হচ্ছে। আর গিন্নীটা তো বিছানায় পড়ে, রাতদিন কানের গোড়ায় 'এই কর—তাই কর' বলে টিকটিক্ করবে না কেউ।

কিন্তু পুলকিত হয় না সুজাতা।

যার নাকি সবচেয়ে পুলকিত হবার কথা। 'লোক লোক' করে যে পাগল হচ্ছিল। বর আর দিদিকে অবাক্ করে দিয়ে হেসে ওঠে সে, 'এত দিনের সাধনায় ওই লোক ধরে আনলে দিদি? ভগ্নীপতির দুর্গতি ঘুচল, না আরো বাড়ল?'

যার জন্যে হাসি, সে ঘরের বাইরে থেকে কথাটা বুঝতে পারে না, কিন্তু হাসিটা দেখতে পায়, তাই সেও অবাক্ হয়, মূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে।

বিনতা কালিকালি মুখে বলে, 'কেন লোকের দোষটা কী দেখলে? মোটা বলে? ভাবছ খাটতে পারবে না? দেখো পারে কি না! আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়িতে—'

'না না, ওর কর্মক্ষমতায় সন্দেহ করছি না আমি!' সুজাতা আবার হেসে ওঠে, 'হয়তো আমার থেকে ভালই চালাতে পারবে, গিন্নী-বান্নী তো! কিন্তু দিদি আমি তো আর তোমার ভগ্নীপতির পূর্বজন্মের শত্রু নয় যে, ওই কালো মোটা বুড়ীটাকে ওর চোখের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবো? সদাসর্বদা চোখের সামনে ওই মূর্তি দেখতে হ'লে ওর নার্ভ যে বিগড়ে যাবে। বাবাঃ দেখে আমারই চোখ বুজতে ইচ্ছে করছে—আর ও বেচারী ত পুরুষমানুষ!'

অনিল হাতের কাজ থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

দিদি কালি মুখ লাল করে বলেন, 'তোর কথা যে আমার হেঁয়ালি ঠেকছে সুজি! কী বলছিস্ তুই? ঝিয়ের কাজই দেখে লোকে, চেহারা আবার কে দেখতে যায়?'

'কে কি করতে যায় জানিনা দিদি,' সুজাতা বলে, 'আমি অন্ততঃ দেখব। 'ওর' জন্যেই দেখব। ওই কেলে বুড়ী ওর চোখের সামনে আমার জায়গায় ঘুরবে ফিরবে, খেতে দেবে, যত্ন করবে, ওঃ অসহ্য! ...কী গো, কী বল? আত্মাপুরুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না তোমার? না দিদি, তুমি বাপু ওকে পত্রপাঠ বিদায় দাও। একটা সভ্যভব্য অল্পবয়সী মেয়ে যদি জোটাতে পারো, তবেই—'

অনিল বলে, 'তুমি কি দিদির সঙ্গে ঠাট্টা করছ সুজাতা?'

'শোন একবার! ঠাট্টা কেন? সত্যিই বলছি। তবু মানুষের মত একটা লোক থাকলে তাকে ডেকে দুটো কথাও কইতে ইচ্ছে করবে, তার হাতে খেতেও ইচ্ছে করবে। না দিদি না—ও একেবারে অচল!'

শালীর মুখের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে দেখে অনিল। দেখে প্রমাদ গণে। আর সুজাতার কথার সুরটা ঠিক ধরতেও পারে না। সত্যি বটে, ওই ঝিটা সংসারের পরিচালনা ভার নেবে, ওর হাতে খেতে হবে ভেবে, খুব একটা ভাল লাগছে না, কিন্তু সুজাতার চাহিদা যে তাজ্জব! নিজে সে বিছানায় পড়ে থাকবে, তার চোখের বাইরে থাকবে সংসার, মাসের পর মাস। সেই তার চোখের বাইরের সংসারে থাকবে শুধু অনিল, বাবুয়া, আর ঝি-টা! সেই ঝিয়ের সভ্য-ভব্য চেহারা হওয়া চাই! অল্প বয়েস হওয়া চাই! ত্রিভুবনে এমন কথা শুনেছে কেউ কখনো? খেয়ালেরও তো একটা মা-বাপ থাকা চাই?

হঠাৎ একটা সন্দেহে কান দুটো গরম হয়ে ওঠে অনিলের। সুজাতা কি তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে? তার ইচ্ছের পাল্লাটা কোন দিকে ঝুঁকবে তাই দেখতে চাইছে? ছি ছি, এত ছোট মন সুজাতার? এত নীচ?

'ওই লোকই থাকবে,' বলে বিরক্তচিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়

অনিল। বিনতার বেজার মুখে একটু আলো ফোটে। বলে, 'যাক, তবু ভাল যে বাড়ির কর্তা একটু আশ্বাস দিল।'

'দিক্গে দিদি', বিনতার আশ্বাসকে নিশ্বাসে পরিণত করে দিয়ে সুজাতা হেসে ওঠে, 'কর্তার কথা তো শুনে উল্টে গেলাম আমি! পা ভেঙেছে বলে কি আর আমার পোস্টটাও ভেঙেছে? তাই ওর কথায় সংসার চলবে?'

বিনতার মুখে একটু কুটিল রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে, 'পোস্ট ভাঙেনি, তবে তুমি যে খেয়াল ধরেছ তাতে আর ভাঙতে কতক্ষণ? খেয়ালের একটা মানে থাকবে তো? কালো বুড়ীর হাতে ভাত খেতে প্রবৃত্তি হবে না বলে, এই জনমানবশূন্য সংসারে বরকে একটা ছুঁড়ি ঝিয়ের হাতে তুলে দিবি? বলি তোর মাথাটা খেতে তা'হলে ক'দিন লাগবে তার?'

সুজাতার দিদির ওই নিশ্চিত প্রত্যয়ের মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলে, 'বেশীদিন লাগবে না?'

'মোটেই না! শাস্ত্রের তুলনাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু ওর বাড়া সত্যি আর জগতে কী আছে? বুড়ী ঝি রাখব না, ছুঁড়ি চাই! বদ্ধ পাগলেও বোধহয় এমন কথা বলে না। বেশ, চাস তো নে। তোর চাইতে রূপসী, তোর চাইতে জুনিয়ার! মান্কে একটা এনেছিল ধরে, আমি তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। বলিস তো—'

'তাড়িয়ে দিলে? দূর দূর করে?'

'তা দেব না? তোরই নয় মাথার দোষ হয়েছে, আমার তো হয়নি? ঝি খুঁজে দিয়ে তোর ভাল করতে গিয়ে তোর সর্বনাশ ডেকে আনবো?'

বিনতা যুক্তির গর্বে একটু হাসেন।

সুজাতাও একটু হাসে।

দুঃখের, লজ্জার, ক্ষোভের, ব্যঙ্গের।

বলে, 'সর্ব' যে ছিল তার প্রমাণটা তবে কই দিদি, যদি এত সহজেই তার বিনাশ ঘটে? ছি ছি, এত ছোট কথা তোমরা ভাবই বা কি

করে ? এত নীচ কথা উচ্চারণই বা কর কি করে ? একটা ভাল ঝিকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ, সে আমার চেয়ে রূপসী আর আমার চেয়ে কমবয়সী বলে, ভেবে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার ! একা আমার বাড়িতে তো সর্বদা একটা চাকরও থাকে, কই তোমার ভগ্নীপতি তো তার জন্যে কোন দিন—'

ঘৃণায় আর লজ্জাতেই বোধহয় কথাটা শেষ করতে পারে না সুজাতা।

কিন্তু শেষ না করলেই বা কি ?

বুঝতে কি বাকি রইল বিনতার ? এত বোকা তো নয় ?

আর ছোট বোনের মুখে এত 'বড়' কথাটা শুনে চুপ হয়ে যাবে এমন নিরীহ ও নয়। তাই ক্রুদ্ধস্বরে ঝিটাকে ডেকে বলে ওঠে, 'ওগো বাছা যাও, কাজ তোমার জুটল না এ বাড়িতে। এদের ঝিয়ের রূপ চাই, বয়েস চাই !...ধন্যি সুজি ! ভাব দেখাচ্ছিস যেন এই মাত্র পৃথিবীতে পড়লি ! চাকরের তুলনা দেখাচ্ছিস ? বলি, মেয়ে আর পুরুষ এক ? বেটাছেলের প্রবৃত্তির কথা জানিস না বুঝি ? জোয়ান পুরুষের বাড়িতে কমবয়সী ঝি রাখতে লোকে ভয় পায় ! রাখিস না এ খবর ? গিন্নীর চোখের আড়ালে কর্তার ঝিয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি মাখামাখি, শুনিস নি কখনো ?'

সুজাতা দিদির ক্রুদ্ধ মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে থেকে বলে, 'শুনব না কেন দিদি ? সত্যি তো আজ পড়িনি পৃথিবীতে ? অনেক শুনেছি। শুধু ভেবে পাইনি, কাঁচের টুকরোটাকে কোহিনূর-হীরে বলে সিন্ধুকে তুলে রেখে লাভ কী ? এই বুঝি চটে গেল রং, এই বুঝি বেরিয়ে গেল কাঁচ বলে শঙ্কিত হয়ে থাকায় সুখই বা কোথা ? গৌরবই বা কোথা ? কি মূল্য আমার সেই পোস্টের, যেটা যে-কোন মুহূর্তে বেদখল হবার ভয় ? একটা তৃণখণ্ডকে পর্যন্ত ভয় করে চলবো আমায় যদি গদিচ্যুত করে ভেবে, আর সে গদি প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবো, এর চাইতে অপমানের কথা আর কি আছে ?'

'তাই বলে, হীরেটা সত্যি হীরে কি না দেখতে আগুনে ফেলবি তাকে ?'

'না দিদি, ভুল বুঝছ তুমি। হীরেটা হীরে বলেই বিশ্বাস, তাই সেটাকে জলে আগুনে যেখানে সেখানে ফেলতে পারি। যাচাই করতে নয়। তবে তোমাদের শাস্ত্রকথাই যদি সত্যি হয়, তোমাদের হিসেবই ঠিক হয়, কাউকে দুষব না। শুধু নিজের ওপর একটু করুণা হবে, এতদিন কাঁচের টুকরোটাকে হীরে ভেবে পরম সন্তোষে ছিলাম বলে।'

'কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না সুজি—'

'তা সত্যি দিদি! তুমি এত চেষ্টা করছ তবু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এবার নিজে নিজেই বুঝতে চেষ্টা করবো।'

'বেশ' বলে দিদি চলে যান।

অনিল আবার আসে।

বলে, 'আচ্ছা, এসব কী পাগলামি তোমার ? না কি আমার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ?'

'আগে ভাবিনি সেটা : এখন ভাবছি, তাই বা মন্দ কি ?'

বিশৃঙ্খল হয় না।

না হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় উত্তরা বেরোবার আগে। তবু ফিরে এসে দেখে হিমাদ্রির মুখের রেখায় রেখায় ফুটে রয়েছে বিশৃঙ্খলার অসন্তোষ। যে অসন্তোষ ফুটে উঠছে তার হাত পায়ের প্রতিটি অসহিষ্ণু ভঙ্গীর মধ্যে।

তারপর ? কথা ?

অসহ্য ! অসহ্য সেই সব ছোটোখাটো মন্তব্য।

সেই অসহ্যটা আসে একটু পরে। উত্তরা ফিরে আসার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলে না হিমাদ্রি। দোকানের খাতাপত্রের মধ্যে এমন নিমজ্জিত থাকে, মনে হয় বাহ্যজ্ঞান লোপই পেয়েছে বুঝি বা তার।

উত্তরাও ঠিক সেই সময় কথাবার্তা বলে না। চুপচাপ নিজ মনে কাজ করে যায়, ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যায়। প্রধানতঃ ছেলে ফিরলেই বন্ধ-থাকা কথার মেসিনটা আবার চালু হয়। ছেলেকে উপলক্ষ করেই হয়। বাড়ির সামনেই স্কুল, আর ওই আড়াইটের সময়ই ছুটি হয় তার। তবু উত্তরা বাড়ি ঢোকার আগে তাকে নিয়ে চলে আসে না। তা'তে দু পাঁচ মিনিটও তো দেরি হবে ? ততটুকুতেই মেজাজের পারা আরো চড়বে হিমাদ্রির। তা ছাড়া এ আশাও থাকে, যদি হিমাদ্রি না এসে থাকে তখনও।

দৈবানুগ্রহে সে রকম দিন এক আধ দিন আসে। উত্তরা এসে পড়ার পর হিমাদ্রি আসে। শুধু সেই রকম দৈবাতের শুভ লগ্নেই হিমাদ্রিকে একটু প্রসন্ন দেখা যায়। উত্তরা যে বাড়ির বাইরে ছিল, এ ধরণের প্রসঙ্গ উথাপিত হয় না, সহজ সাংসারিক প্রসঙ্গের মধ্যে মেসিন কখন যেন গড়গড়িয়ে চলতে থাকে।

কিন্তু সে তো দৈবাৎ।

দৈবাৎই হিমাদ্রির ফিরতে একটু দেরি হয়, দৈবাৎই উত্তরা একটু শীঘ্র ফেরে। তা নইলে—ওই!……ওই দোকানের খাতা, ঐ নীরবতা।

অথচ উত্তরা খুব একটা অন্যায় অনাচার করে বেড়াচ্ছে না! উত্তরা শুধু একটা সমিতির কাজ করছে। এ সমিতি তার ছেলেবেলাকার এক সহপাঠিনীর। সে এসে ধরেছিল, তাদের অবৈতনিক স্কুলটার দুটো ক্লাশ নিতে। নীচু ক্লাশ, ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে। কাজেই বেশি কিছু খাটুনী নেই। শুধু—

সেই কথাই বলেছিল উমা, 'শুধু দুপুরের আয়েসটি একটু মাটি হবে। হোক বাবা, মানুষের ছেলেগুলো মাটি হয়ে যাচ্ছে! চোখের ওপর দেখতে হচ্ছে! সে লোকসানের থেকে কি তোর এই আরামের লোকসানটা বড় হবে?'

কিন্তু উত্তরার কি শুধু ওই লোকসান?

নানা টালবাহানা করে অবশেষে উত্তরা সত্যি কথাটা বলে ফেলেছিল, 'কি বলবো ভাই, মেয়েদের এই সব বাইরে কাজ-টাজ উনি মোটেই পছন্দ করেন না।'

কিন্তু কথা শেষ হতে যা দেরি।

উমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'রেখে দে তোর 'উনি!' তোর ওই মধ্য-যুগীয় 'উনি'টিকে 'শো'-কেসে সাজিয়ে রাখা উচিত! 'উনি বাইরে বেরোনো পছন্দ করেন না!' মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলি?'

উত্তরা বলেছিল, "তা' কী করবো বল ভাই? অশান্তি অসন্তোষ জিনিসটা আদৌ বরদাস্ত হয় না আমার। একদিন যদি দিদির বাড়ি কি ছোট মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাই তো ফিরে এসে দেখবো বাড়িতে হাঁড়ি মুখের চাষ!'

উমা গম্ভীর হয়েছিল। বলেছিল, 'দেখ্ তুই যদি ওতে ভয় খাস্, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এত কি? হ্যাঁ, বুঝতাম

পরপুরুষের উদ্দেশে অভিসারে ছুটছিস, তাহলে হাঁড়ি মুখের কারণ থাকতো!'

উত্তরা হেসে ফেলেছিল, 'মাত্র? তা'তে মাত্র ওই হাঁড়ি মুখ?'

'আবার কি?' উমা ঝলসে উঠেছিল, 'এ যুগে ওর বেশি আবার কি? মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা, এ গালে চুন ও গালে কালি ল্যাপা, সে-সব শাস্তির দিন আর নেই বুঝলি? এখন বৌ'রা রাত নটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই কর্ত্তারা কৃতার্থ।'

'নিজে বিয়ে করিসনি কিনা তাই এত বলছিস!' উত্তরা বলেছিল, 'পড়তিস তেমন একটি বাঘা বরের হাতে, তো বুঝতিস!'

উমা হেসেছিল।

'বুঝতাম না! বুঝিয়ে ছাড়তাম। বাঘ জন্তুরও ট্রেনিং আছে, বুঝলি? যাক্ আমার এ-সব কথা বলা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো! তবু মোট কথা তোকে আমার চাই। বেশ, তুই এগারোটা থেকে দুটো, এই ক্লাশটা নে। তোর সেই পরমপূজনায় প্রভু তো বলিস দুটোর আগে ফেরে না?'

'তা বটে। তবে সংসারের অন্য গোছ-টোছ—'

'আবার কী গোছ? নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। তোর ছেলে ক'টায় স্কুলে যায়? কটায় ফেরে?'

'সাড়ে দশটায় যায়, আড়াইটেয় ফেরে।'

'ব্যস! কর্তা দোকানে যায় কখন?'

'ন'টায়।'

'হ্যাঁ, আর ফেরে কখন?'

'দুটো, সওয়া দুটো, এই।' আবার সেই বিকেল পাঁচটায়!

'তবে? তবে আটকটা কিসের? সকাল থেকে ওই এগারটা অবধি যত ইচ্ছা সংসারের গোছ কোরো বাবা! পরমগুরুর জন্যে তেল গামছা, জল সাবান, পাদ্য অর্ঘ্য, সব সাজিয়ে রেখে যেও! তা

হলে হবে তো? উঃ ঢের ঢের 'উনি'-প্রেমিক দেখেছি, তোর মত এমনটি আর দেখিনি।'

চক্ষুলজ্জা বল চক্ষুলজ্জা, প্রেসটিজ বল প্রেসটিজ, সেটা রাখতেই হয় বজায়। উত্তরার মত বয়সে, সংসারে যার বর ছাড়া আর কোনো গার্জেন নেই, তার পক্ষে কত আর দোহাই দেওয়া সম্ভব?

নিতে হয়েছে কাজটা।

চাকরি নয়, মাইনে নেই, শুধু কাজ-ই। কিন্তু কষ্ট তো তাতে নয়। আমি সমাজসেবার মত সামান্যতম কিছু করছি এটাতো ভালই লাগে। ভাল লাগে দৈনিক অন্ততঃ একবার বাইরে বেরিয়ে পড়তে। কোনো অবিলিই হয় না সংসারের। চাকর আছে পুরনো, আর নিজেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় বেরোবার আগে। তবু হিমাদ্রির অসন্তোষ।

যে প্রাণীটি একেবারে তার নিজস্ব সম্পত্তি, সে কেন অন্যের কাজে লাগবে? অন্য কেউ কেন তার ওপর ভাগ বসাবে? এই তার মনোভাব।

হয়তো এ মনোভাব পুরুষ মাত্রেরই থাকে, শুধু যুগটা মধ্যযুগ নয় বলেই সে ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। হিমাদ্রির মত যাদের মনোভাব গোপনের ক্ষমতা নেই, তারাই ধরা পড়ে।

অথবা যুগের পরিবর্তন কেউ টের পায়, কেউ পায় না। হিমাদ্রি পায়নি। তাই হিমাদ্রির স্নানের ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে একটা মগ বসানো রয়েছে দেখে, সেটাকে পায়ের ধাক্কায় ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে বাধে না। 'আর কেন? সংসার করবার আর দরকার কি?······এবার সমিতিতে গিয়ে থাকলেই হয়। একটা জিনিষ যদি গোছানো থাকবে! বাড়ি না মেস বাড়ি!'

এটা অবশ্য কথা বলার সূচনা পর্ব।

খানিক আগে পর্যন্ত পাথরের দুর্গের মধ্যে ছিল হিমাদ্রি। এই

চেঁচানিটা যদিও অপমানকর, তবু সত্যি বলতে, ওতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে উত্তরা। বুঝতে পারে এখন শনৈঃপন্থা।

এখন উত্তরাকে বলতে হবে, 'আশ্চর্য, যেটি না দেখব, সেটি হবে না। চাকর তো একটা আছেও।'

তার উত্তরে হিমাদ্রি বলবে, চাকর-বাকর মাইনে-করা লোক, তাদের কাছে কি আর 'প্রেম' পাওয়া যাবে? যার নিজের সংসার তারই বড়—হুঁঃ।'

অতঃপর নিজের দোষ স্বীকার।

উত্তরা যে আজকাল কী পরিমাণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, তার ফিরিস্তি দাখিল। এ মাসটা বাদ বলতেই হবে উমাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি!···

প্রায় প্রতিদিনই এই ধরণের নাটক। প্রায় একই নাটকের পুনরভিনয়। কোনোদিন বা মগ, কোনোদিন বা গামছা, কোনো দিন শিশি।

পরদিন উত্তরা আরো অবহিত হয়, যেখানকার যা রাখে। কিন্তু যেটা হলেই হলো কি? আসলে তো বিরক্তির পাত্রটা উত্তরা। তাকে যেখানে রাখলে হিমাদ্রির রাগ আসবে না, সেখানে রাখতে পারা যায় কই?

অথচ আগে হিমাদ্রির মেজাজ এমন খারাপ ছিল না। আগে বাড়ি এসেই হাসি মুখের প্রসাদ বিতরণ করতো জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীকে। তখন বাচ্চু স্কুলে যেতে শেখেনি। রান্নাবান্না সেরে ছেলেকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে, জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতো উত্তরা।

বছর খানেক হলো বাচ্চু কে. জি. স্কুলটায় ভর্তি হয়েছে, আর উত্তরাও স্কুলের কাজে ভর্তি হয়েছে। হিমাদ্রিও বদলাচ্ছে তখন থেকে।

হিমাদ্রি যে দোকান করে, সেটা গ্রহের ফের। ভাল কাজকর্ম করতো হিমাদ্রি, কিন্তু একদিন ওপরওলার সঙ্গে মনান্তর করে ফট

করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসলো। পরের চাকরীতে আর নেই সে।

যদিও এই ছোট্ট দোকান থেকেই যা আয় হয়, তা হিমাদ্রির সেই অফিসের চাকরির চারগুণ, তবু হিমাদ্রি যেন হীনমন্যতায় ভোগে। যেন সেই দশটা পাঁচটার গৌরব অনেক বেশি। যেন সকালবেলা রাজবেশ গায়ে চড়িয়ে নাকে মুখে ভাত গুঁজে ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক প্রবল।

উত্তরা অবশ্য তা ভাবত না।

ও বলতো, কেন স্বাধীন ব্যবসা তো ইজ্জতের! ও ভাবতো, সংসারে টাকা কিছু বেশি আসাটাই তো সুখের।

তবে আজকাল উত্তরারও সংসারের সেই পুরনো দিনের চেহারাটা ভেবে মাঝে মাঝে নিশ্বাস পড়ে। তখন যদি ছ'ঘণ্টাও স্কুলে কাজ করতো উত্তরা, কিছু এসে যেত না। একটি কথা বলবার খোঁজ পেত না হিমাদ্রি! সব সেরেও জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো উত্তরা। এখন হয় না।

এখন হিমাদ্রির গতিবিধির সময় বদলেছে। আস্ত করে অনেকখানি সময় আর পায় না উত্তরা। হিমাদ্রি নটায় বেরোয় মোটাসোটা জল-খাবার খেয়ে, দুটো আড়াইটেয় ফিরে স্নান করে, ভাত খায়, একটু গা গড়িয়ে আবার বেরোয়। বেরোতে সাড়ে চারটে পাঁচটা। ফের সাড়ে আটটাতেই ফিরে আসা।

তখন বাড়ি আর অফিস ছাড়া আর কিছু জানতো না হিমাদ্রি। এখন বাড়ি আর দোকান ছাড়া কিছু জানে না। জগতে যে কত ভাঙাগড়া চলছে, হিমাদ্রি তার ধার ধারে না।

অথচ হিমাদ্রি অশিক্ষিত নয়।

কিন্তু শিক্ষা কি শুধু ডিগ্রী?

কোনো এক বিষণ্ণ মুহূর্তে ভাবে একথা উত্তরা। ভাবে, দোকান

করছে বলেই কি 'দোকানী' হয়ে যেতে হবে? লেন আর দেন ছাড়া কিছু ভাববে না?

অবশ্য হিমাদ্রিরও একটা দিক আছে।

হিমাদ্রির খেটে-খুটে এসে 'শূন্য ঘর' দেখলে প্রাণ হু হু করে ওঠে। জানলাটা বন্ধ রয়েছে দেখে রাস্তা থেকেই মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু সে কথা হিমাদ্রি বলে না। তাতে মান হয় খাটো। তাই রাগ দেখায় হিমাদ্রি। কারণ খুঁজে পায় না, খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে কারণ।

রোজই করে, রোজই সয়ে যায় উত্তরা, উত্তর করে না, কিন্তু কে জানে আজ কি হলো, উত্তর দিয়ে বসলো।

বললো, 'আমার ছাড়া-শাড়ি ছড়িয়ে রেখে যাই কি গুছিয়ে রেখে যাই, তাতে তোমার কি হচ্ছে?'

আজকের ঘটনাটা ওই তুচ্ছটুকু নিয়েই। বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি শাড়ি বদলে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল উত্তরা, ছাড়াটা ঘরের মেঝেয় ছড়ানো পড়েছিল।

সেই শাড়িটাকেই বলের মত পা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘরের বার করে দিল হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে। মন্তব্যের মূল বক্তব্য, স্বামী নামক এক হতভাগা যে খেটে-খুটে তেতে পুড়ে ঘরে আসবে, সেদিকে খেয়ালই নেই উত্তরার। লোকটা যে বাড়ির কর্তা, তা বোধ হয় মনেই থাকে না। ঘরটাকে বিশ্রী করে রেখে যেতে বাধে না অতএব।

মুখটা হিংস্র দেখাচ্ছিল হিমাদ্রির।

উত্তরার মনে হলো শাড়িটাকে নয়, উত্তরাকেই যেন পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ছুঁড়ে ঘরের বার করে দিল হিমাদ্রি!

তবু প্রথমে সে বলেছিল, 'আমার নিজের ছাড়া-শাড়ি ছড়িয়ে রেখে যাই কি গুছিয়ে রেখে যাই, তাতে তোমার কি হচ্ছে?'

হিমাদ্রির হয়তো খিদে পেয়েছিল।

হিমাদ্রির হয়তো তখনও স্নান হয়নি বলে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, হিমাদ্রির হয়তো দোকানে লোকসান গেছে, তাই মেজাজ এত খাপ্পা। অথবা হঠাৎ উত্তরার মুখ থেকে 'উত্তর' শুনে মাত্রা হারিয়ে বসলো।

এটা যে অনভ্যস্ত।

হিমাদ্রির রাগের সময় কখনো কথা বলে না উত্তরা। আজ বললো।

সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি চীৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ হচ্ছে আমার! কেন থাকবে এলোমেলো? কেন হবে এমন অসভ্যতা?'

বাড়িতে চাকরটা রয়েছে।

সে-কথা মনে রাখে না হিমাদ্রি। তাই উত্তরাও যখন তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, 'অসভ্যতা' কথাটার বানান জানো? না কি দোকানীর কাজ করে ভুলে গেছ সেটা?' তখন হিমাদ্রি ফেটে পড়ে, চোখ কান বুজে চীৎকার করে ওঠে, 'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যাও! দোকানী! দোকানী বর বলে বান্ধবীদের কাছে বড় লজ্জা, না? কই দোকানীর ভাত খেতে তো লজ্জা হয় না? কাজ করছেন! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন! তবু যদি দুটো টাকা ঘরে আসতো!'

উত্তরা হয়তো কথাটা বলে ফেলে একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই মৃদুতার রেখা কোথায় ভেসে গেল! যেন একটা জানোয়ার এসে আছড়ে পড়লো তার উপর।

উত্তরা কি সেই জানোয়ারকে ভয় করেই চলবে? উত্তরা কি 'সামনে থেকে বেরিয়ে যাও' শুনেও সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে অপরাধীর মত?

উত্তরা কি একবার ভাববে না, সংসারে একজনের ভূমিকা অপরাধীর আর—আর একজনের ভূমিকা বিচারকের কেন?

ভাবলো সেকথা উত্তরা।

বিবাহিত জীবনের তেরো বছর পরে হঠাৎ সে ভাবনা এলো

উত্তরার। আর ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছলো এই অবস্থার জন্য দায়ী হিমাদ্রি নয়, উত্তরা নিজেই। উত্তরা অবিরত হিমাদ্রিকে 'উপরি পাওনা'র আস্বাদ জুগিয়ে গিয়েছে। স্নেহ সেবা মমতা ভালবাসার পুরো মাইনে দিয়েও 'ভয়ে'র বকশিশ দিয়ে দিয়ে লোভ বাড়িয়েই চলেছে।

কিন্তু কেন ?

এই ঘুষ, এই বকশিশ, এই অপ্রতিবাদে অন্যায়কে মেনে নেওয়া, এও কি আর এক লোভের ফল নয় ? হ্যাঁ লোভই !

সুখের লোভ ! সংসারের লোভ !

প্রসন্ন মুখের লোভ ! আদর পেয়ে কৃতার্থ হবার লোভ !

উত্তরা এই লোভ থেকে মুক্ত হবে।

তাই উত্তরা রাগে না, কাঁদে না, বরং হাসে। হেসে উঠে বলে, দুটো টাকা ঘরে আনলেই সাত খুন মাপ হতো ?'

'টাকা ! টাকা ঘরে আনবে ?' হিমাদ্রির মুখটা বিদ্রূপে কুঁচকে যায়, 'টাকার চাকরি রাস্তায় পড়ে আছে ! অনাহারি পোস্টের জন্যে অমন অনেকেই তোয়াজ করে নিয়ে যায় ! হুঁঃ !'

'আচ্ছা দেখছি 'আহারি পোস্ট' ভাগ্যে জোটে কি না।' বলে চটিটা আবার পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যায় উত্তরা। অন্যদিন হলে এতক্ষণে বাইরের শাড়িটা তুলে রেখে, ওই ছাড়া-শাড়িটাই ফের জড়িয়ে নিয়ে কাজে লেগে যেত উত্তরা। আজ যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে ছিল। তাই হয়তো আরো সহজেই হলো।

হিমাদ্রি অবশ্য ভাবলো ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গেল উত্তরা। ভাবলো ওই বান্ধবীটিই হয়েছে ওর 'কাল'। ওর সঙ্গে মেলামেশা বেশি হওয়া থেকেই যেন সাহস বেড়েছে উত্তরার। বাইরে বেরোবার 'পা' হয়েছে।

এই জন্যই মেয়েদের বাইরে বেরোনো নিষেধ ছিল আগে। নির্বুদ্ধি পুরুষগুলো স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের ঘর ভাঙছে।

কিন্তু উমা ভেঙে পড়েছে।

উমা তার বান্ধবীর হাতটা মুঠোয় ধরে উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলছে, 'আমিই তোর ঘর ভাঙলাম উত্তরা!'

উত্তরা ওর সেই ধরা হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলে, 'না উমা, তুই আমার কোঠা ঘরের নক্সা বানিয়ে দিলি; যে ঘরের চাল খড়কুটোর নয়, পাছে উড়ে যায় ভেবে সর্বদা ঝড় বাতাস সামলাতে হয় না!'

'কিন্তু তোর ছেলে?'

উত্তরা বলে, 'তুই' ভুল করছিস উমা, স্বামী পুত্রকে ত্যাগ দিয়ে আমি পথে পথে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি, তা' ভাবিস না।···ছেলে থাকবে। স্বামী থাকবে। তার সঙ্গে নিজের ওই কোঠা ঘরটাও থাকবে। নিজের উপার্জন। একখানা খড় পাতার ঘরের অহঙ্কারে যারা পৃথিবীকে তুচ্ছ দেখে, তাদের বোঝানো দরকার, পৃথিবীটা অনেক বড়।···এটা যে বোঝানো দরকার সেই 'বোধ'টা যে নিজেরই ছিল না, তাই না এত দেরি!'

পরিপূরক

পর্দার পাশে ছোট্ট একটা ঢেউ খেলে গেল। তারপর সেই ঢেউয়ের দোলার খাঁজ থেকে চকচক করে উঠলো একটা চোখের একটু কোণ।

ব্যস্ আর বলতে হবে না।

আর কেউ নয়, গীতা।

গীতা ছাড়া এই ভর দুপুরে কে আর নিজের বিশ্রাম নষ্ট করে অন্যের বিশ্রাম হানি করতে আসবে?

রাগে গা জ্বলে গেল লাবণ্য সেনের। তবু—ঝি নয় চাকর নয়, একটা ভদ্রবাড়ির মেয়ে, তাকে তো আর 'দূর হ, বেরো' করা যায় না। তাই শিথিল শাড়িটাকে একটু গায়ে টেনে লাবণ্য অবাক ভাব দেখিয়ে বলে, 'ওঃ গীতা! এমন সময় যে?'

'এই এলাম লাবণ্যদি!' গীতা আস্তে আস্তে প্রথমে পুরো চোখটা, তারপর পুরো মুখটা, অতঃপর পুরো দেহটাকে ঢুকিয়ে দেয়, 'সেই সেলাইয়ের প্যাটার্ন—'

'সেলাইয়ের প্যাটার্ন!'

লাবণ্য বিরক্তি গোপন করে না।

'এমন অদ্ভুত সময়ে সেলাই শিখতে এলে?'

গীতা অবশ্য বিরক্তি বোঝে, কিন্তু তাতে কি? জেনে বুঝেই তো এসেছে গীতা। জানে যত বিরক্তই হোক, তবু দুপুরবেলা একমাত্র লাবণ্যর কাছেই আসা যায়। তের নম্বর ফ্লাটের অম্লান সেনের স্ত্রী লাবণ্য সেনের কাছে।

বারো নম্বরের মিসেস চ্যাটার্জি, এগারোর মিসেস দে, দশের মিসেস মল্লিক, কারো কাছেই দুপুরবেলা আসা চলে না। আট নয়, সাত নয়, ষোলোটা ফ্ল্যাটের প্রায় সবগুলোতেই পনরো নম্বরের

মিসেস হালদারের ভাগ্নী গীতার গতিবিধি।…কোন্ সময়টা কার কাছে যে নিতান্ত অবাঞ্ছিত, তা' জেনে নিয়েছে গীতা।

কিন্তু কোনো সময়ই কি বাঞ্ছিত ?

না, এই কালো রোগা দুঃখী চেহারার মেয়েটার বাঞ্ছিত অতিথি হবার গুণ কোনোখানে নেই, তবু সর্বদাই তার অতিথি হ'বার সাধ!

উচ্ছল খুশিতে হৈ হৈ করতে করতে বেড়াতে আসা নয়। বেড়ালের মত মৃদু পদক্ষেপে এসে চোরের মত পর্দার ফাঁক থেকে মুখ বাড়ানো।

তা এই শৌখিন পাড়ার এই ফ্ল্যাট-বাড়ির চাকরবাকররা ট্রেন্‌ড্। তারা মেমসাহেবদের বিশ্রামের সময় কাউকে ঢুকতে দেয় না। লাবণ্য সেনের বাড়িতেই শুধু চাকর নেই, আছে একটা ঝি। পুরনো বুড়ো ঝি। বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলেই চাকর না-রাখা নিরাপদ মনে করেন অম্লান সেন। ওই বুড়ীই যা পারে!

তা' বুড়ী এদিকে যতই যা পারুক, অতিথি আটকাতে পারে না। বড় জোর বলে 'বৌদিতো ঘুমোচ্ছে গো—'

গীতা বলে, 'তা হোক। আমায় আসতে বলেছিলেন।'

সে অতএব ছেড়ে দেয়। নিজে পাশ ফিরে শোয়।

অবশ্য এই ডাহা মিথ্যার মধ্যেও কিছু সত্যের ভেজাল আছে। সেলাই সেলাই করে জ্বালাতন করলে লাবণ্য কোনো সময় বলেছে, 'একদিন বরং দুপুরে এসো, এখন সময় কোথা বল ?'

অতএব প্রায়ই লাবণ্যর লাবণ্যময় দুপুরের ঘুমটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু সেলাই সে শেখায় না।

উৎসাহ বোধ করে না বলেও শুধু নয়।

গীতা কিছু আনে না বলে। সেলাই কি শূন্যে শেখাবে ?

গীতা বলে, 'আপনি না হয় লাবণ্যদি, যা হোক একটু টুকরো কাপড়ে শুধু স্টিচটা বুঝিয়ে দিন—'

লাবণ্য বিরস মুখে বলে, 'সে রকম কাপড় কোথা ?'

অতএব হয় না।

কিন্তু গীতা চলে যায় না। গীতা লাবণ্যর খাটের বাজুর কোণটা ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। আর আস্তে আস্তে বলে, 'দুপুরবেলা এলে আপনার অসুবিধে হয় সে-কথা বুঝি লাবণ্যদি, কিন্তু কি করবো বলুন ? সময় তো একেবারেই পাই না।'

লাবণ্য নিরুৎসাহ গলায় বলে, 'কেন, তোমার মামার তো তিনটে চাকর ঠাকুর, এত কি কাজ ?'

গীতার গলার স্বর ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়।

'আর বলবেন না ! গুণতে তিনটে লোক সত্যি, কিন্তু আমার মামীর বকুনির চোটে ক'দিন এক সঙ্গে তিনটে থাকে ? উঃ মাসে দু'বার লোক ছাড়ছে !'

এই ফ্ল্যাট বাড়িগুলির বাসিন্দাদের আর যাই হোক, 'মিশুক' বলে অখ্যাতি নেই। কাজেই কেউ কারুর হাঁড়ির খবর টের পায় না। এখানে গীতাই একমাত্র সাংবাদিক।

লাবণ্যর গলায় এবার কিঞ্চিৎ উৎসাহের স্বর ফোটে, 'তাই বুঝি ? তা এত বকবার কি আছে ?'

'কী আছে ? কিছু না। অকারণ ! গুরুজন, বলা উচিত নয়। আপনার কাছেই তাই বলছি—দুর্দান্ত মেজাজ ! রাগলে মামাকে শুদ্ধু তো প্রায় মারতে বাকি রাখেন !'

লাবণ্যর ঘুম ছাড়ে, লাবণ্য খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'কী সাংঘাতিক ! য্যাঃ—তুই বানাচ্ছিস !'

'তুই' সম্বোধনের পর গীতার গলার স্বর আর একটু উচ্চ হয়, 'বানাচ্ছি ! বেশ বলেছেন ! এই তো গত কালই তো টাকা টাকা করে কী কাণ্ড ! সে প্রায় হাতাহাতি।'

'টাকা? টাকা কিসের?'

লাবণ্য সোজা হয়ে বসে। বলে, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন 'বোস!' বিছানারই একটা পাশ দেখিয়ে দেয়।

গীতা আলতোভাবে একটু বসে। তারপর বলে, 'মামা নাকি একশো টাকার একটা নোট রেখেছিলেন পকেটে, পাচ্ছেন না। মামী বললেন, 'তুমি রাস্তায় হারিয়েছ।' মামা বললেন, 'কক্ষনো না'···উঃ সে কী তর্কাতর্কি! শুনতে পাননি?'

লাবণ্য মাথা নাড়ে।

'শোনা যায় না! কংক্রীটের বাড়ি তো!'

লাবণ্য বলে, 'তা তোদের চাকর বাকর তো সবই নতুন, তাদের সন্দেহ না করে কর্তাকে বকুনি যে?'

গীতা চোখে মুখে একটু রহস্য খেলায়, 'বুঝতে পাচ্ছেন না? সে টাকা তো উঠেছে মামীর বাক্সে!'

'অ্যাঁ!'

'তবে আর বলছি কি! মামীর কে ছেলেবেলার বন্ধু আছে, প্রায়ই তুপুরে-টুপুরে আসে, তাকে গোছা-গোছা টাকা দিচ্ছেন।'

'বটে!' লাবণ্যর মুখে রহস্যের আলো খেলে যায়।

'বন্ধু? না বান্ধবী রে?'

'বান্ধবী নয়'। বলে গীতাও মুচকি হাসে।

লাবণ্য বলে, 'হুঁ। তোর মামীর তাহলে বেশ একটু ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে! বয়েস তো কমটি নয় বাপু?'

'সে বন্ধুও স্রেফ বুড়ো!'

'তার মানে বাল্য প্রেমের ব্যাপার!'

গীতা এবার চঞ্চল হয় যেন। বলে, 'একথা যেন ফাঁস হয় না লাবণ্যদি! মামী তাহলে আমাকে—'

'আরে বাবা কে তোর মামীকে বলতে যাচ্ছে? তা সেই বুড়ো এসে খুব আড্ডা দেয় বুঝি?'

গীতা লজ্জিত হাসি হেসে মাথা নীচু করে বলে, 'সে আর বলবেন না—' তারপর উঠে পড়ে বলে, 'আমি যাই লাবণ্যদি—'

লাবণ্য ওর আঁচলটা চেপে ধরে বলে, 'বোসনা! চা হোক, খেয়ে যাস। অ বলাইয়ের মা, চায়ের জলটা চাপাও না, একটু খাই। দু পেয়ালার মত জল দিও।'

এক একদিন এক এক প্রসঙ্গ ওঠে।

ভাগ্নীর প্রতি দুর্ব্যবহারের নমুনা হিসাবে খেতে না দেওয়া, পরতে না দেওয়া, রোগে ওষুধ না দেওয়া, ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনেকদিন আগে পুরনো হয়ে গেছে। ঠাকুর চাকর ধোবা গয়লা ইত্যাদিকে গালমন্দ, সেও জোলো হয়ে গেছে, এখন এসেছ টাকা চুরি, বাল্য-প্রেম!······

তারপর কি সব ফুরিয়ে যাবে গীতার? না না, মামীর পর মামাতো বোনটা নেই? পনরো বছর বয়সেই সে নাকি সিঁড়িতে যেতে আসতে বারো নম্বরের চ্যাটার্জি সাহেবের ছেলের সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি করে, রুমালের ঝাপট দিয়ে যায়!

'ও মেয়ে যা হবে—'

লাবণ্য বলে, 'ওমা ওটা তো বাচ্ছা'—

'বাচ্ছা! হুঁঃ! ওর থেকে অনেক বাচ্ছা আছেন আপনি!'

লাবণ্যর কাছে চা খেয়ে গীতা টুক করে গিয়ে এগারো নম্বরে ঢোকে। ওরা তখন চা খাচ্ছে।

বলা বাহুল্য গীতাকে দেখে প্রীত হন না—মিসেস দে। নীরস মুখে বলেন, 'বোসো! চা খাবে?'

'চা? তা' দেবেন তো একটু দিন মাসীমা! লাবণ্য সেনের বাড়ির চা খেয়ে পর্যন্ত মুখটা স্রেফ্ তেতো হয়ে গেছে! কী বাজে চা বাবা!'

মিসেস দে মিসেস সেনের বাড়ির চায়ের তিক্ততার সংবাদে নিজের তিক্ততা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করেন। এক পেয়ালা চা ঢেলে গীতার দিকে

ঠেলে দিয়ে ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলেন, 'কেন? বাজে চা কেন? এদিকে তো 'অ্যামবাসাডার' কিনলেন নতুন!'

'হ্যাঁ, ওই বাইরেই পালিশ'—গীতা উজ্জ্বলভাবে বলে, 'ভেতরে যা কৃপণতা, সে যদি দেখেন! উঃ, ওয়ান পাইস ফাদার মাদার!'

মিসেস দে বাঁকা চোখে বলেন, 'খুব যাও বুঝি?'

'আর বলবেন না! কেবল ডাকবেন। 'গীতা আমার এটা করে দিয়ে যাও, গীতা আমার ওটা করে দিয়ে যেও।' চাকরবাকর তো নেই—'

'চাকর নেই!'

মিসেস দে ভাগ্যিস্ পুরো মুরছা যান না! গেলে নির্ঘাৎ চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়তেন।

'চাকর নেই! ছেড়ে গেছে?'

'নাঃ! রাখেনই না, তা হলেই বুঝুন!'

'তা তুমি যে এত কাজ করে দিয়ে যাও, তোমার মামী রাগ করেন না?'

গীতা সোৎসাহে বলে, 'রাগ করবেন কি? অম্লানবাবুর কাছে যে মামার টিকি বাঁধা!···রেস খেলেন তো দু'জনেই—'

'রেস খেলেন?'

মিসেস দে আঁতকে ওঠেন।

যেন এই মাত্র সাপ দেখেছেন মিসেস দে! অথবা মানুষ নামক জীব যে 'রেস' নামক খেলাটা খেলে, এ যেন তিনি জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

গীতা এবার হাসে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'রেস খেলা শুনে মাসীমা যে আঁতকে উঠলেন! রেস এখানকার এই ফ্ল্যাটের কে না খেলে? বোধ হয় একমাত্র আপনারাই বাদ! সবাই সবাই! মামার মুখে তো শুনি! মিসেসরা সুদ্ধ বাদ দেন না!'

মিসেস দে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলেন, 'মিসেসরা? মানে মহিলারা?'

'তবে না তো বলছি কি! আপনি যে মাসীমা এই ফ্ল্যাটে থেকে এত সরল আছেন কি করে, তাই ভাবি। যাই মাসীমা, দেরি দেখলেই তো আমার মামীটি—'

'হচ্ছে! গেলেই তো কাজ করতে হবে? বসেই যাও না একটু, আর একটু চা খাবে?'

'না মাসীমা! খুব ভালো খেয়েছি! মুখটা ছাড়লো! আচ্ছা মাসীমা, সাত নম্বরের আর ছ নম্বরের ব্যাপার শুনেছেন?'

মিসেস দে ভুরু কুঁচকে বলেন, 'সাত? ছয়? কী ব্যাপার?'

'ওদের ছেলের সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে তো! জানেন?'

মিসেস দেকে অবশ্য স্বীকার করতেই হয় জানেন না। জানলেও করতে হয়। কারণ অজ্ঞতার ভানে কিছু ভিতরের কথা জানতে পারা যেতে পারে।

গীতা সোৎসাহে বলে, 'জানেন না? জানবেন কি, আপনি যে কারো কথায় থাকেন না। আমিও জানতুম না। সেদিন দশ নম্বরের বৌদি ডেকে নিয়ে সব শোনালেন।···বিয়ে দিতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই!'

গীতা থামলো।

হঠাৎ বলে উঠলো, 'এই ফুলদানিটা বুঝি নতুন কিনেছেন মাসীমা?'

মিসেস দে বললেন, 'না তো! ছিল তো অনেক দিন। তা' বাধ্য হয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা কি বলছিলে গীতা?'

গীতা কালোমুখ লজ্জায় লাল করে বলে, 'সে আপনার কাছে বলা যাবে না মাসীমা,—একদিন নাকি রাত্তিরে সাত নম্বরের মেয়ে ছ' নম্বরের ছেলের ঘরে এসে—নাঃ সে বলতে পারবো না বাবা!··· মোটকথা বিয়ে দিতেই হচ্ছে।···যাক্ হলেই বা কি? আমাদের তো আর নেমন্তন্ন করবে না।'

সরল শিশুর হাসি হেসে ওঠে গীতা।

অনেকটা পরে আরো দু'বাড়ি ঘুরে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে, হঠাৎ পাশের ন' নম্বরের দরজাটা খুলে যায়। ন' নম্বরের—বি. এন. ঘোষের স্ত্রী শীলা ঘোষ ডেকে ওঠেন, 'কে গীতা? ক'দিন যে আসোনি?'

'সময় পাই না বৌদি, যা কাজ!'

'আহা! এই তো, আমায় ডিঙিয়ে তো নীচে নেমে গিয়েছিলে বাবা?'

'আর বলবেন না বৌদি,' গীতা কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, 'মিসেস দের জ্বালায়!…তাস খেলার সঙ্গী পান না ভদ্রমহিলা, আমাকে পেয়েছেন নি-কামাইয়ের দরজী! এদিকে মন ছটফট করছে, ওদিকে উনি জোর করে তাসে বসাচ্ছেন। যাই বৌদি!'

'যেওরে বাবা! শোনোনা, তাস খেলতে সময় পাও, আর—কি খেলো বিন্তি নাকি?'

'বিন্তি!'

'তা' দু'জনে আর কি খেলা হবে?'

দুজন কেন, চার জনই—তা' হলে বলি শুনুন বৌদি, গীতা ফিসফিস করে বলে, 'মামীর যেন কানে না যায়, আর দুই সঙ্গী চাকর আর ঝি।'

'চাকর আর ঝি!'

ন' নম্বর পাথর হয়ে যায়।

'সেই তো—আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়! কিন্তু উনি যখন খেলছেন! তাই কি শুধু খেলা? আজ তো হেরে গিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে খুনোখুনি—'

ন' নম্বর খপ্ করে হাত বাড়িয়ে গীতার একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'আরে এসো এসো, শুনি সবটা। বেশ একখানা জবর খবর! এদিকে তো এত সভ্য ভব্য ফ্যাসানি—'

'ওই পর্যন্ত !' গীতা ফিসফিস করে বলে, 'গায়ে টাইট ব্লাউজ এঁটে, আর রুজ সুর্মা লিপস্টিকের শ্রাদ্ধ করে সভ্য হওয়া !···ভেতরে ?'

ঢুকে পড়তে হয় ।

অনেক পরে যখন নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢোকে, মামীর মেয়ে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে চলে যায়, এবং মামী তীব্রস্বরে বলেন, 'পাড়া বেড়ানো হল ?'

গীতা চৌকীতে বসে পড়ে হাসিহাসি মুখে বলে, 'রোসো মামী, আগে একটু হাসতে দাও । বাবাঃ যে কষ্টে ওখান থেকে হাসি চেপে উঠে এসেছি ? কত রকম কাণ্ডই ঘটে জগতে !'

এই বাক্‌চাতুরী চলবে কিছুক্ষণ ।

এই বাক্‌চাতুরীর অবকাশে আর একটা গল্প বানানো যাবে !···

মামী সন্দেহ করবে—বাজে কথা, বানানো কথা, তবু শুনবেও । উদাসীনতার ভান করেও শুনবে, আর প্রতিবেশী সম্পর্কে কোনো প্রতিকূল মন্তব্য শুনলেই এক-আধটা মন্তব্যও করে বসবে ।

তা' এই ষোলটা ফ্ল্যাটের ষোলোটা গিন্নী—কুড়ি থেকে ষাট অবধি বয়সের, সকলেই কি বোকা ? কেউ তারা গীতার ওই বানানো কথাগুলোয় সন্দেহ করে না ?

করে ।

গীতা চলে গেলে ওরা হেসে হেসে বলে, 'গীতার কথা তো ! 'এইট্টি পার্সেণ্ট' বাদ দাও, তারপর ভাবো !'

যে তরুণী বৌরা পাড়া-প্রতিবেশীর তথ্য সংগ্রহ করতে গীতাকে বসিয়ে বলে, 'বোসোনা বাবা, ডিমের বড়া ভাজছি খেয়ে যাও একখানা,' তারাও গীতা পরিবেশিত ওই তথ্য প্রসঙ্গে বলে 'দশ ক্যারেট সোনা !'

তবু শোনে, বিস্ময় প্রকাশ করে, গীতাকে ঠেলে হেসে বলে, 'বোকোনা ভাই ! এত বানাতেও পারো !'

'বানাচ্ছি ?' গীতা বলে, 'বেশ এই চুপ করলাম ।'

ওরা বলে, 'আরে বাবা—রাগ করছ কেন? বলছি এত কথা তুমি পাও কোথায়?'

গীতা বলে, 'আমি যাই তাই পাই। আপনারা তো কেউ কারুর চৌকাঠ ডিঙোন না!'

হ্যাঁ, কেউ কারুর চৌকাঠ ডিঙোয় না! ফ্ল্যাটে বাস করতে এসে, ফ্ল্যাট বাড়ির নীতি এরা দিব্যি রপ্ত করে ফেলেছে।

আর তাই ফেলেছে বলেই এত সাহস গীতার।

কিন্তু স্টক্ ক্রমশঃ ফুরোচ্ছে।

এইটুকু পরিসরের মধ্যে আর নতুন গল্প বানানো যাচ্ছে না। তাই গীতাকে ঢুকতে দেখলে লাবণ্য সেনের মত প্রথমে সকলেই বেজার হচ্ছে।...

তবু গীতা আপ্রাণ চেষ্টায় আবার একটু আসন সংগ্রহ করে নিচ্ছে। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর লোকের চৈতন্য হচ্ছে, গীতা দাঁড়িয়ে আছে। তখন একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মত বলতেই হচ্ছে তাঁদের 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস! চা হচ্ছে, খেয়ে যা!'

কিন্তু শুধু ওই এক পেয়ালা চা, দু'খানা বিস্কুট, একটুকরো ডিম ভাজা, এর জন্যেই কি গীতার এই আপ্রাণ পরিশ্রম?

নাঃ। তা মোটেই নয়।

লোকের কাছে 'প্রসঙ্গ' সৃষ্টির জন্য যতই নিন্দে করে বেড়াক গীতা, মামা মামীর সংসারে খাওয়ার অভাব তার নেই। ঘাড়ে পড়া ভাগ্নীর জন্যে 'স্পেশাল' কোনো ব্যবস্থা করে না মামী। এমন কি নিজের মেয়ের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে পর্যন্ত দেয়।

পরতেও খুব খারাপ দেয় না।

নিজের ভালো ভালো শাড়িগুলো আধ-পুরনো হয়ে গেলেই 'পরিস এটা' বলে দিয়ে দেয়। অসুখ করলে ওষুধও দেয়।

দেয় না শুধু বিয়ে।

গ্রাম থেকে হঠাৎ-এসে-পড়া রোগা কালো মুখ্যু ওই মেয়েটার বিয়ের কথা ভাবেও না তারা।...

এসেছিলই তো কুড়ি বছর পার করে, বিয়ে হবার হলে আগেই হতো। অতএব মামা-মামীর সংসারে অবান্তর একটা প্রাণীমাত্র হয়ে কুড়ির ওপর আরও সাত আটটা বছর কাটলো গীতার।

মামা বলে, 'রাতদিন পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়, ওকে কিছু কাজ দাওনা কেন? রান্না জানে না?'

মামী বলে, 'জানবে না কেন? মায়ের কাছে কি আর সিংহাসনে বসে থাকতো? আমি করাতে চাই না বাবা! কী দরকার! তোমার আত্মীয়েরা এসে দেখবে, আর বলবে, ভাগ্নীকে দু মুঠো খেতে দেয় বলে দাস্যবৃত্তি করিয়ে নিচ্ছে! চিনি তো সবাইকে!'

পৃথিবীকে চিনে-ফেলা এই মামীর সংসারে অতএব অবান্তরের পোস্ট ছাড়া আর কোন পোস্ট নেই গীতার।

সেই মূল্যহীন জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে গীতাকে। কিন্তু সেই বেড়ানোটা কি সহজ? সহজ নয়।

তাই নিজেকে 'মূল্যবান' করে তোলার এই এক বিকৃত কৌশল গীতার। এ কৌশল সার্থক হলে মূল্য আছে, আদর আছে, ধূসর শূন্যতার মাঝখানে খানিকটা রং, রস, বৈচিত্র্য আছে!

সেই থাকাটাই কি কম?

অন্য আর কোনো নতুন সংসারের রস কি কোনোদিন অনুভব করতে পাবে গীতা? দেখতে পাবে নতুন মুখ, নতুন চরিত্র?

সে আশা আর করে না গীতা।

তাই জীবনের রস আহরণে এই উঞ্ছবৃত্তি তার।

কিন্তু তার বদলে রসের জোগানও তো দিতে হবে? নইলেই তো গীতার মুখের সামনে ওদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা বলবে, 'ওই এলেন! ভাল জ্বালা হয়েছে!' বলবে, সে-কথা জানে গীতা।

জানে, গীতার কথা ওরা কেউই বিশ্বাস করে না। তবু এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো জানে না গীতা!

কিন্তু এই স্বল্প গণ্ডির মধ্যে আর গল্প সৃষ্টি করার জায়গা কোথায়? তাই অনেক দ্বিধা কাটিয়ে গীতা লোকের চরিত্রে হাত দিয়েছে! জানে, এটা ভাঙিয়ে অনেক দিন খাওয়া যাবে।

তারপর? ওটাও যখন পুরনো হয়ে যাবে? মিথ্যার রং মুছে যাবে? তখন? সেটা জানে না গীতা।

সেই ধূসর শূন্যতার দিকে তাকাতে সাহস হয় না তার।

যা ইচ্ছে

রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে।

কতক্ষণ যেন আগে ঘড়ি থেকে যে শব্দগুলো একটার পর একটা বেরিয়ে এসে ধাক্কা মেরে মেরে চলে গেল, তা'রা কজন ছিল? নয়? দশ? এগারো? না আরো বেশী?

ললিতা ভাবল আশ্চর্য! মনে পড়ছে না কেন? তখন তো গুনলাম! তারপর ভাবল, আজকের রাতটা কী আশ্চর্য! কালকেও ধারণা করতে পারিনি, আজ সকালেও না। ভাবতেই পারিনি আমার জীবনে এরকম একটা রাত আসবে আজ!

এত বড় বাড়িটায় আমি একলা আছি। ভাবল ললিতা। রাত্রি গভীর হয়ে চলেছে, পৃথিবীর জীবনের স্পন্দন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। ললিতাদের প্রতিবেশীদের বাড়িগুলোর আলো নিভে যাচ্ছে একটা একটা করে। ক্রমশঃ সব নিভবে। তখন কি ভয় করবে ললিতার?

আচ্ছা ললিতার কি ভয় এখনই করছে? ভয় করা তো উচিতই ছিল। এত বড় বাড়িখানায় আজ ললিতা একা রয়েছে! একেবারে একা, অথচ রাত গভীর হচ্ছে।

বাড়িতে মাত্র ললিতা আছে, আর কেউ নেই, এরকম রাত কি ললিতার এই আঠারো বছরের জীবনে কখনো এসেছে? না, কিছুতেই এরকম একটা ঘটনার স্মৃতি মনে আনতে পারল না ললিতা।

কি করে পারবে? একা কি রাখে কেউ? মেয়েসন্তান বড় গোলমেলে জিনিস!

ছোটতে ভূতের ভয়, বড়তে মানুষের ভয়। 'রাত হয়েছে ভয় কি', এ কথা মেয়ের ক্ষেত্রে অচল। 'বড় হয়েছে বড় ভয়,' এই তো বিবেচনার কথা।

তবু আজ ওরা অবিবেচনা করেছে।

আজ ওরা ললিতাকে একা রেখে গেছে। ললিতার দাদা বৌদি। কি করবে উপায় ছিল না। হঠাৎ খবর পেল বৌদির মা মরমর! এ খবর পেয়ে মেয়ে জামাই চলে যাবে না ঊর্ধ্বশ্বাসে? তখন কি ভাবতে বসবে ললিতাকে কাদের বাড়িতে রেখে যাব, না কি ললিতার কাছে কাকে এনে রেখে যাব?

তাই করে ওরা।

যতদিন হল ললিতার মা মরেছে, ততদিন থেকে এই করছে ললিতার বৌদি। হয় কোথাও রেখে যায়, নয় কাউকে এনে রাখে। কিন্তু আজ অত করবার সময় কোথা পেয়েছে? পায়নি। দাদা বলেছে, 'তুই একটুক্ষণ একা থাক্ ভাল করে দোর বন্ধ করে, আমি অবস্থাটা দেখে ঘুরে আসছি। তোর বৌদি বোধহয় থেকেই যাবে।'

তারপর নিরাপত্তার আর একটা ধাপ উঠেছে তারা। চাকরটাকে ছুটি দিয়ে গেছে। বলেছে 'আজ একটা বন্ধুর বাসায়-টাসায় থাক্‌গে যা!'

ললিতা বলল, 'ওকি বৌদি, ও কী মনে করল!'

বৌদি বলল, 'মনে আবার কি করবে? আর যা মনে করতে পারে করুক। তা' বলে ওকে এই একা রেখে—না বাবা, যা দিনকাল!'

দিনকাল খারাপ বলেই আজ ললিতা একা থাকতে পেয়েছে। আর রাত যত গভীর হচ্ছে ততই ললিতা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

খুব সম্ভব বৌদির মা মারা গেছেন, অথবা যাচ্ছেন। নইলে দাদা ফিরতো, ভাবল ললিতা। সারা রাতই ফিরবে না নিশ্চয়।

তারপর একটা উত্তেজনা, উত্তেজিত গলায় আপন মনে বলে উঠল, আজকের রাত্তিরটা নিয়ে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি।···কেউ কিছু বারণ করবে না, কেউ দেখতেও আসবে না।

ললিতা যদি এখন সারা রাত খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে থাকে, কেউ একশোবার ডেকে ডেকে বিরক্ত করবে না, 'ললিতা ঠাণ্ডা লাগছে, ললিতা ঘরে আয়!…ললিতা আজ তোর লেখাপড়া নেই?'

আরো কতরকমই বলতে পারে।

মোট কথা না উঠিয়ে ছাড়বে না।

কিন্তু এটাই বা কি এমন? ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়া! এতে মজা কই?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ললিতা।

ললিতা যদি এখন স্নানের ঘরে গিয়ে কল খুলে দিয়ে যত ইচ্ছে চান করে? এ কল্পনায় একটু চাঞ্চল্য এলো। চান করবে। চান করতে করতে গলা ছেড়ে গান গাইবে। শুনে কেউ হেসে হেসে বলবে না, 'ললিতা ছোটবেলায় তোমায় কেন যে একেবারে গানের দিকে দেওয়া হয়নি, বুঝছি!'

ললিতার বৌদির গানের সুনাম আছে। স্নানের ঘরে এসে ললিতা খোঁপাটায় হাত দিল। মেঘের মত চুল ললিতার, খোঁপাটা ভারী বোঝা। বৌদি বলে, 'বেশী চুল কিন্তু একটু কেমন গ্রাম্য-গ্রাম্য! তোমার বয়সের কোন আধুনিক মেয়ের এত চুল দেখেছ তুমি?'

সেই চুলগুলো ভিজোতে এসে তেমন উৎসাহ বোধ করল না ললিতা। বাথরুমে এসেছিল বলেই শুধু মুখটা ধুয়ে নিল সাবান দিয়ে।…

আচ্ছা এখন খুব সাজলে কেমন হয়?

এই কল্পনায় আগের থেকেও রোমাঞ্চ অনুভব করল ললিতা। খুব সাজতে, যতটা ইচ্ছে। মাঝ রাতে জেগে জেগে যত ইচ্ছে সাজা কি খুব একটা মজা নয়?…

আর্শির সামনে এল ললিতা।

বৌদির ঘরের বড় আর্শির সামনে প্রসাধনের বহুবিধ সামগ্রী থরে

থরে সাজানো আছে। বৌদি শৌখিন মানুষ। তা' বৌদি খারাপ মানুষ নয়। সব সময় বলে, 'শুধু একটু স্নো মাখা ছাড়া সাজের আর কিছু জান না কেন ললিতা? এই তো ড্রেসিং টেবলে সবই রয়েছে, নিলেই পারো।'

ললিতা নেয় না।

ললিতা বলে, 'এই তো চেহারা, তা আবার সাজ!'

আজ কি হঠাৎ চেহারা ভাল হয়ে গেল ললিতার?

তাই সাজতে ইচ্ছে করল? সাজতে সাধ হল প্রসাধনের যে-সব উপকরণ জীবনে কখনো ছোঁয়নি, তাই নিয়ে নিয়ে?

ছোঁয়নি কিন্তু দেখেছে।

একটার পর একটা করে গোটা তিনচার জিনিস মুখে মাখে বৌদি, তারপর পাউডার, তারপর কাজল, তারপর লিপস্টিক!

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ অনুভব করছে ললিতা। ললিতার হাত কাঁপছে। বারবার থামতে হচ্ছে কাজলের রেখা টানতে, ভুরুর ভঙ্গিমা আঁকতে।

আঙ্গুলের আগাগুলো এত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন ললিতার? মাঝ রাত্রে উঠে কাজলের রেখা টানতে বসলে কি এই রকম হয়? খোঁপাটা খুলে চুলগুলো বিছিয়ে দিল ললিতা। আর হঠাৎ যেন আর্শির মধ্যে কাউকে দেখতে পেল। আর্শির মধ্যে কে ও? ওকি ললিতা? ললিতা কি এত সুন্দরী ছিল? ললিতার মুখও তাহলে এমন মায়াময় আর মোহময় হয়ে উঠতে পারে?

এই সাজে কি সম্পূর্ণতা দেবে ললিতা? ললিতার মায়ের দরুণ সেই সোনালি ফুলে ছাওয়া লাল বেনারসীটা বার করে।

ঘড়িতে ক'টা?

একটা চল্লিশ!

আর কি আসবে ওরা? আসা সম্ভব? নিশ্চয় ওখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওরা আসতে পারছে না। পারবেও না। এত রাত্রে

গাড়িই বা কোথা ? পাঁচ মাইল দূরে বৌদির বাপের বাড়ি। রিক্শা করে আসা যাবে না।

সকালবেলা দাদা একা আসবে।

দাদা তাকিয়েও দেখবে না ললিতার দিকে। রাতজাগা লাল লাল চোখ নিয়ে সোজা স্নান করতে ঢুকে যাবে। ললিতা তো ততক্ষণে এই প্রসাধনের রেখা মুছে ফেলবে, বেনারসী শাড়ি বাক্সে তুলে ফেলবে।

প্রতিবেশীদের সমস্ত বাড়ির আলো নিভে গেছে। শুধু কোণের দিকের বাড়িটার একটা ঘরে আলো জ্বলছে! ও ঘরে একটা ছেলে থাকে জানে ললিতা, কী যেন পড়ে ছেলেটা রাত জেগে জেগে! এম. এ., বি. এ ?

ললিতাদের পাড়াটা বড় সেকেলে।

পাড়ার গিন্নীতে গিন্নীতে গলাগলি আছে। পাড়ার ছেলেতে মেয়েতে নেই। থাকা আইন নেই। চোখ তুলে তাকাও দিকি, ফাঁসির হুকুম!

অন্য রকম হলে, পাড়াটা আধুনিক হলে, ওই ছেলেটার সঙ্গে ভাব হতে পারতো ললিতার। তাহলে অনেক রাত্রে ও এসে ওর জানলায় দাঁড়াতো, ললিতার জানলায় ললিতা···

ললিতা অনেক গল্পে পড়েছে পাড়ার ছেলেমেয়ে লুকিয়ে ভাব করেছে। ললিতাও যদি তা করে! ললিতা যদি এখন ওর মায়ের দরুণ লাল বেনারসী পরে জানলায় এসে দাঁড়ায়!

ও কি ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দেবে? যাতে লেখা থাকবে, 'এত অপূর্ব সাজে সেজেছ কেন আজ?'

আলমারিতে চাবিটা পরাতে বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ললিতার। হাত পা সবই কি ঠাট্টা করছে ললিতাকে? শাড়িটা খুঁজে বার করতে ঘামে পাউডার মুছে এল।···শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। তবে আর কি? শাড়ির পর আর একবার পাউডারের তুলি ঘষা তো নিয়ম। বৌদি তো তাই করে।

ললিতা শাড়িটা পরেছে।

ললিতা ওর তোলা লকেটটা সিঁথিতে লাগিয়েছে টিকলির মত করে। ললিতা এইবার নখে রং লাগাবে।…

ললিতাকে বিয়ের কনের মত দেখতে লাগছে। রাত তো দুটো বেজে গেল। ছেলেটা এখনো জেগে আছে কেন? কই ওতো পড়ার টেবিলে নেই? ও জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে।…

ললিতার জানলায় পর্দা নেই।

ললিতা ঘুরে ফিরে বহু ভঙ্গিমায় নিজেকে বিকশিত করে শাড়ি পরেছে, ও দেখেছে। ললিতা টের পাচ্ছে, ললিতা টের না পাওয়ার ভান করছে।…কিন্তু হাতুড়ির শব্দ ক্রমশঃই প্রবল হচ্ছে কেন? ললিতার রক্তের মধ্যে এমন একটা উত্তাল ভয়ের ঢেউ উঠছে কেন? ললিতা তো জানলায় এসে দাঁড়ায়নি!……ললিতা কিছুই করেনি। শুধু ললিতা অনেক রাত্রে একা ঘরে নিজেকে সাজাচ্ছে।

এতে ভয়ের কি আছে?

ললিতার দাদা বৌদি নিশ্চয় রাত্রে আর ফিরবে না। রাত আড়াইটের পর কেউ পাঁচ মাইল রাস্তা পার হয়ে আসে?……আসে না। ললিতার দাদা পাগল নয়।… ললিতা তবে জানলায় এসে দাঁড়াবে না কেন?

ছেলেটা টেবিলের কাছে ফিরে গেল। নীচু হয়ে কি যেন করছে। লিখছে? সেই লেখা? যেটা গুলি পাকিয়ে এ জানলায় ফেলে দেবে ও?

হাতুড়ীর শব্দ শুধু বুকের মধ্যেই নেই। মাথার মধ্যে চলছে।

ললিতা কি চেঁচিয়ে বারণ করবে?

ললিতা কি ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বে? এই শব্দর হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাবে ললিতা?

ক্রমশঃ বাড়ছে, ক্রমশঃ বাড়ছে…ললিতার বুকের শব্দ কি বাড়তে বাড়তে এই সমস্ত বাড়িখানাকে কাঁপিয়ে দিল?…

হঠাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা যেন বিদ্যুতের বিদারণ রেখা ললিতাকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দিল।...না, চিঠি নয়। ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কার সঙ্গে চীৎকার।

ললিতার দাদার গলা !

দরজায় বোধ করি জুতোর ধাক্কা দিয়েছে দাদা আর তাতেই দাদার গলাটা বিকৃত শোনাল—'ললিতা ! ঘুমিয়েছিস, না মরে গেছিস।'

না, ইচ্ছে করলেই হঠাৎ মরে যেতে পারে না মানুষ।...ললিতাও পারল না।...পারল শুধু সেই কনে সাজা বেনারসীটা খুলে ছড়িয়ে রেখে ছাড়া-শাড়ীটা জড়িয়ে নেমে যেতে।...

কিন্তু ললিতার দাদা একা আসেনি। ললিতার বৌদিও এসেছে।

মায়ের অসুখ বেশী, গুছিয়ে গাছিয়ে দু' দশ দিনের জন্যে যাবে বলে গুছিয়ে নিতে চলে এসেছে। সকালবেলা চলে যাবে। ঘণ্টা তিন চারের জন্যে এসেছে।

ললিতার বৌদির মা মর-মর। তাই বলে যে ললিতার বৌদির জিভটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে, তা তো আর নয় ? আর ললিতার মায়ের সেই শাড়িখানা তুলে নিয়ে ললিতার দাদার সামনে ফেটে পড়বে সে, এটাও কিছু বিচিত্র নয় ?

ললিতার বুকের মধ্যেকার সেই শব্দটা হঠাৎ যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আর কোথাও কোনো শব্দ আছে এ কথা ভুলে গেছে ললিতা। শুধু ললিতার বৌদির ধারালো কণ্ঠস্বর ছুরির মত এই নিঃশব্দতাকে কেটে টুকরো টুকরো করছে।...'দেখ, দেখ, আমার কথা তো বিশ্বাস হতো না ! বোন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এবার বুঝছো ? ওই পাজী ছেলেটার রাত দুপুর অবধি আলো জ্বালার ঘটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ইসারা-ইঙ্গিতে ভাব এগোচ্ছিল, আজ সুযোগ পেয়ে অভিসার। ছিঃ ছিঃ অবাক হয়ে যাচ্ছি গো ! আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম আমার মা মরছে বলে, আর তুমি, তুমি সেই সুযোগ লুফে নিয়ে এই মতলব ভেঁজেছ ? বুকের পাটাকে বলিহারি

ললিতা ! কড়া নেড়ে নেড়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলেছি আমরা। ভাই বলছেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ বোন, ঘুমিয়ে পড়বে বৈকি। আহা ! ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ? ভেবেছিলেন সেখানে তো বুড়ী মরছে, ওরা কি আর আসবে ? অতএব আমি আজ প্রাণের আশা মিটিয়ে নিই। নির্ঘাৎ তুমি নীচের উঠোনের জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে ললিতা ? এই দোর ধাক্কার শব্দ পেয়ে··· । সাজ দেখছো ? সাজ ? উনি নাকি—সাজেন না ! তাকিয়ে দেখ মুখের দিকে—' একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে বৌদি।

ললিতার দাদা হাত নেড়ে থামায়।

'থাক্ ! থাক্ ও সব কথা ! জীবনে তোমাকে আর কখনো বিশ্বাস করতে পারব না ললিতা ! এইটুকুই শুধু জেনে রাখো !

ভারী থমথমে আওয়াজটা আবার বাতাসকে নিঃশব্দ করে দিচ্ছে।···বিশ্বাস করতে পারবে না ! জীবনে কখনো আর ললিতার দাদা ললিতাকে বিশ্বাস করতে পারবে না ! ললিতার বৌদিও না। হয়তো পৃথিবীর কেউ না।

ললিতার বৌদি বলবে, 'সাধে কি আর একদণ্ড একা রেখে যাই না !'

বলবেই তো।

একদিন মাত্র ললিতাকে একা রেখে গিয়েছিল ওরা, ললিতা সেই সুযোগে যা ইচ্ছে করেছে।

নিবৃত্তি

পূজোর ঘর থেকে নেমে এসে আজও সেই একই দৃশ্য দেখতে পেল বন্দনা। যা দেখে, এতক্ষণ পূজোর আসনে বসে থাকা শান্ত স্নিগ্ধ নম্র আর গভীর মনটুকু মুহূর্তে বিষ হয়ে উঠল।

রোজ. রোজ, প্রত্যহ, ঠিক এই একই সময় একই দৃশ্য। একদিনের জন্যে এতটুকু সমীহবোধ দেখা যায় না ওদের মধ্যে।

বন্দনা যে পূজো করে নেমে আসবে, সেটুকু দেরিও সয় না! অক্লেশে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুজনে সারা সংসার হাট করে রেখে।

পূজোর ঘরটি ছাতে।

ছাতে মাত্র ওই একটিই ঘর, যেটা বন্দনার জন্যে তার বাবা করিয়ে দিয়েছিলেন। হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন বলতে হবে বৈকি। মেয়ে বিধবা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক'জন বাপ তার জন্যে ঠাকুরঘর বানিয়ে দেয় একরাশ টাকা খরচা করে?

ঘরটা অবিশ্যি বড় নয়, তবু খরচা বেশ বেশিই পড়েছিল। চারদিকে সুন্দর গ্রীল বসানো বড় বড় জানলা, মোজেকের মেজে, ঠাকুর সাজিয়ে রাখতে মার্বেলের বেদী, তার উপর রুপোর সিংহাসন।

সে যাক, খরচাটাই প্রধান নয়, টাকা থাকলে অমন অনেক খরচা করা যায়, পিতৃহৃদয়ের স্নেহটুকুই আসল। আর বিবেচনাটুকুও দেখবার মত।

তা হৃদয়বান বাপের হৃদয়ের অবদান সেই ঠাকুরঘরকে বন্দনা যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। ঘরের দাম উসুল হয়ে গেছে বলা যায়। সেই চব্বিশ বছর বয়েস থেকে এই চল্লিশ পর্যন্ত ও ঘরের হাজরে খাতায় সই করে আসছে বন্দনা অব্যাহত ধারায়। দিনে দু'বার।

প্রথম প্রথম অবশ্য দিনে একবারই।

শুধু সন্ধ্যায়।

সকালবেলা স্নান সেরেই 'পুজোর ঘরে যাচ্ছি' বলতে বড় লজ্জা ছিল বন্দনার। তাই যেতে পারত না। খুব একটা ইচ্ছেই কি হতো?

এই গৃহিণীহীন সংসারের দায়িত্ব তো তার উপরেই ছিল চিরকাল, শৈশবে মাতৃহীন মাত্র বছর চারেকের ছোট ভাইটাকেও সেই ক্ষুদ্র দিদি মাতৃস্নেহ দিয়ে আগলে এসেছে বরাবর। মাঝে চার পাঁচটা বছর এই অভ্যস্ত জীবনধারায় ছেদ পড়েছিল, নতুন আর এক পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছিল বন্দনা, নতুন আর এক সূর্যের।

তবু সোমেনকে মাঝে মাঝেই নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছে, সোমেনের 'দিদি অন্ত' প্রাণ বলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের দীর্ঘ অবকাশটা পুরোপুরিই কাটিয়ে এসেছে সোমেন দিদি-জামাইবাবুর কাছে রাঁচীতে।

তারপর তো কবে যেন দিদিই ফিরে এল আবার পুরনো কেন্দ্রে।

তা সেই চিরকালের দায়িত্বগুলোও অতএব অনিবার্য নিয়মে বন্দনার উপরই আবার এসে বর্তাবে, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে।

সকালবেলা তাই পূজোর ঘরে যাবার অবকাশ হতো না তখন তখন।

সন্ধ্যার দিকে সংসারের কাজ যখন ঢিমে হয়ে আসতো, সোমেন বেড়াতে বেরিয়ে যেত, আর বাবার তাস খেলার আসরের বন্ধুরা এসে হাজির হতো, নিজেকে তখন কেমন যেন অবান্তর মনে হতো বন্দনার।

শুধু এই সংসারেই নয়, যেন এই পৃথিবীতেও।

তখন সেই অর্থহীন অবান্তর 'নিজে'টাকে নিয়ে পূজোর ঘরে উঠে আসতো বন্দনা।

আলো জ্বালাত না, বেদীর উপরকার রুপোর সিংহাসনটা তাই চোখে পড়ত না। জানলাগুলো দিতো খুলে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকেরই। উদ্দাম হাওয়ায় ঘরটা যেন লুটোপুটি খেতো, আর কলকাতার সেই হাওয়াটাই রাঁচীর হাওয়ার স্বাদ এনে দিতে পারে কিনা তাই ভাবতে চেষ্টা করতো বন্দনা।

সেই উদ্দাম এলোমেলো পাহাড়ী-পাহাড়ী সুরে ভরা স্বাদ।

সেই পাহাড়ী সুরের ছন্দ ভেঙে যেত হঠাৎ হঠাৎ তাসের আড্ডার হাসির হর্‌রায় ? আর হঠাৎ হঠাৎই মনে হতো বন্দনার, তার মা মারা গেছেন কত বছর হল ? পনরো ? ষোলো ? না বোধহয় আরো বেশি। সেই তখন থেকে আসছে ওরা। বাবার ওই বন্ধুরা। বাবার মন ভাল করাতে।···আচ্ছা, এই এত এত বছর ধরে ওরা এইভাবে হাসছে ? ওদের কি তবে বয়েস বাড়ে না ?

বাবার বয়েসটার কথা মনে পড়ে না বন্দনার, বাবার বন্ধুদের কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু আশ্চর্য, বন্দনার বাবার ওই বন্ধুরা সবাই থেকে গেলেন, বন্দনার বাবাই কোন ফাঁক দিয়ে উপে গেলেন।···

ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে সমস্ত তোড়জোড়, হঠাৎ কোনোখানে কিছু না—

কনে দেখাদেখির সময় বন্দনা হেসে হেসে বলতো—'অত পরমা-রূপসী খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন বাবা ? বৌ অতি সুন্দরী হলে ছেলেটা তোমার গোল্লায় যাবে।'

বাপ বলতো, 'সোমেন কি আমার তেমন ছেলে ? একটা মাত্র বৌ করবো, লোকে যাতে বাহবা দেয় তা করবো না ?'···তখন আর হাসত না বন্দনা। মনে মনে বলতো—'তোমার জামাই দেখেও তো লোকে বাহবা করেছিল বাবা ?' মনে মনে বলতো। মুখে বলতো না।

আসল কথা—অতি সুন্দরী সম্পর্কে একটা ভয় ছিল বন্দনার। 'অতি সুন্দরী না পায় বর' এ প্রবাদ মজ্জাগত।···শেষ অবধি অবশ্যি অতি সুন্দরী জোটে নি, তবে একরকম রূপসীই বলা চলে বৌকে।

কিন্তু এ ভিটেয় সেই বৌয়ের পদার্পণ তো দেখে যেতে পেলেন না ভদ্রলোক। পাকা দেখার পরদিনই হঠাৎ জ্বরে পড়লেন, আর ক'দিন পরেই—

বন্দনা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখ সোমু, বাবা যদি নিজে হাতে

করে 'আশীর্বাদ' করে না যেতেন, কক্ষণো ওই মেয়েকে ঘরে আনতাম না আমি। ওর 'পয়' ভাল নয়।'

সোমেন অবশ্য 'পয় অপয়' মানে না, তবু সোমেনেরও নিশ্বাস পড়েছিল, কিন্তু ঘরে আনা না-আনার প্রশ্ন আর ওঠে নি। বাপের মৃত্যুর ছ'মাস পরে বিশেষ ব্যবস্থায় সপিণ্ডীকরণ সেরে নিয়ে বিয়েটা দিতে হয়েছিল।

বোধ হয় ওই বিয়েটার পর থেকেই সকালবেলাও পুজোর ঘরে যাওয়া ধরেছে বন্দনা। তা' সেও তো হয়ে গেল ক'বছর। তবু সকালে মনস্থির হয় না, সকালে বহুবিধ করণীয় কাজের চিন্তা মনকে পিছু থেকে টানে, তাড়াতাড়ি নেমে আসে বন্দনা। অধিকক্ষণ থাকে সন্ধ্যায়।

সোমেন কতক্ষণে অফিস থেকে ফিরবে বলে অস্থির হয়ে বেড়াবার দরকার হয় না এখন আর, তার চা-জলখাবার খাওয়ার সময়টাও উপস্থিতি না দিলে চলে। হয়তো বা না-দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই এই সন্ধ্যাটায় অনেকক্ষণ বসে থাকে। এখনো কি অন্ধকারে বসে সব জানলা খুলে দিয়ে উদ্দাম হাওয়ার মধ্যে পাহাড়ী-পাহাড়ী স্বাদ খুঁজতে চেষ্টা করে বন্দনা?

কে জানে! বোঝা যায় না। এখন তো ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। এ দিকের জানলাটাও কবে থেকেই যেন বরাবরের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, ছোট্ট একটা বইয়ের শেলফ ঠেসিয়ে রাখার জন্যে।

বন্দনার রাঁচীর বাড়ির বইগুলো কবে একদিন খুঁজে নিয়ে আলাদা করে এইখানে তুলে এনে রেখেছে সে। তা ছাড়া দক্ষিণের জানলা চেপে মস্ত একটা ম্যানসন উঠেছে কাদের যেন। হাওয়া ঢোকবার পথ কমেছে।...

কিন্তু সে নিয়ে কোনদিন কোনো অভিযোগ তোলে না বন্দনা। ওই ম্যানসনটা ওঠার পর সোমেন বলেছিল, 'দিদি তোমার পুজোর ঘরে

একটা ফ্যান লাগানো তো এবার বিশেষ দরকার। নইলে কোনদিন না কোনদিন দম বন্ধ হয়ে মরে থাকবে!'

বন্দনা সংক্ষেপে বলেছিল, 'পাগল!'

'অন্ততঃ একটা টেব্‌ল ফ্যান—'

'আরে বাবা না!'

সোমেনের বৌ ইন্দ্রাণী হেসে উঠে বলেছিল, 'পূজোর ঘর তো কৃচ্ছ্রসাধনেরই জায়গা বাবা, সেখানে আর ওসব কেন? তোমার সবই অধিকন্তু!'

বন্দনা কিন্তু এই হাসির কথাটায় উত্তর দেয় নি সেদিন, চলে গিয়েছিল নিজের কাজে। টেব্‌ল ফ্যানটা অবশ্য হয় নি। সোমেনও ভুলে গিয়েছিল।

তা' সোমেন কি আর চিরদিন সব মনে রাখবে? সব মনে রাখবার দায়িত্ব নেবে? পাঁজীতে কবে বলবে আজ একাদশী, কবে বলবে আজ জন্মাষ্টমী, সেই সব ছেলেমানুষী কথা? দিদির ঘরের জানলা আটকে বাড়ি উঠেছে বলে দিদির গরম হওয়ার মত একেবারে সাধারণ একটা কথা?

সে হয় না। সেটা হওয়াতে যাওয়াটা ফাঁকি। কৃত্রিমতা। তবে সমগ্র সংসারটা তো দিয়ে রেখেছে সোমেন দিদিকে! আজো বন্দনার পদ্ধতিতে সংসার চলছে, বন্দনার নির্দেশেই লোকজন খাটছে। বন্দনাই জানে কোন্ বেলা কি রান্না হবে, কোন্‌দিন কি বাজার আসবে, বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে তাদের আপ্যায়নের সীমাটা কতখানি বিস্তৃত করতে হবে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ির কাজে কর্মে মান বজায় রাখতে লৌকিকতার মান কোথায় কোন মাত্রায় তুলতে হবে।

বন্দনাই জানে, কোন্ চাকরটাকে রাখা উচিত, কোন্ ঝিটাকে ছাড়ানো উচিত। বন্দনাই জানে, তাদের কাকে কত মাইনে দিতে হবে। সংসারে মাস গেলে ক'সের তেল লাগে, ক'মণ কয়লা, সেকথা সোমেন তো দূরস্থান, ইন্দ্রাণীও জানে না।

জানবার চেষ্টাও করে না।

জানে, দিদি বুঝবেন।

দৈবাৎ বন্দনা বাড়ি না থাকলে, কি পুজোর ঘরে থাকলে, বামুন-ঠাকুর যদি এসে আবেদন জানায় উনুনটা জ্বলে যাচ্ছে, বৌদি কি বলে দেবেন কি রান্না হবে ?

ইন্দ্রাণী হাত উল্টে হেসে উঠে বলে, 'আমি ? আমি বাবা তোমাদের ওসবের কিছুই জানি না। উনুনে কয়লা ঢেলে বসে থাকো।'

যদি চাকরটা দৈবাৎ ওই ধরণের অবকাশে বৌদির কাছে আবদার জানাতে আসে, 'ছ'ঘণ্টার জন্যে একটু ছুটি দেবেন বৌদি ?'

ইন্দ্রাণী শিউরে ওঠার ভঙ্গীতে বলে, 'রক্ষে কর বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। শেষে তোমাদের দিদিমনি এসে ফাঁসি দিন তোমায় !'

চিরকেলে বনেদী বাড়িতে বারোমাসে তেরো পার্বণের ঘটা লেগেই আছে। আছে লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাসে মাসে সত্যনারায়ণ, তার সব কিছু ব্যবস্থাপনাই বন্দনার।

অবশ্য গৌরবের আসনটিও বন্দনার জন্যেই থাকে…পূজান্তে 'আশীর্বাদী নির্মাল্য' আগে বন্দনার হাতেই দেন পুরোহিত।

প্রকৃত কথা, সংসার-চক্রের এই মূলকেন্দ্রে আজও প্রায় নতুন কনের ভূমিকাতেই আছে ইন্দ্রাণী।

বাড়ির মধ্যে শুধু নিজের শোবার ঘরটিতে ছাড়া আর কোনো ঘরে মাসান্তে ক'বার পা ফেলে ইন্দ্রাণী সেটা বোধহয় আঙুলে গুণে বলা যায়। জীবনতরী পানসির গতিতে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, তত আরো বেশি সাজতে শিখছে, আরো রঙ্গময়ী হচ্ছে। হচ্ছে, তার কারণ অনেক জায়গায় যাচ্ছে। অনেকের সঙ্গে মিশছে।

একটা যে মেয়ে হয়েছে তার, তাও যেন গায়ে বয় না। বছর দেড়েকের সেই মেয়েটা থাকে ঝিয়ের কাছে, খায় ঘুমোয় পিসির কাছে।

বন্দনা বলে, 'তোর বাবাকে আমি এই রকম করে মানুষ করেছি বুড়ো! খাইয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি, গল্প বলেছি—'

ইন্দ্রাণী শুনতে পেলে বলে, 'ওমা! তবে যে শুনি মাত্র চার বছরের ছোট-বড়।'

বন্দনা জোর দিয়ে বলে, 'তাই তো! যা শুনেছ তা কি আর ভুল? সেই চার বছরের সিনিয়রিটি নিয়েই দিদির মহিমা দেখাতে ছাড়ি নি।'

'ভালই হয়েছে' ইন্দ্রাণী হেসে খানখান হয়, 'আপনার যখন অভ্যাসই আছে, এটাকেও বেশ চোস্ত করে মানুষ করে ফেলুন! যেমন ওর বাপটাকে করেছেন!'

কথাটা বন্দনার কানে খুব শ্রুতিমধুর লাগে না, তবু প্রায় হেসেই বলে, 'বালাই ষাট, ওকে কেন আমি মানুষ করতে যাবো?'

'তা' ওটাও ত মাতৃহীন!'

বন্দনা ভুরু কুঁচকেছে, 'যা তা বল কেন বৌ? কিছু কি মুখে আটকায় না?'

মন হাল্কা থাকলে 'ইন্দ্রাণী', মন ভার থাকলে 'বৌ!'

ইচ্ছে করে বলে না, অজ্ঞাতসারেই বলে।

কিন্তু 'ইন্দ্রাণী'টা কি খুব বেশি বলে?

বিয়ের সময়কার সেই 'পয়া অপয়ার' প্রশ্নটা কি কোথাও বিঁধে আছে? মনের একান্তে? তাই আগে যে স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে অপেক্ষা করেছিল সোমেনের বৌয়ের জন্যে, সেটা ওই কাঁটায় এসে ঠেক খায়?

নাকি ইন্দ্রাণীর ওই বেপরোয়া অথচ 'খুকী-খুকী' ভাবটা ওই ঠেক খাওয়ার জন্যে দায়ী?

অবশ্য এমন কিছুই নয়।

হাসি গল্প, মেয়েটাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ সবই আছে।

সংসার-চক্রের যেটি প্রধান তেল সেটি তো প্রচুর পরিমাণেই আছে।

কলকাতার একেবারে সেরা সেরা পাড়ায় বন্দনার বাবা যে ভাড়াটে বাড়িগুলি বানিয়ে রেখে গেছেন, তার উপস্বত্বেই অনায়াসে অক্লেশে চলে।

এই সমস্ত কিছুরই হিসেবপত্র বন্দনার হাতে। বাবার আমল থেকেই আছে। সোমেন কোনদিন জানতেও চায় নি, কত আয়, কত ব্যয়। বন্দনা সর্বময়ী কর্ত্রী।

এই প্রাধান্যের সিংহাসনে বন্দনার স্থান। আশ্চর্য, তবু বন্দনা আজকাল প্রায় ঠাকুরের সেই রুপোর সিংহাসনটাই টেনে নামিয়ে ঝাড়ে মোছে। অকারণ অনেকটা সময় নিয়ে মেজে চকচকে করতে বসে।

আর এখন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, অনেকগুলো দিন তো রাঁচীতে কাটিয়েছিল সে, অনেকখানি জীবন, সে জীবনে কেন একটা শিশুর পদস্পর্শ পড়ে নি।...

চব্বিশ বছর বয়সে বন্দনা যে যখন তখন ভাবতো 'ভাগ্যিস! ভাগ্যিস শুধু একা আমি নিজে! তা নইলে? উঃ কী ভারাক্রান্ত, কী নাগপাশের বন্ধন!' সে কথা এখন কী অদ্ভুতভাবেই ভুলে গেছে বন্দনা! ভুলে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই 'ভাগ্যিস'টা, তাই এই চল্লিশ বছর বয়সে একটা না-পাওয়া ঐশ্বর্যের বিরহবেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে এক একদিন।

এই রকম দিনে দক্ষিণের জানলা চেপে ফেলা ওই বিরাট 'ম্যানসন'-টাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে বন্দনার।...যেমন আজ করছিল। ওদের গালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তারপর মনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে সেই উদ্বেল মন শান্ত হয়ে এল, স্নিগ্ধ হয়ে এল, নম্র গভীরতায় পবিত্র হয়ে উঠল।

নিজেকে একটি পূজার ফুল মনে হ'ল।

সেই মনটি নিয়ে নেমে আসছিল বন্দনা, নীচের তলায় দৃশ্যটা বোধকরি বিস্মৃত হয়েই।

তাই নীচের তলায় পা ফেলা মাত্র মনটা তীব্র একটা মোচড় খেয়ে ফুল থেকে বিষ হয়ে উঠল।

নীচতলা মানে দোতলা।

বাড়িটা দোতলাই।

একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাওয়ার ঘর, বৈঠকখানা ঘর ইত্যাদি করে অনেকখানি বিস্তৃত। দোতলায় তাদের মাথা জুড়ে শোবার ঘর, বসার ঘর, আরো অনেক ঘর।

ছাদে ওই একটাই।

ছাদের থেকে নেমে এসে সামনেই যে ঘরটা চোখে পড়ে সেটাই হচ্ছে সোমেন-ইন্দ্রাণীর শোবার ঘর। সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে হাওয়াদার।

সবচেয়ে সাজানোও।

কিন্তু কী বিশ্রী! কী কুশ্রী!

কী দৃশ্য করেই রেখে যায় ওরা ঘরটাকে বেরোবার সময়! যেটা বন্দনার একেবারে অরুচিকর।

মেয়েমানুষ, বৌমানুষ, তার কাজের মধ্যে একটা শোভনতা থাকবে না? শালীনতা থাকবে না? যা-খুশির কী একটা সীমা থাকবে না?

আগুনজ্বলা চোখে দৃশ্যপটটার উপর আর একবার চোখটা বুলোল বন্দনা।···দেখল ঘরের সীলিঙে ঝোলানো দু' দুটো আলোই জ্বলে যাচ্ছে চড়া পাওয়ারের বাল্‌ব্‌কে অবলম্বন করে। আর সেই প্রখর আলোয় ইন্দ্রাণীর 'ছাড়া শাড়ি'খানা নির্লজ্জের মত মেজেয় লুটিয়ে পড়ে আছে। পড়ে আছে ছেড়ে-রাখা রঙিন সায়াটা, সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো পাউডার, বাড়িতে চলে ফিরে বেড়াবার চটি জোড়াটা দরজার কাছে উপুড় হয়ে পড়ে, আর যতগুলো শিশি কৌটো টিউব তুলির সদ্ব্যবহার করে গেছে সে নিজের মুখে ছবি আঁকতে, সেগুলো খাটের বিছানার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অথচ ঘরে 'মানুষ প্রমাণ' ড্রেসিং আয়না আছে, আছে তার

ভেলভেটের গদিদার চৌকী। যেখানে যা দরকার সবই নিখুঁত নিয়মে সাজানো আছে এ বাড়িতে। তবু ইন্দ্রাণী সারাঘরে ছুটোছুটি করে সাজে, শাড়িগুলো আলনায় না রেখে ঝুলিয়ে রাখে খাটের বাজুতে, সোফার পিঠে।...যতগুলো পারে তোয়ালে ব্যবহার করে, আর যেখানে সেখানে ফেলে রাখে ভিজিয়ে ভিজিয়ে।

দেড় বছরের বাচ্চাটার তো দেড়শো রকম জিনিস! সেগুলো যেখানে ইচ্ছে সেখানে। সারাদিন শুয়ে বসে কাটাবে। আর সোমেন বাড়ি ফিরলেই চোখে কানে দেখবে না আর, বেরোতে পারলে হয়।

বন্দনার ইচ্ছে করে নেমে এসে সোমেনকে একটু দেখবে, ঢুটো কথা বলবে। তার মেয়ে কি কি গুণপনা শিখেছে, তাকে শোনাবে, আর যাত্রাকালে বলে নেবে 'বড্ড রাত করিস না বাপু!'

কিন্তু প্রতিদিন নেমে এসে এই দৃশ্য। আগুনজ্বলা মাথা নিয়ে একতলায় নেমে গেল বন্দনা, আর আরও খানিকটা আগুন হল।

অথচ নতুন কিছুই তো নয়।

এ সময়ের অবস্থা তো ঠিক এই থাকে। অন্ততঃ প্রায়ই থাকে।

বুড়ো ঝি সারদা সোমেনের মেয়েটাকে কোলে ফেলে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় ব্যাপৃত, নতুন ঝি বীণা রান্নাঘরের দরজায় পা ছড়িয়ে বসে রাঁধুনী ঠাকুরের সঙ্গে রহস্যালাপে মগ্ন, সিঁড়ির তলার ঘরে চাকরবাবু চৌকীতে গা ঢেলে বুকের উপর 'রহস্যরোমাঞ্চ' রেখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থিত এবং খুদে চাকর গণেশটা দালানে গুটিসুটি মেরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সারা সংসারটা যেন গতির বেগ হারিয়ে নিশ্চিন্ততার স্বাদে নিথর হয়ে গেছে।

রোজ, রোজই পুজোর ঘর থেকে নেমে এই দৃশ্য দেখে বন্দনা।

এই হাড়-পোড়ানো চোখ-জ্বলানো দৃশ্য। এছাড়া আর কি দেখবে? সংসারের সদস্য বলতে আর কে আছে যে, তারা বাড়িটাকে গুলজার করে রাখবে?

সংসারে লোক নেই, 'লোকজন' আছে একগাদা। বন্দনার বাবার ব্যবস্থা এটা।

তিনি বলতেন, 'তবু ওরাই নরক গুলজার করবে, ওরাই খাবে মাখবে ভোগ করবে। মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ একা খেলে শুকিয়ে যায়।'

অতএব অপ্রয়োজনের মসৃণ দেওয়ালে অকারণ প্রয়োজনের খাঁজ কেটে কেটে কতকগুলো অবান্তরকে 'প্রয়োজনীয়'-এর ভূমিকায় বসানো হয়েছিল, আজও সে পদ্ধতি কায়েম আছে।

তবে বন্দনার বাপের আমলের মত এখন আর বামুন-চাকুর-ঝিয়েরা মিলে নরক গুলজার করে না তেমন। এযুগের হাওয়ায় ওরাও সভ্য হয়ে গিয়েছে। কম কথা কয়ে থাকতে শিখেছে। বাড়ির ঠাণ্ডা-মেরে যাওয়া ভাবটা রদ করা যাচ্ছে না।

অথচ সন্ধ্যাবেলা এই ঘুমন্তপুরীর স্তিমিত শান্তির দৃশ্য দেখলেই ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় বন্দনার। প্রতিদিন দেখছে, তবু সয়ে যাচ্ছে না।

তবু দেখেই মনে হচ্ছে—'আসুক একবার।'

ক'দিন আগে এই উপলক্ষেই সোমনের সঙ্গে ছোটখাটো একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। অবশ্য একা সোমেনের সঙ্গে কোনো কথাই এখন আর হয় না। হবার 'জো'ও নেই।

সোমেন-বন্দনা কথা কইলেই ইন্দ্রাণী ঠিক এসে দাঁড়ায়, আর ঠিক ত্ব'জনের কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটে।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

তবু কথাগুলো বন্দনা সোমেনকে উদ্দেশ করেই বলেছিল।

বলেছিল, 'তোর চেহারাটা যে কেমন তাও যে ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি রে সোমা, অফিস থেকে ফিরে একদণ্ড বাড়িতে তিষ্ঠোতে ইচ্ছে করে না? ইচ্ছে করে না বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করি?'

সোমেন অপ্রতিভ হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হয়তো বা ইন্দ্রাণীর দিকে কটাক্ষপাত করে পরিহাসচ্ছলে বলতো, 'তিষ্ঠোতে দেয়

কই ?' হয় তো বা বলতে যাচ্ছিল, 'এসময় কী-ই বা করবো, খাওয়া দাওয়ার তো দেরি—'

কিন্তু ওর আগেই কথা কয়ে উঠেছিল ওর কর্ণধার।

'বাড়ির লোকেরই যেন চেহারাটা মনে রাখবার জন্যে ঘুম হচ্ছে না! পুজোয় বসে তো সমাধিস্থ!'

বলেছিল অবশ্য রূঢ় ভাষণে নয়, শ্লেষাত্মক সুরেও নয়, হেসে হেসেই, তবু বন্দনার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। এবং ইন্দ্রাণীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সোমেনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'বাড়িটা যে দিনদিন ভূতের বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যাবেলার চেহারা দেখেছিস ? নীচে নেমে গা ছমছম করে।'

ইন্দ্রাণীকে অগ্রাহ্য করাটা সোমেনের চোখ এড়ায় নি, তবে সে নিয়ে অভিযোগও করে নি, শুধু মৃদু হেসে বলেছিল, 'তা' মাত্র দুটো মানুষে তোমার এই ভৌতিক বাড়িকে কত আর মানবিক করে তোলা যাবে ? বাবার মত তা'হলে তাসের আড্ডা বসাতে হয় বাড়িতে।'

বাবার তাসের আড্ডাকে কোনদিনই সুচক্ষে দেখত না সোমেন, আজ এতদিন পরে তাই তাসের আড্ডার দৃষ্টান্তটাই মনে পড়ে গিয়েছিল তার।

তাসের আড্ডার উল্লেখে বন্দনা ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, 'সেকেলে লোকেরা জগতের এত রকম তো জানতো না, মন 'খাঁ খাঁ' করলে তাই তাসের আড্ডা বসাতো। কিন্তু তোর তো সে প্রশ্ন নেই—'

একবার অবহেলিত হয়েও ফোড়ন কাটতে ছাড়ে নি ইন্দ্রাণী, হেসে বলে উঠেছিল, 'তা ঠিক, দিদির যুক্তির কাছে পরাস্ত হতেই হবে তোমাকে। তোমার তো আর বৌ মরে নি, তবে কি জন্যে—'

এবার বন্দনা অবহেলা না করে ওর দিকেই তীব্রদৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি বৌ, দুজনকেই বলছি,—'তবে কি জন্যে ? কি জন্যে এমন 'পালাই পালাই' কর তোমরা ? তোমাদের যে একটা বাচ্ছা আছে, সেটাও তো তোমাদের আচরণে ধরা পড়ে না।'

'আমাদের কোথা ?'

ইন্দ্রাণী হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, 'ওটা তো আপনার। আমি তো ঠিক করে রেখেছি কথা বলতে শিখলে আমাদের 'মামা-মামী' বলতে শেখাব !'

বন্দনা আর কথা বলে নি।

বন্দনা এই বাচালতার সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

শুধু মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

হয় তো মুখের সেই কাঠিন্য মনের মধ্যে কায়েমী আসন নিতো, কিন্তু পর পর দু'তিনটে দিন, কী ভাগ্যিস, ওরা অন্য রকম করেছিল।

বন্দনা পুজোর ঘর থেকে নেমে এসে দেখতে পেয়েছিল, ওরা মেয়েটাকে সারদার কাছ থেকে এনে নাচাচ্ছে এবং দু'জনের হাসির হুল্লোড়ে ঘর গমগম করছে।

কত মধুর, কত সুন্দর !

এ ওদের ভাল লাগে না ?

ওদের এই প্রাণপ্রাচুর্য সবটুকু বাড়ির বাইরে খরচ করে আসতে ইচ্ছে হয় ? এই আমোদ, এই হাসি, এ যে দেয়ালে দেয়ালে ধরা থাকে, এর শক্তি যে ইট-কাঠেও সঞ্চিত হয়, সে কথা কি ওরা জানে না ? বুঝতে পারে না ?

বন্দনা নামতেই সোমেন মেয়েটাকে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, 'যা, এবার নিজের লোকের কাছে যা ! বুঝলে দিদি, আমাকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বিলকুল পর ভাবে।'

বন্দনা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে উত্তর দিয়েছে, 'তার জন্যে বেশি আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। যথাসময়েই আমে-দুধে মিশে যাবে।'

হ্যাঁ, এই বাঁকা কথাটাই বলেছিল, তবু মনে হচ্ছিল মুখের পাথুরে মেঘটা কেটে গেছে।

সোমেন সেদিকে বোধ করি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছে,

'আচ্ছা দিদি, তোমার ঠাকুরঘরটা তো অনেকদিন হোয়াইট-ওয়াশ হয় নি, মনে হচ্ছে—'

বন্দনা হেসে উঠেছে, 'ও বাবা, ঘরবাড়ির মত তুচ্ছ ব্যাপারে দেবার মত সস্তা মন তুই আবার হঠাৎ যোগাড় করলি কি করে? তোর আবার এসব মনে থাকে না কি?'

'বাঃ কি ভাবো তুমি আমায়?' সোমেন বেশ সতেজের ভানে বলে, সেই সেবার তুমি যখন কি যেন যোগে কাশী গিয়েছিলে, আমি তোমার বাড়িটা সমস্ত রং করিয়ে রাখি নি?'

কথাটা সত্যি, ইন্দ্রাণী যখন 'আসন্ন' অবস্থা নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, তখন বন্দনা বলেছিল, নতুন বংশধর আসবে, প্রথম ঢুকবে, বাড়িতে রং লাগানো হোক।

সোমেন রেগে রেগে বলেছিল, 'হোক মানে? নিজে তো চললে পুণ্যি করতে!'

'আহা তা' যাবো না? এরপর তোর ছেলে হলে, আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারবো? কেন তুই পারবি না দেখে-শুনে মিস্ত্রী লাগাতে?'

সোমেন দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

'হাতজোড় করলি যে?'

বলেছিল বন্দনা।

সোমেন হেসে বলেছিল, 'ঠিক ওটা ছাড়া আর কিছু মনে এল না।'

'রোস তো, তোর চালাকি বের করছি! এত বড় ছেলে হলো, বাবা হলেন, কিচ্ছু কর্মে নেই। তোকে করাতেই হবে।'

এই হুকুম দিয়েছিল। তবে মিস্ত্রী ঠিক করে এস্টিমেট কষে, মালমসলা আনিয়ে রেখে, ক'দিনের জন্যে তবে কাশী গিয়েছিল বন্দনা। তা' এসে প্রসন্নই হয়েছিল সোমেনের কার্যকারিতায়।

সেই কথা তুলেছে সোমেন।

বন্দনা হেসে উঠেছে সে কথা শুনে।

বলেছে, 'উঃ! একখানা রেকর্ড!'

বলেছে, 'দোহাই বাবা, আমার পুজোর ঘরে আর তোমার মিস্ত্রী ঢোকাতে হবে না, বেশ আছে।'

এই পুজোর ঘর সম্পর্কে চিন্তাটা যে চিন্তামাত্রই নয়, কেবলমাত্র দিদিকে একটু প্রসন্ন করার চেষ্টা, সে কি আর বুঝতে পারে নি বন্দনা? পেরেছে এবং সোমেনের উদ্দেশ্যটা ঠিকই সিদ্ধ হয়েছে। প্রসন্ন হয়েছে বন্দনা।

মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলেছে, 'দেখ বুড়, তোর বাবা এবার 'মানুষ' হচ্ছে!'

ইন্দ্রাণী অবশ্য সে প্রসঙ্গে বলে উঠেছিল, 'ওটা আপনার মিথ্যা স্বপ্ন দিদি, স্রেফ 'মরীচিকা'। ওই বস্তুটি কোটি-কল্পকালেও 'মানুষ' হবে না। যা বানিয়েছেন তাই থাকবে!'

বন্দনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, তবু বন্দনা সেদিন পরিবেশ নষ্ট করে নি। তবু হেসে হেসে বলেছিল, 'তা' তাই থাকাই উচিত, যার জন্যে বানিয়েছি তার উপযুক্ত হওয়াই তো দরকার!'

শাশুড়ী নয়, ননদ। ঠাট্টার সম্পর্ক!

অগাধ কিছু বড় নয়, বরের থেকে মাত্র বছর-চারের বড়। ঠাট্টা তামাসা চলতেই পারে। চালিয়েছে কিছুক্ষণ। তারপর ওরা প্রায় অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গীতে 'জানান' দিয়ে বেরিয়েছে একটু।

কিন্তু এই হোগলার ঘর কতক্ষণ? এ ঘরের পরমায়ু তো এতটুকু বাতাসেই ফুরোয়। তাই দিন-তিনেক পার হতেই যে-কে-সেই।

আবার আজ বন্দনার রক্তে আগুন। তাই অভ্যস্ত দৃশ্যও অসহ্য লাগল।

বন্দনাকে নামতে দেখেই বীণা পা গুটিয়ে বসে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলে ওঠে, 'কি ঠাকুর, আর কয়লা চাই, চাই তো—বল।'

তবে ঠাকুরও দিদিমণির সাড়া পেয়ে কড়া-খুন্তিতে এত সাড়া তুলেছে যে, বীণার বীণানিন্দিত কণ্ঠ তার কানে যায় না। বরং শব্দটা আরো বাড়ায়।

বন্দনা তীব্র কটাক্ষে সেদিকটা একবার দেখে নিয়ে চেপে ধরে সারদাকে।

'এই সারি, ওটাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিস যে? খাবে না?'

সারদা তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'দুধ তো খেয়েছে—'

'দুধ খেয়েছে তো—হয়ে গেছে? কাল বলেছি না, রাতে একটু করে রুটি ধরাতে হবে, সন্ধ্যাবেলা ঘুম পাড়াস নি! বিস্মরণ হয়ে গেছ সে কথা?'

সারদা বিড়বিড় করে বলে, 'কাঁচা ছেলে রাত্তির আটটা অবধি জেগে থাকতে পারে?'

'কি বলছিস বিড়বিড়িয়ে লক্ষ্মীছাড়ি?'

বলা বাহুল্য পুরনো লোক বলেই এ হেন মধুর সম্বোধনের সাহস! নতুন লোক হলে 'লক্ষ্মীছাড়ি' শুনলেই বলবে, 'তবে তোমার বাড়ি ছাড়ি।'

তবে সারদাই কি আর খুব একটা প্রসন্ন হল? হ'ল না।

সারদা একটু চড়া সুরেই বলে উঠল, 'বিড়বিড়িয়ে বলব কেন, পষ্ট করেই বলছি, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। বৌদিদি ননদের ওপর 'আকোচ' করে বাচ্চা ফেলে বেড়াতে বেরিয়ে যাবে, তুমি ভাজের ওপর 'আকোচ' করে তিন ঘণ্টা ঠাকুরঘরে বসে থাকবে, এদিকে বাচ্চাটারই প্রাণ যায়।'

'কি বললি?'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বন্দনা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি আক্রোশ করে ঠাকুরঘরে বসে থাকি?'

সারদা এদের বাড়ির অব্যবস্থায় ক্রমশঃই বেজার হচ্ছিল ইদানীং।

রাতের খাওয়া-দাওয়া হবে রাত-দুপুরে। শুতে আরও রাত! কেউ ডেকে একটা কথা শুধোয় না, সন্ধ্যে থেকেই তো বাড়ি ঘুমন্তপুরী, হাই তুলতে তুলতে প্রাণ যায়। দূর ছাই পুরনো বাড়ি!

'দূর ছাই' যাক গে, ভাবলেই মন বেপরোয়া, তাই সে বেপরোয়া বেজারের সুরে উত্তর দেয়, 'তা কি করতে বসে থাকো তুমিই জানো। আমরা চর্মচক্ষে যা দেখছি তাই বলছি। এই নাও মেয়েকে, কেমন খাওয়াতে পার খাওয়াও।'

বলে সহসা সেই প্রায়-ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোল থেকে তুলে ঠুকে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু দেওয়াতেই তো ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা তার প্রতিশোধ নেয়। অর্থাৎ নেওয়া শুরু করে।

শিশু যে 'অবলা' 'অসহায়' 'বেচারী' জীব এ থিয়োরিকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' প্রমাণিত করে দিয়ে সে তার বিধাতা-দত্ত দুর্দান্ত সহায় শক্তি নিয়ে লেগে যায় বীর বিক্রমে।

চীৎকার! চীৎকার! তার উপরে চীৎকার! থামবার লক্ষণমাত্র নেই।

একেই তো এই ব্যাপারটা অসহ্য।

শিশু যে 'বেচারী' মাত্র নয়, এটা ঠিক প্রমাণিত করতে শিশু যখন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সেটা যে প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তা কার অবিদিত? অতি সহ্যশীল ব্যক্তির অতি শীতল মস্তিষ্কও ক্ষেপে যেতে পারে সেই প্রতিশোধ-পরায়ণতায়! তার উপর যদি এ-হেন একটা অসম্মানজনক কারণে সেটা ঘটে, কে পারে মাথা ঠিক রাখতে?

বন্দনা মেয়েটাকে থামাবার কৌশল প্রয়োগ না করে যা কখনো করে নি, তাই করে বসে।…'চুপ কর্, চুপ কর্ বলছি পাজি মেয়ে—' বলে সশব্দে দুটো চড় বসিয়ে দেয় তার পিঠে।

হয়তো শুধু মেয়েটার ওপরই ক্ষেপে গিয়ে নয়, সারদাকে যে তার এই দুঃসাহসিক স্পর্ধার উপযুক্ত তিরস্কার করা যাচ্ছে না, 'দূর হয়ে যা এখুনি, বেরিয়ে যা এই দণ্ডে—'এসব বলা যাচ্ছে না, সেটাই হয়তো মেজাজচ্যুতির প্রকৃত কারণ !

কিন্তু কারণটা কে দেখে ?

এই সংসারচক্রের চক্রান্তে যে যা করছে সেই কাজটাই দেখে লোকে, কারণটা দেখে না।

দেখতে পায় না বলেই নয় শুধু, দেখতে চায় না বলেই।

'কারণ'টা দেখতে গেলেই তো 'কাজ'গুলো লঘু হয়ে যায়, অপরাধগুলো গুরুত্ব হারায় !

তবে ?

কে চায় কারণ আবিষ্কার করে তোমার অপরাধকে লঘু করে দেখতে ?

'তুমি এই করেছ।' এটাই শেষ কথা !…বন্দনার ভাগ্যে সেই শেষ কথাটাই চোখে পড়ে গেল ওদের, বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে !

বেদম কান্নার দাপটে একেই গলাটাকে শুকিয়ে তুলেছিল মেয়েটা, তার উপর সহসা চিরস্নেহময়ী পিসির এই অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতায় গলার ওপর শেষশক্তি প্রয়োগ করল সে, আর সঙ্গে সঙ্গেই 'ককিয়ে' উঠে থেমে গেল।

নাটকের এই দৃশ্যের মাঝখানে ওদের আবির্ভাব ঘটল। সোমেনের আর ইন্দ্রাণীর।

বলা বাহুল্য দৃশ্যটা একেবারে অদৃষ্টপূর্ব হলেও বুঝতে এক লহমাও দেরি হল না ওদের। এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে রসটা একবার বিদ্যুদ্‌গতিতে ঢেউ খেলে নিল, সেটা মধুর রস নয়।

'ব্যাপারটা কি !'

সোমেন ছুটে এগিয়ে এলো।

কিন্তু ইন্দ্রাণী যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনে কি এত বড় লজ্জার অবস্থায় পড়েছে বন্দনা?

রাঁচীর সেই বাড়িটা থেকে যেদিন মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন মনে হয়েছিল বন্দনার এর মত লজ্জার অবস্থায় বুঝি ত্রিভুবনে কেউ কোনোদিন পড়ে নি।...

মনে হয়েছিল শুধু বাড়ির দরজা পার হয়ে গাড়িতে ওঠার সময়টুকু যদি ভগবান তার শরীরটাকে অদৃশ্য করে দিতেন!

সেদিন লজ্জাটা ছিল যেন শরীরটাকে নিয়েই। একবার যদি সেই শরীরটাকে কৌতূহলী প্রতিবেশিনীদের চোখ থেকে অদৃশ্য করে নিয়ে গাড়িতে উঠতে পারে, বন্দনা বুঝি তার ভয়ঙ্কর শোকটাকেও সামলে নিতে পারবে।

কিন্তু আজকের এই লজ্জা দেহটাকে নিয়ে নয়।

এ হচ্ছে মনের লজ্জা। বন্দনার অসহিষ্ণু চিত্তের তীব্রতা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে এই লজ্জা!

এত উগ্র অসহিষ্ণু মেজাজ বন্দনার যে, একটা কুসুম-সুকুমার কচি-শিশুকে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে দ্বিধা করে না! পৃথিবী অন্ধকার দেখা চোখে প্রথম মনে হল বন্দনার ওরা হয়তো ভাবল ওদের অনুপস্থিতিতে এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে।

ভাবল। মুহূর্তের জন্যে মেয়েটার অবস্থাও ভুলে গেল। কিন্তু ভুলতে সে দেবে কেন? সে তো সেই হাঁ করে স্তব্ধ হয়েই আছে।

ভয়ঙ্কর জোরে তাকে একটা নাড়া দিয়ে বন্দনা চেঁচিয়ে উঠল 'জল, জল, জল আন না একটু।'

কাকে? কে জানে, হয় তো বীণাকে, হয় তো সারদাকেই!

তারপর?

তারপর সমস্ত পৃথিবীটা কি দুলে উঠল?

কে জানে .

শুধু বন্দনা দেখল মেয়েটা একটা সবল আকর্ষণে তার কোল থেকে চলে গেছে তার বাপের কোলে।…বন্দনা শুনতে পেল একটা অচেনা গলা বলে উঠছে, 'আর জল ঢেলে কি হবে, ওতো হয়েই গেছে!'

গলাটা অচেনা?

হ্যাঁ অচেনা বৈকি।

সেই আলগা আলগা খুকী-খুকী গলা এ নয়। এ গলা তীব্র তিক্ত রূঢ় নিষ্ঠুর।

না, 'হয়ে' অবিশ্যি যায় নি মেয়ে!

জল আনবার আগেই তার হাঁ বুজল।

ঢিমে তেতালায় আর একটা স্বর তুলল।

আর তখন ব্যাপারটা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াই হয়ে দাঁড়াল।

তা হ'লে?

এরপরও কি বন্দনা এতক্ষণে সমস্ত আবেগের বেগ সংহত করে সহজ গলায় বলবে, 'সারদার কথা শুনবি! শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয়।'

না কি আরো হাল্কা গলায় বলবে, 'বাবা, বাবা, সাতজন্মে তোদের মেয়েকে মারি না, একটা দিন মেরেছি, অমনি তোদের চোখে পড়ে গেল!'

সমুদ্র-মন্থনের সমস্ত বিষ হজম করে ফেলে, ওই সহাস্যের ভূমিকাই নেবে? পরিবেশকে আবার পুনর্বাসনে আনবে?…

কিন্তু বন্দনা কি মানুষ নয়?

একদা সে তার রক্তমাংসের দেহটাকে অদৃশ্য করতে চেয়েছিল বলেই কি রক্তমাংস তাকে অব্যাহতি দিয়েছে?

না দেয় নি। রক্তমাংস হচ্ছে সর্বনেশে মহাজন, সে তার পাওনা আদায়ের সময় তাকিয়ে দেখে না কি নিচ্ছে খাতকের! কতটা নিচ্ছে!

কারুর দেখে না, বন্দনারটাই কি দেখবে?

দেখল না।

তাই মেয়েটা সেই স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এল, ফেটে পড়ল বন্দনা।

বলল, 'লজ্জা করে না? লজ্জা করে না তোমাদের? তোমাদের এই সমগ্র সংসারের দায়-দায়িত্ব তো আঠারো আনা চাপিয়ে রেখে দিয়েছ একটা মানুষের মাথায়! তার ওপর আবার একটা কচি ছেলের ঝঞ্ঝাট, তাকিয়ে দেখতে হুঁশ হয় না—সে মানুষটার ক্ষমতার সীমাটা কতদূর। সর্বদা যুগল-মিলন মূর্তি নিয়ে দিব্যি গা ভাসিয়ে—'

না, কথাটা শেষ করতে পারে নি বন্দনা, তার আগেই গলাটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কেন কে জানে, হঠাৎ আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে ওদের দিকে ফেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে আবার একতলা থেকে সোজা তিনতলাতেই উঠে গিয়েছিল সে।···

তারপর কি করেছিল জানে না।

হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছিল।···

কিন্তু এত ঘুমিয়ে পড়ল বন্দনা যে উঠে গিয়ে খেতে বসবার দায়িত্বটাও ভুলে গেল?

ওদের হেঁসেলজাত খাদ্য নয়, তবু বরাবর একসময়েই খায় বন্দনা। চিরকাল তো সোমেনের সঙ্গে খেয়ে এসেছে। আলাদা হলেও এক সঙ্গে।

ওরা তো কই ডাকতে আসে নি!

তার মানে ওরাও খায় নি রাত্রে। মেয়েটাও ওদের ঘরেই শুয়েছিল তা'হলে। অথচ ওর বিছানাপত্র সব বন্দনার ঘরে।

লজ্জায় মনটা 'ছি ছি' করে ওঠে। কি যে ভূতে পেল কাল! সোমেনের বৌয়ের মন্তব্যটা যে কদর্য কুৎসিত জঘন্য, মাথার ঠিক রাখা—

বুদ্ধির ঘরে আশ্রয় চাইল বন্দনা।

বিচলিত হয়েছিল ওরা। বড় বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল। মাত্রাটা

হয়তো একটু বেশিই হয়েছিল। কিন্তু খুব দোষ দেওয়াও যায় না।··· যতই নেচে বেড়াক, মা তো! মায়ের প্রাণ!

আর নতুন মা!

কখনো কিছু দেখে নি। ছোট ছেলে যে অমন করেই থাকে জানেও না হয়তো!

বন্দনা জানে, তবুও তো বন্দনার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল!

ঘটনার সমস্ত গুরুত্ব নিজের পাল্লায় চাপিয়ে আর ওদের পাল্লাটা সম্পূর্ণ হাল্কা করে রেখে নীচে নামল বন্দনা।···মেয়েটা কেমন আছে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলেও একটু লজ্জা করল।···

নীচে নেমে এসে প্রথম বামুনঠাকুরকে প্রশ্ন করল, 'দাদাবাবুরা কাল খায় নি?

'হ্যাঁ খেয়েছেন তো!'

খেয়েছেন!

খেয়েছেন তো!

দাঁড়ি-পাল্লাটা কি কাঁপছে?

সে কি ঝুঁকি বদল করতে চাইছে?

আর কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

দালানে ঝুড়ি-চুবড়ি বিস্তার করে সারদা কুটনো কুটছে।

এ দৃশ্য অভাবিত।

চিরদিন এ সংসারের কুটনো বন্দনাই কুটে এসেছে। একবার বসে একেবারে দু'বেলার কুটনো কুটে দেয়। হঠাৎ তার পোস্টে সারদা!

অসম্ভব কিছু বেলা হয় নি!

তবে কি বন্দনা না খেয়ে আছে বলে ইন্দ্রাণীর এই সুবিবেচনাপূর্ণ সদয়-সিদ্ধান্ত?

তাই সম্ভব। তবে উপোস কি কখনো করে না বন্দনা?

কিন্তু যত নষ্টের মূল ওই সারদাটাকে নিজের জায়গায় দেখে

অন্ধকার, সবটাই অন্ধকার। দিন রাত্রি সমান হয়ে গেছে। শুধু কয়েকটা রঙিন ফুট্‌কি। কখনো হলুদ রঙা, কখনো লালচে, কখনো বেগুনি।

আগে ধাঁধা লাগতো! এখন লাগে না।

ক্রমশঃ এই ফুট্‌কিগুলোও চেনা হয়ে গেছে। রাত্তিরে যখন ঘরে ঘরে চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলে, তখন এই লালচে ফুট্‌কিগুলো চোখের সামনে ফিন্‌কি দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়, যখন দুপুর রোদ্দুরে শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে, ওদের ওই পাখাদার ঘরে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে, তখন হলুদ ফুল ফোটে।......

আর যখন ঘুম আসে আর ঘুম ভাঙে, তখন ওই নরম বেগুনি বিন্দু যেন চোখের স্নায়ুতে স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়।

এই ফুটকি!

এই তিন রঙা ফুট্‌কিই এখন বিশ্ব নিখিলের অফুরন্ত আলোক প্রবাহের শেষ নৈবেদ্য। হয়তো ওটুকুও মুছে যাবে, তখন আর টের পাবেন না সরোজবাসিনী, ঘরে ওরা আলো জ্বেলে রেখেছে না অন্ধকার করে দিয়ে গেছে। টের পাবেন না আকাশে রোদ উঠেছে না মেঘ করেছে।

শুধু সময়টা অনুভব করবেন।

অন্য আর একটা ইন্দ্রিয় দিয়ে। কান দিয়েই সব বুঝতে শিখেছেন সরোজবাসিনী।

সরোজবাসিনীর চোখের আলো মুছে গেছে বলে তো আর সংসার লীলা থেমে যায় নি? সরোজবাসিনী তা' আশাই বা করবেন কেন? যখন অনন্ত আলোর পসরা ভরা পৃথিবী উন্মুক্ত ছিল সরোজবাসিনীর

কাছে, তখন কি সরোজবাসিনী পৃথিবীকে দেখেন নি? পড়েন নি সেই পরমতম সত্যের বাণী···

'তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশী—
এই নাটে।
কাটবে গো দিন আজো—
যেমন দিন কাটে?'

অনেক জেনে অনেক শুনে আর অনেক দেখে তো এখন দেয়াল হাতড়ে হাঁটবার ভূমিকা নিয়েছেন। তাই সরোজবাসিনী শুধু সংসার কর্মচক্রের ঘর্ঘরধ্বনির বিভিন্ন শব্দ থেকেই আহরণ করে নিতে পারেন কখন কি হচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে।

হ্যাঁ, প্রতিপদেই অসহ্য হয় তারা, সরোজবাসিনীর এই মাত্রাহীন কৌতূহলের জন্যে। বলে, 'সমস্ত সমাচার অবগত হওয়া চাই, নইলে রাজ্য রসাতলে যাবে! আশ্চর্য!'

আড়ালেই বলে অবশ্য, তা'হলেও ঠিকই জানতে পারেন সরোজবাসিনী। তবু অহরহ ওদের 'অসহ্য' আর 'আশ্চর্য' করে তুলে চলেন, অকারণ কৌতূহলের নিরীহ প্রশ্নে। যে প্রশ্নে ওরা জ্বলে যায়।

জুতোর শব্দ উঠল কি না উঠল, সরোজবাসিনী ঘর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'কে কোথায় বেরুচ্ছে রে?'···বাড়ীর লোকগুলো বাদে অন্য কোন গলার সামান্যতম আওয়াজ উঠলেই নিজের গলা ফাটাবেন, 'কেউ বেড়াতে এসেছে নাকি রে? অ-বৌমা! অ-রমলা, অ-লীলা!'

এই সব প্রশ্নের উত্তর বড় কেউ দেয় না। তখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান সরোজবাসিনী। দৃষ্টিহারা চোখের নীচেয় গড়িয়ে পড়া জলটা মুছতে মুছতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, আর জিগ্যেস করবো না! কী বা ইষ্ট আমার ওতে! ওদের সংসারে কেউ এল কি গেল, কেউ খেলো কি না-খেলো, জেনে আমার লাভ কি?

দু' এক বেলা গুম হয়ে থাকেন, আবার ভুল হয়ে যায়। ভেঙে

যায় প্রতিজ্ঞা, ওদের গতিশীল জীবনের 'সমাচার' অবগত হবার জন্যে ব্যাকুল প্রশ্ন করেন, 'সবাই মিলে কোথায় চল্লিরে ? সিনেমায় বুঝি ?'

ছোট নাতনী শীলা দুষ্টু বুদ্ধির রাজা।

সে কাছে এসে চেঁচিয়ে বলে, 'সবাই মিলে যাচ্ছি একথা কে বললে তোমায় ? শুধু মা যাচ্ছে—'

'আমায় ঠকাতে এলি ?' সরোজবাসিনী নিশ্চিত সুরে বলেন, 'সবাই সাজাগোজা করলি !'

শীলা এসে হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, 'মা, তোমার পিস্‌শাশুড়ীটি অন্ধ সেজে থাকেন। আসলে সব দেখতে পান। নির্ঘাৎ পান। নইলে এত নিখুঁত বোঝেন্ কি করে ?'

মা প্রতিমা, যে নাকি আজীবন পিসশাশুড়ীকে সহ্য করতে করতে অসহ্য হয়ে উঠেছে ! সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, 'রীতি প্রকৃতি দেখলে সেই সন্দেহই হয় বটে। ক্ষুরে নমস্কার ! চোখ ক্ষুইয়ে বসে আছেন, তবু সব জানা চাই।'

ওদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এখন অটুট, সবল, তাই ওদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না কেন জানা চাই।···বুঝতে পারে না—এই 'সমাচার'গুলিই সরোজবাসিনীর কাছে গতিশীল জীবনের আস্বাদ, আলোর জগৎ আর অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যেকার সেতু।

সে সেতু ভেঙে পড়লে সরোজবাসিনী পায়ের তলায় মাটি পাবেন কোথায় ? একেবারে যে গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাবেন। তাই না বারে বারে প্রতিজ্ঞাটাই ভেঙে পড়ে !

দু'চার বেলার স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ এক সময় বলে ওঠেন, কিছু জিগ্যেস করলে তো উত্তর দিবি না তোরা, তবু জিগ্যেস না করেও পারিনে। মাংস চড়েছে মনে হচ্ছে, খাবে নাকি কেউ ?'

লীলা মুখরা।

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'কেন ? লোক ডেকে এনে না খাওয়ালে আর মাংস চড়াতে নেই ? আমরা খেতে জানিনা ?'

সরোজবাসিনী বলেন, 'তুই যেন রণচণ্ডী ! জিগ্যেস করেছি তো হয়েছে কি ?'

'সব তাতে অত জিগ্যেস ভাল লাগে না। রাজ্যির লোককে ডেকে খাইয়ে তোমার ভাইপোর সর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি না আমরা !'

তবু হয়তো সরোজবাসিনী টের পান, লীলাদের তুই মামা এল, খেল, গল্প করল, চলে গেল।

মনের ঘেন্নায় আবার চুপ হয়ে যান সরোজবাসিনী।

আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

অথচ ওদেরও দোষ দেওয়া চলে না। ওরাও সর্বদা এই অহেতুক কৌতূহলে তেতো-বিরক্ত। যতদিন চোখ ছিল, সব তো মুঠোয় রেখেছিলে, চোখ এড়িয়ে এতটুকু কিছু করার জো ছিল না। এখন চোখ গেছে, তবু স্বভাব যায় না। 'কি, কেন, কখন, কে, কোথায়'... এর উত্তর দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কত আর মান্য করে চলা যায় তবে, গুরুজন বলে ?

শুধু বুড়ী পিসি মাত্র হলে কি এতটাই সহ্য করা হতো ? হোতো না। নেহাত নাকি সরোজবাসিনীর বাপ, লীলা কমলাদের বাপের ঠাকুর্দা, এই মস্ত বড় বাড়িখানা বিধবা মেয়ের নামে লিখে দিয়ে গিয়ে বংশের সবাইকে জব্দ করে রেখে গেছেন তাই।

বুড়ীর যতদিন না মৃত্যু হচ্ছে, তেমন চটানো যায় না। কে বলতে পারে রাগের মাথায় বাড়িটা আর কারো নামে দানপত্র করে বসে কিনা।

লীলাদের মা প্রতিমা মনে মনে 'মরে ভূত হয়ে যাওয়া' দাদাশ্বশুরকে গাল দিয়ে ভূত ভাগায়, আর নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে। ছেলেকে বাদ দিয়ে মেয়েকে বাড়ির মালিক করে দিয়ে যায় যে মানুষ, তার ভাগ্যে যে বালির পিণ্ডি'ও জোটে না, জোটে এই গালির পিণ্ডি, কে না জানে সে কথা ?

স্নেহ সহানুভূতি যেটুকু যা, সে করে শুধু ভাইপো বিনয়।...কাছে

এসে বসে, শরীর কেমন যাচ্ছে জিগ্যেস করে, খবরের কাগজ থেকে পড়া কোনো নতুন খবর থাকলে গল্প করে, আর মেয়েদের ডেকে হেঁকে শাসন করে, 'এই, পিসিমার ঘরের সামনে বাটি ঘটি ছড়িয়ে রেখেছিস কেন? বেরোতে গেলে হোঁচট খাবেন না?...এই, সবাই মিলে নিজেদের ঘরে গুলতানি করছিস্, এ ঘরে এসে একটু বসতে পারিস্ না?'

বলা বাহুল্য বাপের কথায় খুব একটা কর্ণপাত কেউ করে না। বিনয় হয়তো সে আশাও করে না। স্বভাবে বলে যায়।

মেয়েরা বলে, 'বাবার স্বভাবটি হচ্ছে ঠিক ঠাক্‌মার মতন। খালি বক্‌বক্।'

আবার কোন কোন সময় বলে, 'সারা বাড়ির জিনিস কে কত সামলাবে? তোমার পিসিটির তো সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো চাই। সেদিন দেখি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাতেও উঠছেন। কী দরকার বুঝি না বাবা!'

বিনয় বলে, 'ডাক্তারের দোষে চোখটাই গেছে। হাত পা মাথা মন তো আছে? কত আর মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে বল?'

ওরা বলে, 'তা তো বলছি না।' আমরা শুধু বলি, 'ডেকো আমাদের, যেখানে যাবে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেব। তা নয়, উনি কেবল 'অন্ধ নাচারের' পোজে দেয়াল ধরে ধরে—।'

এটার আর প্রতিবাদ করতে পারে না বিনয়, ভাবে সত্যি পিসিমারও দোষ আছে।...হাত ধরে নিয়ে বেড়ানোর মত সহৃদয় প্রস্তাবও উনি ঠেলে ফেলে দেন, এটা ঠিক নয়।

কিন্তু সেই বেঠিকটাই করেন সরোজবাসিনী।

ধরতে এলে হাতটা টেনে নিয়ে তীব্রগলায় বলেন, 'সর, সর। যাচ্ছি আমি। চিরদিনের জায়গা, এ কি আর তোরা চেনাবি আমাকে? পায়ের কাছে ডেয়ো ঢাকনা থাকে তো সরা।' ওদের এই প্রস্তাবে যেন অপমান সরোজবাসিনীর।

আর মনে মনে বোঝেন ওদের এই করুণার মধ্যে রাজনীতি আছে। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল, জানতে পারলো কোথায়

রইলেন সরোজবাসিনী। সেই এলাকাটুকু বাদ দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে কানা বুড়ীটার যথেচ্ছ সমালোচনা করতে পারে।···কিন্তু সরোজবাসিনীর গতিবিধি ওদের অজানা থাকলে, কখন কোন্ বেফাঁস কথা ফাঁস হয়ে যায় কে জানে।

নিজে নিজেই তাই দেয়াল ধরে ধরে বারান্দায় গিয়ে বসেন সরোজবাসিনী। বিনয় অফিস চলে গেলেই বসেন গিয়ে। রাস্তা দেখতে পান না। তবু গাড়ী-টাড়ীর শব্দ তো পান? শব্দ-জগৎটাকে তো ধরতে পারেন মুঠোর মধ্যে?

আজ আসতে গিয়ে টুলের পায়ায় বুড়া আঙ্গুলের মাথাটা ঠুকে গেল। ভয়ে 'উঃ' করলেন না। জানেন করলেই ওরা এক্ষুণি ছুটে এসে যাচ্ছেতাই বকবে, আর হয়তো বাবাকে লাগিয়ে দিয়ে সেই 'হাত-ধরা বুড়ী'র পর্যায়ে এনে ফেলবে।

উঃ-টা হজম করে বসে, আঙুলের মাথাটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলেন রক্ত পড়ছে কিনা। পড়েনি। তবু রক্ষে! কালসিটেটা টের পাবে না কেউ। কে আর সরোজবাসিনীর পদপ্রান্তে চোখ ফেলতে যাচ্ছে?

চোখের সামনে হল্‌দে ফুট্‌কিগুলো ছুটোছুটি করছে, রোদ চড়া হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। মেয়েরা কেউ কলেজে, কেউ স্কুলে চলে গেল।

সকাল থেকে কেউ সরোজবাসিনীর দিকেও আসেনি। খবরের কাগজটা একটু শুনতে ইচ্ছে করে, তা' কেউ যদি একটু সে ছেদ্দাটুকু করে!

সেই তো তোরা পড়িস?

একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে কি হয়? তা' চিরটা দিন যে সরোজবাসিনী বই কাগজ ভিন্ন থাকতে পারতেন না, তা একবার মনেও করবে না।

মায়া-মমতাহীন নিষ্ঠুর সব।

পড়া বন্ধ হয়ে গিয়ে সরোজবাসিনীর জগৎটা যে কত শূন্য হয়ে গেছে

তা বোঝে না। এর ওপর আবার কাল প্রতিমার মা এসে স্বচ্ছন্দে শুনিয়ে গেলেন, 'আপনার তো বেয়ান তবু শুধু দিষ্টিটুকুই গেছে, হাত পা কান মাথা দাঁত সব অটুট রয়েছে। কানে শুনছেন, খেয়ে হজম করছেন, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন, আমার বড়দির অবস্থা যদি দেখেন! আপনাদেরই তো বয়সী? কিছুর মধ্যে কিছু ক্ষমতা যদি থাকে! কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না, চিবিয়ে খেতে পারেন না, তিন ঠেঙে বুড়ী হয়ে বসে আছেন।'

একা বসে বসে সেই বিভীষিকার অবস্থা কল্পনা করছিলেন সরোজবাসিনী। আর বিধাতার ওপর একটা দুরন্ত অভিমানের আক্রোশ যেন আছড়া-আছড়ি করছিল।

দেওয়া জিনিস কেড়ে নেওয়া নাকি সবচেয়ে ঘৃণ্য নীচতা। বিধাতা তবে সেই নীচ ঘৃণ্য কাজটা করেন কোন্ লজ্জায়? যা যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেগুলো আগে আগে কাড়তে শুরু করেন কেন? নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার পর সব কেড়েকুড়ে নিলেই হয়?

তা নয়, বেঁচে থাকতেই—

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল সরোজবাসিনীর।

কে যেন কথা কইছে?

বীণার গলা না?

বীণা সরোজবাসিনীর বোনঝি। নিজের বোনঝি। তবে মাসি একা তাদের দাদামশাইয়ের বাড়ির মালিক বলে দেখতে পারে না মাসিকে।

তবু—ধর্মের সাক্ষী একবার এসে পেন্নামটা তো করে আগে? তারপর দু'একটা ছেঁদো কথা কয়ে কেটে পড়ে, ওদের ওদিকে গিয়ে ভিড়ে যায়।

আজ আর এদিকে এলই না!

সরোজবাসিনী আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে ওদের ঘরের দিকে কান পাতলেন।

কান পেতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বসে রইলেন সেই ঘাড় কাতের ভঙ্গীতেই।…প্রথমে বীণার চাপা গলা শুনলেন, 'থাক এক্ষুণি আর আমার আসার খবর বলতে যেতে হবে না। কবলমুক্ত হওয়া কঠিন।…সেই যাবার সময় একবার সেলাম ঠুকে যাব।'

সমবেত হাস্যরোল শোনা গেল।

তারপর প্রতিমার গলা শুনলেন, 'আর বোলো না ভাই, জীবন মহানিশা করে তুলেছেন। চব্বিশ ঘণ্টা—কি হ'ল? কখন হল? কে এল? কি জন্য এল?' বাবাঃ জেরবার হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা ভগবান যখন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, তখন এখনো এত লোভ কেন? আজন্ম তো সংসার করলেন, তবুও সংসারকে এত ভাল লাগে? একটু ছাড়তে ইচ্ছে করে না?'

'করবে!' বীণা ভুলে গিয়ে গলা খুলে বলে, 'করে না, সে ইচ্ছে করে না বুড়োদের! আমার শ্বশুরটির ঠিক ওই রোগ। বুড়ো হয়ে যেন কৌতূহল আরও বেড়েছে। তিনি আবার কানে শুনতে পান না। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙে যায়। আবার—যাহোক বলে যদি বোঝাতে চেষ্টা করি, ঠিক ধরে ফেলেন। অমনি বলবেন, বৌমা, গোঁজা মিল দিচ্ছ! মনে মনে বলি, এরপর গাঁজায় দম দিতে হবে!

আর একবার হাস্যরোল।

এবার আরো জোর।

সব মেয়ে কটা জুটেছে বোধ হয়।

'বীণাপিসি যা হাসায় বাবা!'

'ঠাকুরঝি চিরদিনের রগুড়ে।'

অতএব বীণাপিসি আর এক হাস্যকর বিষয় নিয়ে আসরে নামেন হাসাতে।

'মাসীর তো তবু হজম আছে। আমার শ্বশুরের আবার যা ব্যাপার! হজম শক্তি গেছে, অথচ রাতদিন 'এটা খাবো ওটা খাবো!'

নাও খাওয়াও, আবার ঠেলা সামলাও। বাহাত্তর বছর ধরে খেয়ে আসছেন, কত লক্ষ রকম মাল মহাপ্রাণীকে দিলেন তার ঠিক নেই, তবু বলবেন—'বৌমা, মহাপ্রাণীর ইচ্ছে হয়েছে দু'খানা তালের বড়া খেতে—বৌমা, অনেকদিন আর ছোলার ডালের কচুরি করছো না তো?' আমরা আর সংসার করব না, কেবল ওঁর সখের বায়না মেটাবো! উঃ!—'

এবার আর হাসির ধুমে কথার শেষটাই শোনা গেল না।

তারপর আরো কত যেন কথা হল। সরোজবাসিনীর সমালোচনাও অনেক হল, এবং বোধকরি সভায় সাব্যস্ত হ'ল বুড়ো হলে যে সর্ববিধ লোভকে ত্যাগ করতে হয়, এই পরম সত্যটা বুড়ো-বুড়ীগুলো খেয়াল করে না বলেই এত ঝামেলা জগতে।

সব কথা যেন ভাল করে মাথায় ঢুকল না সরোজবাসিনীর, চলে এলেন, ওদিক থেকে সরে এলেন। কিন্তু সহসা বীণার চাঁচাছোলা গলার আর একটা কথা তীরের মত ছিট্‌কে এল। এতদূরেও ছিট্‌কে এল।

আর সরোজবাসিনীর তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি সেই তীরের তীক্ষ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

বীণা কি তা'হলে সরোজবাসিনীর কাছে বিধাতার উত্তর হয়ে এল?

নইলে হঠাৎ একথা বলে উঠবে কেন বীণা?

'আরে বাবা, চিরকালই যদি সব ভোগ করবি, তবে ভগবান কেন একে একে চোখ কান দাঁত কোমর সব কেড়ে নেন? আশী বছর বাঁচবি বলে আশী বছর ধরেই সব ভোগ করবি? পরবর্তীরা তা'হলে করবে কি?' তোদের চোখ গেছে, তবু আমাদের সব তা'তে চোখ ফেলবি, কান গেছে তবু সব কথা শুনবি, বুদ্ধি গেছে তবু সব কথায় ফোড়ন কাটবি, কবে আর তবে আমরা প্রাণ খুলে হাসবো? গলা খুলে কথা বলবো? মন খুলে সংসার করবো?'

হঠাৎ যেন ভিতরে প্রবল একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন অনুভব

না, উপায় নেই।

মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় সে অধিকার হারিয়েছে বন্দনা। অনেক অধিকারই হারিয়েছে। সহিষ্ণুতাই শক্তি, সহিষ্ণুতাই অধিকারের আসন। ক্ষণিকের ভুলে ওকে একবার হারিয়েছ কি সব হারিয়েছ!

ঘড়িটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বন্দনা একটু বুঝি হেসেই বলে, মুক্তি দিচ্ছিস?'

ইন্দ্রাণী এখন মুখে মহিমার লাবণ্য মাখায়।

বলে, 'মুক্তির কিছু না। অনেকদিন ধরে একটা অন্যায় চলে আসছে, খেয়াল হয় নি, খেয়ালটা যখন করিয়েই দিলেন, সে অন্যায়ের প্রতিকার করাই ভাল।'

ইন্দ্রাণী চলে গেল।

ইন্দ্রাণীর পিছন দিকটা দেখতে পেল বন্দনা।

আর সবকিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ মনে হল বন্দনার—ইন্দ্রাণীর শাড়ির পাড়টা কি চওড়া! এত চওড়া পাড় শাড়ি ছিল ইন্দ্রাণীর? পরেছিল কোনোদিন এর আগে?

নাও খাওয়াও, আবার ঠেলা সামলাও। বাহাত্তর বছর ধরে খেয়ে আসছেন, কত লক্ষ রকম মাল মহাপ্রাণীকে দিলেন তার ঠিক নেই, তবু বলবেন—'বৌমা, মহাপ্রাণীর ইচ্ছে হয়েছে তু'খানা তালের বড়া খেতে—বৌমা, অনেকদিন আর ছোলার ডালের কচুরি করছো না তো?' আমরা আর সংসার করব না, কেবল ওঁর সখের বায়না মেটাবো! উঃ!—'

এবার আর হাসির ধুমে কথার শেষটাই শোনা গেল না।

তারপর আরো কত যেন কথা হল। সরোজবাসিনীর সমালোচনাও অনেক হল, এবং বোধকরি সভায় সাব্যস্ত হ'ল বুড়ো হলে যে সর্ববিধ লোভকে ত্যাগ করতে হয়, এই পরম সত্যটা বুড়ো-বুড়ীগুলো খেয়াল করে না বলেই এত ঝামেলা জগতে।

সব কথা যেন ভাল করে মাথায় ঢুকল না সরোজবাসিনীর, চলে এলেন, ওদিক থেকে সরে এলেন। কিন্তু সহসা বীণার চাঁচাছোলা গলার আর একটা কথা তীরের মত ছিট্‌কে এল। এতদূরেও ছিট্‌কে এল।

আর সরোজবাসিনীর তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি সেই তীরের তীক্ষ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

বীণা কি তা'হলে সরোজবাসিনীর কাছে বিধাতার উত্তর হয়ে এল?

নইলে হঠাৎ একথা বলে উঠবে কেন বীণা?

'আরে বাবা, চিরকালই যদি সব ভোগ করবি, তবে ভগবান কেন একে একে চোখ কান দাঁত কোমর সব কেড়ে নেন? আশী বছর বাঁচবি বলে আশী বছর ধরেই সব ভোগ করবি? পরবর্তীরা তা'হলে করবে কি?' তোদের চোখ গেছে, তবু আমাদের সব তা'তে চোখ ফেলবি, কান গেছে তবু সব কথা শুনবি, বুদ্ধি গেছে তবু সব কথায় ফোড়ন কাটবি, কবে আর তবে আমরা প্রাণ খুলে হাসবো? গলা খুলে কথা বলবো? মন খুলে সংসার করবো?'

হঠাৎ যেন ভিতরে প্রবল একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন অনুভব

করেন সরোজবাসিনী। মনে হয় ভিতরটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।······

কানের মধ্যে যেন নগর সংকীর্তনের করতাল বাজছে।···বাজতে বাজতে শুধু একটা রোল হয়ে উঠছে। তবে কি আজ হঠাৎ সরোজবাসিনীর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়টা জবাব দিয়ে বসতে চাইছে ?

সরোজবাসিনী মনে মনে বলেন, 'ভগবান ! তাই যেন হয়। তাই যেন হয়। বৃথা তোমার ওপর অভিমান করছিলাম। করুণার তোমার শেষ নেই। অনেক আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তুমি তোমার দেওয়া জিনিসগুলো কেড়ে নাও।······

কান রয়েছে এখনো তাই ওদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি, দৃষ্টি থাকলে তো ওদের ওই হাসিতে ফেটে-পড়া মুখগুলোও দেখতে পেতাম আমি !'

পরাজিতা

বাবলির জন্মলগ্নে নাকি চন্দ্র ছিল! তাই বাবলির ঠাকুমা, মানে আমাদের মিনা মাসি বলতেন, 'লগন চাঁদা মেয়ে।'

'লগন চাঁদা' হলে কি হয় তা জানিনা, তবে মেয়েটা যে 'একটা কিছু' হবে সেটা তার আঁতুড় ঘর থেকেই বোঝা গিয়েছিল। আঁতুড়েই হেসেছে বাবলি, আর ছ মাসে দাঁড়িয়েছে। মিনা মাসির আর এক নাতনি, মানে মেয়ের মেয়ে টুলু, সে একেবারে বাবলির বয়সী, কিন্তু সব বিষয়ে বাবলির থেকে পিছিয়ে থেকেছে।

টুলু যখন সবে হামা দিচ্ছে, বাবলি তখন গড়গড়িয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাজেই সেই শৈশবকাল থেকে বাবলি ওর ওই পিসতুতো বোন টুলুকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখতো।

তা সেটা দেখতেই পারে, কারণ বাবলিকে আমরা সবাই দেখতাম উঁচু আকাশের তারার মত।

একে তো অবস্থাপন্ন বাপের এক মেয়ে, তায় রূপের প্রতিমা, তার ওপর আবার লেখাপড়ায় ভাল। এ মেয়েকে দেখতে দেখতে মা বাপ গলে গলে পড়বে, এ আর বিচিত্র কি?

বাবলির মা-বাপও পড়তো।

বাবলি চাঁদ চাইলে, চাঁদ পেড়ে এনে হাতে দিতে না পারলে দুঃখে অভিভূত হতো তারা। ঠাকুমাও বলতেন, 'রাজপুত্তুর বর চাই আমার বাবলির।'

তা সেটা যে ন্যায্য চাওয়া, তাতে আর মতভেদ ছিল না আমাদের। কারণ আমাদের তিন তল্লাটে অমন মেয়ে তো আর দুটো ছিল না।

সেই বাচ্চা বয়েস থেকেই বাবলি নিজের রুচি পছন্দে খেয়েছে পরেছে। পাঁচ বৎসর বয়সে দর্জিকে নিজের ফ্রকের কাট বুঝিয়ে দিয়েছে বাবলি, মাথায় ফিতের ফাঁস বেঁধেছে নিজে।

বাবলির মার সাধ হতো একটামাত্র মেয়েকে নিজে হাতে সাজায় খাওয়ায়, সে সাধ মিটতো না। তাই খেদ ঢাকতে হেসে হেসে বলতো, 'বাবলির সঙ্গে কে পারবে বাবা? ফ্যাসানে ও আমার কান কাটতে পারে?' বলতো, 'বাবলিকে খাওয়াবার সাধ্যি আমার নেই বাবা, নিজের ইচ্ছেয় যেটুকু যা খায়, তাতেই আমি ধন্য হয়ে যাই।'

তা বাবলি মাকে ধন্য করে সন্দেশ ফেলে ফুচকা খেত।

ঠাকুমা বলতেন, 'ওরে তোরা শাসন করছিস না? অসুখ করবে যে—'

বাবলির বাবা বলতো—'অসুখ করলে ডাক্তার আছে! বাবলিকে শাসন করবো আমি? ও আমায় একহাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে।'

কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দেবার মুখে হঠাৎ শুনলাম, বাবলি পরীক্ষা দেবে না, আর্ট স্কুলে ভর্তি হবে।

আমরা অবিশ্যি শুনে হতভম্ব হয়েছিলাম, কিন্তু বাবলির বাবা বলল, 'কি আর করা, ওর যখন অত ঝোঁক হয়েছে—'

অতএব বিপুল বিক্রমে ছবি-আঁকা শিখতে লাগল বাবলি। আর বলবো কি, স্কুলের বিদ্যে ছাপিয়ে ছমাসে পাঁচ বছরের কাজ শিখে ফেলল। ছবি আঁকার সরঞ্জামে বাড়ি ভরিয়ে দিল বাবলির বাবা।

শুনছি—বাবলি একটা একক ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করছে, তারপরই হঠাৎ শুনলাম সে ঝোঁক গেছে, গানে মেতেছে বাবলি।

তা সে মাতাই বটে।

গান গান করে পাগল হ'ল বাবলি। সংগীত বিজ্ঞানের গুরু খুঁজতে লক্ষ্ণৌ গেল, এলাহাবাদ গেল, মাইহার গেল, আরো কত কীই যেন করল। বোঝা গেল সংগীত-সরস্বতীই তার সত্যকার লক্ষ্যবস্তু।

কিন্তু কী আশ্চর্য শক্তি মেয়েটার! যাতে হাত দেয়, তাতেই সোনা ঝলসায়।

ছবি আঁকল তো ছবি, গান শিখল তো গান, যেবার হাতের কাজ ধরেছিল, তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি বাড়াতে বাড়াতে মাত্রা ছাড়াচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন একতিলও মাত্রা ছাড়াচ্ছি না আমি। মাঝে মাঝে এক একটা অসাধারণ ছেলেমেয়ে জন্মায় বৈকি ?

বাবলি যে তাদের কলেজ সোস্যালে 'চণ্ডালিকা' অভিনয় করে সোনার মেডেল পেয়েছিল, সে তো কাগজেই বেরিয়েছিল ; বাবলি যে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিল, সে কথাই বা কার অজানা ? আর বাবলি যে আধুনিক কবিতা লিখে দিব্যি নাম করেছিল, তার প্রমাণ তো এখনো রয়েছে।

কাজেই আমাদের আত্মীয় মহলে তখন যে 'বাবলি' ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গ ছিল না, সেটা আশ্চর্যি নয়। শুধু বাবলির পিসি, অর্থাৎ সেই টুলুর মা, বিগলিত হতো না। ভাইঝির সমালোচনা করতো। বলতো, 'বড্ড বেশী আদিখ্যেতা বাবলির, বড় অহমিকা ! 'বুদ্ধি বুদ্ধি' করে নাচানাচি করে মেয়েটার মাথাটা তোমরা খেলে দাদা ! গুরুলঘু জ্ঞান নেই, হিতাহিত জ্ঞান নেই, এ আবার কেমন বুদ্ধি ?'

তা বাবলির পিসির এসব কথা যে স্রেফ হিংসের ব্যাপার কে না বুঝতো ? নিজের মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছে তো ? বাবলির পাশে টুলু ?

যেন চাঁদের পাশে জোনাকি।

যেন প্রজাপতির পাশে ফড়িং।

যেন ঢাকের পাশে ঝুমঝুমি।

তা হবে নাই বা কেন ? মেয়ের জন্যে কি করেছে টুলুর মা বাপ ? পাড়ার একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল, তাতেই ঘসটেছে। সে স্কুলের না আছে বাহার, না আছে জৌলুস।

বাবলির মা বলেছিল, 'মেয়েকে ওই স্কুলে ভর্তি করে দিলে ঠাকুরঝি ? ওতো স্রেফ্ গোয়াল।'

টুলুর মা হেসে বলেছিল, 'তা বৌদি, শ পাঁচেক গরু তো রয়েছে সে গোয়ালে, আর একটা না হয় বাড়ল।'

এ বোকামির ফলও হাতে হাতে পেয়েছে টুলুর মা, মেয়ে একেবারে নেহাত সাধারণভাবে পাশ করেছে, আর একটি তরুণ অধ্যাপকের প্রেমে পড়ে উনিশ বছর পার না হতেই বিয়ে করে বসেছে। সে অধ্যাপকের না চাল না চুলো, না বাড়ি না গাড়ি।

বিয়েতে নেমন্তন্নে এসে বাবলি বর দেখে খাটোচুল দুলিয়ে হেসে কুটিকুটি হ'ল, আরও হেসে গড়াল, এই বয়সে টুলুর বিয়ের শখ দেখে। সে তো ভাবতেই পারছে না একথা।

বাবলি অবশ্য ভাবতে পারল না, কিন্তু আমরা সবাই টুলুর বিয়ের পর থেকেই জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিলাম বাবলির কী রকম বিয়ে হবে। কোথায় কোন্ বর তপস্যা করছে বাবলির জন্যে। সত্যি, নিতান্ত তপস্যার জোর না থাকলে বাবলির মত কনে জোটে!

যেটুকু খুঁত হচ্ছিল পড়া ছেড়ে দিয়ে, সে তো শুধরে নিয়েছে বাবলি। গান, ছবি, অভিনয়, খেলাধুলো, সব ছেড়ে দিয়ে বিপুল উৎসাহে তখন আবার পড়ছে বাবলি। বি-এ, এম-এ, দুটো পাশ করে ফেলল ঝপাঝপ।

এই সময় বাপু বাবলি বড্ড বেহায়াপনা করে বেড়িয়েছে, যার জন্যে মিনা মাসি নাতনির বিয়ে বিয়ে করে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু মিনা মাসির ছেলে বৌ তাতে কান দেননি, এক্ষুনি বিয়ে কি? আর ওর যোগ্য পাত্রই বা কোথা?

তাঁদের মক্ষিরাণী মেয়েকে ঘিরে যে সর্বদাই এক ঝাঁক মাছি গুন্‌গুন্ করবে, এতো স্বাভাবিক। ওর জন্যে ভাবনা নেই। ওই মাছিগুলোকে মাছি ছাড়া মানুষ বলে গণ্য করে না বাবলি তা তাঁরা বোঝেন।

তবে ক্রমশঃ মা-বাপেরও টনক নড়ল। বাবলির যোগ্য বর খুঁজতে লাগলেন। বাংলাদেশ উটকে ফেলে যত কেষ্ট-বিষ্টু ছেলের সন্ধান করতে লাগলেন তাঁরা।

কিন্তু কোথায় সেই রাজপুত্তুর ?

বাবলির বাবার যদি পছন্দ হয় তো মার হয় না। মার হয় তো বাবার হয় না। ওরই মধ্যে যখন একটু স্থির করে এনেছেন, প্রমাদ ঘটাল বাবলি। বলল, 'এক্ষুনি আমি খরচ হয়ে যেতে রাজী নই।'

খরচ !

খরচ মানে ?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাবলি তীক্ষ্ণহাসি হেসে বলল, 'তা বিয়ে হওয়া মানেই তো খরচ হয়ে যাওয়া।'

অতএব বাপ মার সঙ্গে মতভেদ ঘটতে লাগল বাবলির, ওঁরা বললেন, 'বেশ, আমরা এর মধ্যে নেই।'

বাবলি বলল, 'ঠিকই তো। তোমাদের থাকার কোনো মানে হয় না। বিয়েটা তো তোমরা করবে না ? করবো আমি।'

বাবলির ওপর আর কথা কি চলবে ? কাজেই মিনা মাসি রাতদিন আক্ষেপ করতে লাগলেন, বাবলির বাবা ব্লাডপ্রেসারে ভুগতে লাগলেন, বাবলির মা নির্জনে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর বাবলি ঝলসে বেড়াতে লাগল।

আশ্চর্য ! এত ছেলে বাবলির প্রেমে পড়ল, বাবলি কারো প্রেমে পড়ল না। বাবলি শুধু তাদের করুণা বিলোল। আর করুণা করতে লাগল তার সহপাঠিনী বান্ধবীদের। করল টুলুকে। ওরা যে এখুনি সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে, এ দেখে হেসে গড়ায় বাবলি।

ইতিমধ্যে মিনা মাসি মারা গেলেন, মারা গেলেন তাঁর ছেলে, হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে বাবলির বিধবা মা আর একবার মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে পাগল হলেন। কিন্তু অবস্থা গেছে পড়ে। কারণ মেয়ের হাতে চাঁদ পেড়ে এনে দেবার সাধনায় নিজের হাতে আর কিছু রাখেননি বাবলির বাবা। তাই তেমন সম্বন্ধ আর জুটছে না। তা ছাড়া বয়েসও তো বেড়ে গেছে অনেক।

এই অবধি জানতাম, তারপর ক'বছরের জন্যে কলকাতা ছেড়ে চলে

গিয়েছিলাম। একদিন চিঠিতে শুনলাম বাবলি বিয়ে করেছে। মস্ত এক কেষ্ট-বিষ্টু অফিসারকে। যাক, বাবা সবুরে মেওয়া ফলে তবে!

কতদিন পরে যেন এলাম কলকাতায়, উঠলাম টুলুর বাড়ি। দেখি সেখানে বাবলি। এখনো তেমনি রূপ, কিন্তু এ কী! রুক্ষু চুল, খালি হাত, সাদা সিঁথে, সাদা শাড়ি!

কবে এমন হ'ল বাবলির!

টুলু আড়ালে চুপিচুপি বলল, 'না না বিধবা নয়, বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—'

'সে কি? অমন বর—'

'ওই তো! সে হচ্ছে এক বাঘা অফিসার, আর বাবলি চিরকালের খেয়ালী স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী। বনল না।'

'ওর মা?'

'মেয়ের মুখ দেখেন না, কাশীবাস করছেন।'

'বাবলি কোথায় থাকে?'

'বি.-টি. পাশ করে মফস্বলে একটা মাস্টারি করছে। থাকার কষ্ট খাওয়ার কষ্ট, ছুটি হলেই তাই ছুটে ছুটে আমার কাছে চলে আসে। ছেলেপেলে ভারী ভালবাসে, রাজ্যের জিনিস এনে উপহার দেয়। এত লজ্জা করে!'

জীবনে কখনো কাউকে প্রণাম করতে দেখিনি বাবলিকে, আজ চলে যাবার সময় আমায় প্রণাম করল। আর অন্য কিছু না বলে হঠাৎ বলে উঠল, 'শুনেছ, টুলুর ছেলে হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশ করেছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ'।

বাবলি ম্লান হেসে বলল, 'বুঝলে পিসি, আগে ভাবতাম খুব জিতছি, বোকা টুলুটা হেরে মরছে। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, টুলুটাই বোধহয় জিতে গেছে।'

অনেক কিছু বলার ছিল, কিছুই বলা হল না, দেখলাম, বাবলির চোখে জল।

জীবনশিল্পে হেরে যাওয়া বাবলি। তাই বলতে পারলাম না—'জীবনের অনেক উপকরণ হাতে পেয়েছিলি বাবলি, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেছিস বসে বসে।'

'এই এই শুনছো, থামাও থামাও তো একটু—'

'কি হলো ?'

ঝনাৎ করে গাড়িটা থামিয়ে ফেলল ধ্রুব। আর একবার বলল, 'হলো কি ?'

নন্দিতা উৎকণ্ঠ দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, 'দেখ তো, ওই ডাবের দোকানটার সামনে কিসের গোলমাল হচ্ছে ?'

ডাবের দোকানের গোলমাল !

তার জন্য গাড়ি থামানো !

ধ্রুব হতাশ কণ্ঠে বলে, 'মাঝে মাঝে আপনাকে কিসের পাগলামিতে পায় বলুন তো ?'

'উন-পঞ্চাশের কোন একটা বায়ুর নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠাকুরপো, প্লীজ্ একবারটি নেমে দেখ ব্যাপারটি—ঠিক আছে, আমিই দেখছি।'

নন্দিতা নেমে পড়ল।

অগত্যা ধ্রুবকেও নেমে পড়তে হল।

একটা ডাবের দোকানের সামনে কয়েকটা আজেবাজে লোক একটু উত্তপ্ত তর্কাতর্কি করছে, এর মধ্যে নন্দিতা দেখবার কী পেল ভেবে পেল না ধ্রুব।

একটু বিরক্তিই এল।

নন্দিতাকে নিয়ে বেরোনো এক ফ্যাসাদ ! ও যে কখন কি অর্ডার করে বসে ! দাদার বৌকে দাদারই নিয়ে বেড়ানো ভাল বাবা !

ধ্রুব এগিয়ে যেতে যেতেই নন্দিতা পৌঁছে গেছে, এবং গোলমালের রহস্য ভেদ করে ফেলেছে। এক ভদ্রলোক পরপর দুটো ডাব খেয়েছেন, এবং এখন পকেট উল্টে বলছেন পার্স খুঁজে পাচ্ছেন না, পকেটমারা গেছে।

বলা বাহুল্য এ সংবাদে ডাবওলা বিশেষ প্রীত হয়নি, বচসা চালাচ্ছে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই এ সম্পর্কে সম্পর্কশূন্য বেশ কয়েকজন লোক এসে জটলা করছে।

'কত দাম তোমার ডাবের?'

নন্দিতার পিকপকেট হয়নি। নন্দিতা ওর শৌখিন বটুয়ার মধ্যে থেকে পার্স বার করে খুলে ধরে।

'বারো আনা? বারো আনা পয়সার জন্যে একজন ভদ্রলোককে এ রকম করছো তুমি?' নন্দিতা একটা এক টাকার নোট ফেলে দেয়, 'থাক্ আর চেঞ্জ ফেরত দিতে হবে না। ভবিষ্যতে একটু ভদ্র হতে শিখো—' বলে ফিরে দাঁড়ায় নন্দিতা সেই অপদস্থ ভদ্রলোকের দিকে। তীব্রদৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, 'চলে এসো আমার সঙ্গে! এসো!'

ধ্রুব এতক্ষণ ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সহসা চকিত হয়। ওঃ তাই! চেনা লোক! তবে ধ্রুবর চেনা নয়। বৌদির বাপের বাড়ির অনেকজনকেই দেখেছে সে, এঁকে দেখেনি। তা চেহারা বটে একখানা! এই রাজকীয় চেহারার ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে অপদস্থ হচ্ছিল!

চেহারাটা রাজকীয়, কিন্তু পোশাকটা নয়।

গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি একটা আছে বটে গায়ে, কিন্তু পাট-নষ্ট আধময়লা। ধুতিও প্রায় তাই। পকেটটা কি ওর সত্যিই মারা গেছে? ভেবেই অবশ্য লজ্জিত হল ধ্রুব। কারণ ততক্ষণে তার দাদার বৌ ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে গুছিয়ে আসন গ্রহণ করেছেন।

উঠে বসে স্টিয়ারিং ধরল।

এবার নন্দিতা ধ্রুবর দিকে দৃষ্টিপাত করল। বলল, 'দেখেছ ঠাকুরপো, এই সব ভদ্রবেশী জুয়াচোরদের কাণ্ড! এসব লোককে কি করা উচিত বলতো?'

ধ্রুব অবোধ নয়।

তাই ধ্রুব মৃদু হেসে বলে, 'বাড়ীতে ধরে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন খাইয়ে দেওয়া ছাড়া আপাততঃ তো আর বেশী কোনো শাস্তি মাথায় আসছে না !'

'আসছে না ? ঠিক আছে। একটু লঘুদণ্ড হচ্ছে বটে, যাক্ এখন ওতেই হবে।···বিরাম শুনলে ?'

ধ্রুব জানল ভদ্রলোকের নাম বিরাম।

নামটা কি আগে শুনেছে ধ্রুব ?

বিরাম একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল 'আসামীর পক্ষে অবশ্য সব সময়ই দণ্ডটা গুরু বলে মনে হয়। দয়া করে ছেড়ে দিলে কৃতজ্ঞ হতাম !'

'কৃতজ্ঞ ! তোমার কৃতজ্ঞতাটা খুব একটা মূল্যবান বলে না ভাবলেও পারো। ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই। পড়েছিলে ঠিক হাতে ভাই ঠিক ছিল তোমার ! নেহাৎ ওই লোকগুলোর হাতে পড়ে চকাটা হতে, তাই সরিয়ে আনতে হ'ল। আর খানিকক্ষণ পরেই পথ চলতি লোক এসে ঘুসি মেরে তোমার নাক ওড়াতো তা জানো ?'

'জানি !' বিরামও হাসে। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল ঘষতে মুছতে বলে, 'যাদের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই, তারাই তো বেশী পিটোয়।'

নন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'যা বললে ! কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। পিক্‌পকেটের গল্প প্রায়ই বানাও বুঝি ?'

কথাগুলো ধ্রুবর কানে যাচ্ছে।

ধ্রুবর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস দেখা দেয়। ভাবে মনে হচ্ছে সম্পর্কটা একটু ঘোরালো। বেচারা দাদার কোন সময় পিক্‌-পকেট হয়ে যায়নি তো ?

ধ্রুবর হাসিটা দেখতে পায় না নন্দিতা।

বিরামও না। তাই সেও মৃদু হাসে। হেসে বলে, 'বিপদে পড়লে কত সময় কত গল্প বানাতে হয়। ওটা আর আশ্চর্য কি? নতুনই বা কি?'

না, নতুন নয়।

গল্প নন্দিতাও বানিয়েছে।

আজ নয়, একদা—

যে সে লোকের সামনে নয়, বাপের সামনে। নন্দিতার সেই রাশভারী কড়া মেজাজের বাপের সামনে। তাঁর শোবার ঘরের খোলা আলমারীতে যে পাঁচখানা একশো টাকার নোট ছিল, একথা শুনে 'থ' হয়ে গিয়েছে নন্দিতা। বলেছে, 'তোমার জন্যে যখন 'টাই' বার করছিলাম, তখন তো কই দেখতে পাইনি বাবা!'

' 'টাই' বার করতে দেখবে কি করে?' বাবা গম্ভীর ভারী গলায় উচ্চারণ করেছিলেন, 'আলমারির ড্রয়ারে ছিল তো!'

'ড্রয়ারে? চাবির মধ্যে?'

নন্দিতা মূর্চ্ছিত হয়েছিল।

বাবা বিরক্ত হয়েছিলেন, 'এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছে না কেন বল তো? বলছি তো ড্রয়ারে চাবি দেওয়া হয়নি। অত রাত্রে এনে রেখেছি, সকালেই নেব—'

'আলমারীটা আর একটু খুঁজে দেখবো বাবা? যদি অন্য কোথাও—'

বাবা বিরক্তি থেকে ক্রোধে এসেছিলেন। 'বৃথা খাটুনির কোনো মানে নেই। অন্য কোথাও খুঁজতে কেন যাবে তুমি? আমি রেখেছি ড্রয়ারে।'

'আমারই দোষ বাবা! আমি যদি 'টাই' বার করে নিয়ে চাবি দিতাম আলমারীটায়—'

বাবা প্রায় ধমকে উঠেছিলেন।

'তোমার মায়ের মত সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার চেষ্টা কোরো না

নন্দিতা ! টাকাটা 'টাই' নেবার আগে গেছে কি পরে গেছে, তুমি জানো ?'

জানে না, সেটা অবশ্য স্বীকার করতেই হয়েছিল নন্দিতাকে। মাথা নীচু করেই থাকতে হয়েছিল দাঁড়িয়ে। ওর বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'যাক্ এই নিয়ে আর বেশী গোলমাল হয় এ আমি চাই না ; ওটা আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বলেই ধরে নিচ্ছি। চাবি খোলা আলমারীতে টাকা রাখা যে আর চলবে না সেটা জেনে গেলাম। শোবার ঘরেও না।'

শোবার ঘর এমন কি সুরক্ষিত দুর্গ, শোবার ঘরে কি চাকর-বাকর ঢোকে না ? একথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি নন্দিতার। বাবার কালো হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপেছিল তার।

ক'দিন যেন পরে বিরাম বলেছিল, 'তোমার বাবা কোনো 'স্টেপ' নিলেন না কেন বলতো ? নতুন চাকরটাকেও ছাড়াননি ?'

'কই ? দু'জনেই তো আছে। নতুন পুরনো ! আর কোনো কথাই বলেননি টাকা নিয়ে।'

'একটু আশ্চর্য ! উনি যা মেজাজী, আমি তো ভেবেছিলাম দুটোকে ধরেই পুলিশে 'হ্যাণ্ডোভার' করে দেবেন।'

তা দেননি নন্দিতার বাবা।

ভাগ্যিস দেননি !

টাকাটা তো আবার পাওয়া গিয়েছিল কতদিন যেন পরে। ওই আলমারীতেই। নন্দিতার কথাই ঠিক হয়েছিল, ড্রয়ারে ছিল না। আলমারীর তাকে পাতা—তোয়ালের নীচেয় ছিল। নন্দিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর ওর বাবা আলমারী গোছাতে গোছাতে পেয়েছিলেন।

নন্দিতার ছোটভাই সেকথা বলেছিল নন্দিতাকে। বলেছিল, 'বাবা এমন জেদী, পেয়েও বলছেন না 'তাই-তো, দেখছি—আমি ড্রয়ারে রাখিনি !' বরং কী বললেন জানো ? 'টাকাটা সে টাকা নয়, অন্য !' বাবার মুখের সামনে তো কথা বলা যায় না, নইলে জিজ্ঞেস করতে

কিন্তু খাওয়ার আয়োজনে নতুন কোনো রং পড়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না! এতক্ষণ ধরে তবে কী করলেন মহিলাটি? বলেই ফেলল, 'কী বৌদি? শাস্তিটা তো তেমন জোরালো দেখছি না? বিরামবাবু হয়তো ভাববেন একেই আমরা নেমন্তন্ন বলি!'

'ভাবুক গে!'

নন্দিতা অপরূপ ঝঙ্কারে হেসে উঠে বলে. 'তুমি কিন্তু ঠাকুরপো বড্ড বোকা! দেখছ আমার অবস্থা! তুচ্ছ ওই সব রান্নাবান্না নিয়ে সময় নষ্ট করতে যাবো আমি এখন?'

ধ্রুব মৃদু হেসে থালা টেনে নিয়ে বলে. 'তা বটে!'

'অথচ দেখ—' নন্দিতা আরো হাসিতে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে. 'এই লোকটা কী ছোটলোক! বলছে কিনা—দামী গাড়ী, চমৎকার বাড়ী, লক্ষ্মণ দেবর, অনুগত রামচন্দ্র, তোমার আবার অভাবটা কি? সুখের সাগরে ভাসছো তো তুমি!'

স্রেফ প্রেমের লীলাখেলা!

ধ্রুব ভাবে, ভালরে ভাল! তুমি না হয় বৌদি আছ, কিন্তু এ ভদ্রলোক তো আমার সদ্য পরিচিত। আমায় শিখণ্ডী করে এসব কেন বাবা!

তা সে কথা বোধ হয় বিরামও ভাবে।

তাই বলে, 'ঠাট্টা-তামাশাগুলো একটু বেশী স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে না? তোমার লক্ষ্মণ দেবরের পরিপাক শক্তিটা সে রকম জোরালো তো?'

'ঠাট্টাতামাশা!'

নন্দিতা তেমনি লীলাভরে হতাশার ভঙ্গী করে বলে, 'যাচ্চলে! সাধে আর তোমাদের সবাইকেই বোকা বলি আমরা! দেখছ আমার একেবারে স্মৃতির সমুদ্র উথলে ওঠা ব্যাপার, আর তুমি কি না বলছ ঠাট্টা? বুঝলে ঠাকুরপো, তোমার দাদাকে যখন চোখেও দেখিনি, তখন এই ছোটলোক লোকটার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি আমি!'

ধ্রুব মুখ থেকে জলের গ্লাস নামিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'সে তো

বুঝতেই পাচ্ছি। তবে ভেবে ঠিক করতে পারছি না, তথাপি আমার সেই নিতান্ত ভদ্রলোক দাদাটিকে ডুবজলে চোবাতে এলেন কেন?'

নন্দিতা উত্তর দেয়নি, শুধু হেসেই চলেছে। ধ্রুব ভাবছে হাসিটা অস্বাভাবিক। এরপর সন্ধ্যাবেলা বলে বসবে দারুণ মাথার যন্ত্রণা। হয়তো বলবে তাই।

কিন্তু এখন নন্দিতার মাথার যন্ত্রণা নেই। তা কোনো যন্ত্রণাই কি আছে? যন্ত্রণা থাকলে কেউ এত হাসতে পারে? হেসে খান খান হয়েই তো বলছে নন্দিতা, 'অভদ্র লোকটা বলছে, মেয়েদের কাছে পরম কাম্য বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী আর ক্রীতদাস স্বামী। সেই সবই তো তুমি পেয়েছ, আর খারাপ কিসের?' সাধে বলছি অসভ্য, সাধে বলছি ছোটলোক!'

'আমিও না বলে পারছি না—'

খাওয়ার পর নন্দিতা যখন ওকে জোর করে বিশ্রাম করতে দিয়েছে, তখন বিরাম বলে, 'আমিও না বলে পারছি না, বড্ড অসভ্য হয়ে গেছ তুমি আজকাল! ঈশ্বর জানেন কী ভাবল তোমার ওই ড্রাইভার!'

'এই দেখ যা সত্যি, যা স্বাভাবিক, তাই ভেবেছে। ও কী ভাবছে, তা আর ভাবতে পারি না বাপু।···বল এখন কোথায় ঘুরলে এতদিন? কী করেছিলে?'

'এক কথায় উত্তরটা দেওয়া শক্ত। ঘুরেছি অসংখ্য জায়গায়, করেছি অজস্র রকম কাজ!'

'অজস্র রকম! নির্ঘাত জাল জোচ্চুরী? আমার তো তাই ধারণা, নইলে এমন সাংঘাতিক ভাবে নিরুদ্দেশ কেন? উঃ! একটা ঠিকানা যোগাড়ের জন্যে কম চেষ্টা করেছি!'

বিরামের মুখটা বিদ্রূপে কুঁচকে ওঠে। 'গল্প বানানো অভ্যাসটা তোমার চিরকালই রয়ে গেল দেখছি নন্দিতা! অথচ মনে পড়ছে তুমিই যেন একদিন বলেছিলে, পাঁচশো টাকা হাতে করলে

ভারতবর্ষের শেষ সীমান্তে চলে যাওয়া যায়। বলেছিলে না? না কি আমারই ভুল?'

নন্দিতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, বলেছিলামই তো। কিন্তু সেদিন তুমি যাওনি। সেদিন তুমি আমায় ঠকিয়েছিলে! সেদিন তুমি পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে একটা চাকরিতে ঢুকেছিলে!'

'হ্যাঁ ওইটাই বোকামি!' বিরাম হেসে উঠে বলে, 'তখনো আশা করছিলাম। ভাবছিলাম যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। চাকরি বাকরি করছি ভদ্রঘরের ছেলে, এই পরিচয় নিয়ে যদি তোমার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।'

'বাবার কাছে! ফুঃ! বাবার জামাইয়ের মাসিক ইনকাম কত জানো?'

'জানি না, অনুমান করছি।'

'তবে? তুমি তৃণখণ্ড নিয়ে সমুদ্র পারের স্বপ্ন দেখছিলে!'

'বললাম তো—ওইটাই নির্বুদ্ধিতা!'

'তাইতো! তাইতো! একের নম্বর নির্বোধ তুমি! সাহস করে বলতে পারনি, পাঁচশো টাকার ভরসায় দুটো মানুষে ভারত সীমান্ত দেখা যায় কি না দেখি, এসো না নন্দিতা! পারনি। সেই দিয়ে ভেলা বাঁধতে গিয়েছিলে! ছি ছি!'

বিরাম আস্তে বলে, 'ভালই করিনি কি নন্দিতা? এই তুমি কী সুখে, কী গৌরবে রয়েছ, আর—সেটা! নাঃ, সে শুধু পাগলেই ভাল বলবে!'

'সুখ, গৌরব! অভিধানের অনেকগুলো শব্দ বেশ মুখস্থ করে রেখেছ দেখছি। নিজেই বা তাহলে সে সব অর্জন করতে চেষ্টা করনি কেন?'

'চেষ্টা?'

বিরাম হেসে ওঠে। 'ও-সব বস্তু কি চেষ্টা করে অর্জন করতে পারা যায়? ওসব ভাগ্যে দেয়!'

'কুড়েরাই ভাগ্যের দোহাই পাড়ে। আর ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বিনা টিকিটে ট্রামে ঘুরে বেড়ায়, বিনা পয়সায় ডাব খায়।'

বিরাম হেসে উঠে বলে, 'বিনা অপরাধে গালাগালও খায়। বুঝলাম আমি এক হতভাগা ভ্যাগাবণ্ড, রাস্তার জোচ্চোর, কিন্তু শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর কি করেছি বল? অথচ তিনি না-হক্ আমাকে পথ থেকে ধরে এনে কোর্টে পুরে যাচ্ছেতাই গালি পাড়ছেন বসে বসে।··· এরপরও ভাগ্য মানব না?···যাক্ অনেক তো হলো? এবার চলি।'

'তার মানে? অনুচ্ছেদগুলো সব মনে নেই বুঝি?

'অত পেরে উঠব না নন্দিতা! ছেড়ে দাও!'

'ছেড়ে দেব!'

হঠাৎ নন্দিতার দু চোখে জল টলটলিয়ে ওঠে, 'ধরে রাখতে পারলাম কবে যে ছেড়ে দেব?'

'যাক্ আর জ্বালাব না!'

'একটু বিশ্রাম করো। এই প্রচণ্ড রোদে পথে বেরিয়ে পড়ে শাস্তি দিও না বাবু! ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে চলে যেও।'

পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে আর ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায় নন্দিতা।

আর তার একটু পরেই, পাশ ফেরবার সময় খবরটা ধরা পড়ে বিরামের কাছে। ধরা পড়ে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠেই স্থির হয়ে যায়।

নন্দিতার গলার হারটা ক্লিপ কেটে পড়ে গেছে বিছানার ধারে।··· ওই ধারটাতেই বসেছিল নন্দিতা।

হারটা তুলে নিয়ে মুঠোয় চেপে তার ওজনটা অনুমান করে বিরাম। চার পাঁচ ভরির কম নয়। গোটা কয়েক দিন একটু নিশ্চিন্তে কাটতে পারে। মন্দ কি! নন্দিতার কাছে আমার সততার আর মূল্য কি?···তাছাড়া ঠিক এখানেই যে পড়েছিল তাই বা ভাববে কেন নন্দিতা? কত জায়গাতেই তো পড়তে পারে।

মুঠোর মধ্যে একটা সাপ চেপে ধরলো না কি বিরাম ?

বুকের মধ্যে কী অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে !

প্রথম যেদিন নন্দিতার হাত চেপে ধরেছিল মুঠোর মধ্যে, এমনিই শব্দ হয়েছিল না ?

বিরাম কি নন্দিতার অলক্ষ্যে চলে যাবে ?

বিরাম কি এটা নিয়ে পালাবে ?

না কি পকেটের মধ্যে রেখে অম্লানবদনে শুয়ে থাকবে, উঠে বসবে, হেসে হেসে চা খাবে, কবিত্ব করে বিদায় নেবে ?

ঘরটা প্রায় অন্ধকার। হারের ডিজাইনটা বোঝা যাচ্ছে না। এইটাই কি নন্দিতার গলায় ছিল এতক্ষণ ?

উঠে পড়ল। রাস্তার দিকের জানলার কপাটটা ঠেলে খুলে দিল, আলোয় ভরে গেল জায়গাটা। হারটা তুলে নিয়ে দেখল বিরাম। খুব নিরীক্ষণ করে দেখল, সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে। হারের ক্লিপটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে হঠাৎ কেটে যায়নি, খুব ধারালো একটা যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে সেটা এই মাত্র।

যন্ত্রটা কী ?

সুপুরি কাটা জাঁতি ?

বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

জানে, নন্দিতা অলক্ষ্যে থেকে লক্ষ্য করছে বিরাম না বলে পালাচ্ছে কিনা।

নন্দিতা তার অঙ্ক কষা ঠিক হল না দেখে বিভ্রান্ত হবে! মন্দ কি! বিরাম ঘুমোবে, বিরাম নন্দিতাকে বিভ্রান্ত করবে।

হয়তো সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিরাম।

নন্দিতা এসে ডাকলো, 'এই ওঠো, চা হয়ে গেছে!' বিরাম উঠে বসল। মৃদু হাসল। বলল, 'নন্দিতা, তুমি কি অসাবধান, গরীবকে কিছু দান করার ইচ্ছে ছিল তো পকেটে পুরে দিলেই পারতে, বিছানায়

ফেলে রাখতে আছে ? আর কারো চোখে পড়লে কি না কি ভেবে বসতো বলতো ?'

নন্দিতা লাল হয়ে ওঠে।

নন্দিতা হাত বাড়িয়ে হারটা ধরে ফেলে বলে, 'কা কাণ্ড ! পড়ে গেছে ? কখন পড়ল ?'

বিরাম হেসে উঠে বলে, 'কাটা জিনিস কখন যে পড়ে যায় সে কি টের পাওয়া যায় নন্দিতা ? তবে 'চার'টা আর একটু বুদ্ধিমানের মত ফেললেও পারতে !'

চার ! তাছাড়া আর কি ? বিরামের পকেটমারা যাওয়ার গল্পটা বিশ্বাস করবে কি না, স্থির করতেই কি এই বোকার মত কাজটা করে বসেনি নন্দিতা ?

মুরুব্বী

ঘণ্টুর যখন চার বছর বয়েস, ঘণ্টু যখন বাবা আদমের শিষ্য, তখন থেকে ঘণ্টু রোজগার করছে।

হোক দু তিন পয়সা, তবু রোজগার তো ?

বস্তিসুদ্ধ ছেলেমেয়ে চুপড়ি হাতে নিয়ে রেল লাইনের ধারে ছুটতো কয়লা কুড়োতে, ঘণ্টুও ছুটতো তাদের সঙ্গে কোমরের ঘুনসীতে বাঁধা ফুটো পয়সাটা নাচাতে নাচাতে।

বস্তির মধ্যেই যারা একটু অবস্থাপন্ন, অথবা যারা 'কামলায়েক' সন্তান, ঐশ্বর্যে বঞ্চিত, তারা কিনতো ওই কয়লা ঝুড়ি পিছু দু পয়সা চার পয়সা করে। আবার আশপাশের গরীব গৃহস্থঘরের মেয়েরাও কিনতো। এই ঝুড়ি ঝুড়ি পোড়া কয়লায় মাস চালিয়ে, স্বামীর কাছে কয়লা বাবদ দামটা ধরে নিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ হাতে রাখতো।

ঘণ্টুকে অনেকেই পছন্দ করতো, কয়লা কুড়নোর কাজে ঘণ্টু বড়গুলোর চাইতে কিছু কম নয়, কিন্তু হিসেবের বেলায় বুদ্ধু।

একখানা বাসি রুটি কি দুখানা শুকনো খটখটে পাঁউরুটির চাকা পেলেই এক চুপড়ি কয়লা ঢেলে দিয়ে আসতো সে।

কেউ কেউ বিবেকের মাথায় মুগুর মেরে ওইটাই 'শোধবোধ' বলে হিসেব মিলিয়ে নিতো, কেউ কেউ হয়তো বিবেকের কিঞ্চিৎ কামড়ে বলতো, 'কি রে ঘণ্টু চলে যাচ্ছিস ? কয়লার পয়সা নিবিনে ?'

ঘণ্টু আকর্ণ দাঁত ছড়িয়ে এতখানি হেসে বলত, 'হিঃ !'

দুটো তিনটে, যার যা ধর্ম, দিত ঘণ্টুকে।

ঘণ্টু তৎক্ষণাৎ পয়সাটা নিয়ে ভুজাওলার দোকানে গিয়ে দাঁড়াতো।

ওই গেরস্তদের বৌদেরই একজন একদিন একটা ছেঁড়া ফাটা হাফ প্যাণ্ট দিয়ে বলল, 'এই ঘণ্টু পর এটা। ছিঃ ! এত বড় ছেলে কিছু না পরে বেড়াস, লজ্জা করে না ?'

এযাবৎ কোনদিন লজ্জার বালাই ছিল কি না কে জানে, কিন্তু এই প্রশ্নে ঘণ্টুর মুখে লজ্জার ছোপ লাগল। মাথাটা কাত করে বলল, 'বুড়ী দেয় না।'

'আচ্ছা আমি দিচ্ছি, নে।'

ঘণ্টু সেটা নিল, এবং অনেক কসরৎ করে পরেও ফেলল। হাফ প্যাণ্টের পা দুটো গোড়ালির কাছে ঝুলতে লাগল, এবং কোমরটা একটা ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বাঁধতে হ'ল, তবু ভারী খুশী হ'ল ঘণ্টু।

সেই প্রথম সভ্য হওয়া ঘণ্টুর।

ঘণ্টু যাকে 'বুড়ী' নামে অভিহিত করে ধিক্কার দিল, সে ঘণ্টুর ঠাকুমা। ছেলে বৌ দুটোই মরেছে, নাতিটাকে সে আপদ বালাই ছাড়া আর কিছু ভাবে না। আসল সংসার তার মেয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে। ঘণ্টুর প্রতি মস্ত বদান্যতা, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত! ঘণ্টুর সেটাই অনেক।

চোখে পিঁচুটি, দাঁতে ছাতা, কানে পুঁজ, হাতে পায়ে শ্যাওলা-ধরা ঘণ্টু পরম আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। এই হাফ্ প্যাণ্টটার পর থেকে আনন্দ আরও বাড়ল। নিজেকে বেশ একটা মাতব্বর মনে হতে লাগল তার।

ক্রমশঃ প্যাণ্টটা তার গায়ের চামড়ায় পরিণত হতে থাকল।

কিন্তু কে জানে কার্যকারণের কি যোগসূত্র, অথবা কোন যোগসূত্রই নেই, আকস্মিকই, হঠাৎ ওই প্যাণ্টপরা ঘণ্টুর রোজগারের দিকে নজর পড়ল তার পিসি ফুলমণির।

অকারণেই তার কানটা টেনে ধরে বলল, 'এই ছোঁড়া, কয়লার পয়সা কি করিস রে?'

'আঁ—আঁ' করে কানটা টেনে নিয়ে ঘণ্টু বলল, 'মারছিস্ কেন? ঝাল চানা খাই।'

'না মারব না, পুজো করব? রাক্ষসের পেটে দু'বেলা দু' কাঁসি ভাত মারছ, তবু পেটের জ্বালা মেটে না?···ভাত অমনি আসে? কাল থেকে পয়সা আমায় দিবি।'

'না!'

ঘাড় গুঁজে বলল ঘন্টু।

সঙ্গে সঙ্গে গোঁজা-ঘাড় সোজা হয়ে গেল ঘন্টুর পিসির থাপ্পড়ে।

'না? মুখে মুখে চোপা! কাল থেকে খাস ভাত! ঠাকুমা কেমন দেয় সোহাগ করে, দেখব!'

বলাবাহুল্য শেষ পর্যন্ত জেদের লড়াইয়ে ঘন্টুর হার হ'ল। একবেলা ভাত পেটে না পড়তেই চোখে সর্ষে ফুল দেখল ঘন্টু। ভুজাওয়ালার দোকানে তার অভাব পূরণ হবার নয়।

পিসির কাছে মুচলেকা লিখে দিতে হ'ল ঘন্টুকে, কয়লার পয়সা আর মুড়ি চানা খেয়ে নষ্ট করবে না, সব পিসির হাতে এনে দেবে।

'তুমি শয়তান, তোমাকে বিশ্বাস নেই,' বলে পিসি পরদিন থেকে নিজের বছর দশেকের মেয়েটাকে লাগিয়ে দিল ঘন্টুর পিছনে চৌকিদারী করতে। কয়লা সে মেয়েটাও কুড়তো, তবে এই বয়সেই বাচালতায় পাকা হয়ে উঠেছিল বলে তের চোদ্দ বছরের ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ঘুরঘুর করত, মামাতো ভাইটার দিকে তাকিয়ে দেখত না। মায়ের নির্দেশে ওটার ওপর খবরদারি করতে গিয়ে দিদিগিরিটা ফলাতে শুরু করল ষোল আনা।

সঙ্গে করে নিয়ে যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি, গেরস্তদের বৌদের সঙ্গে কয়লার দাম নিয়ে দর কসাকসি করে, ছেলেমানুষ পেয়ে ওকে যে এযাবৎ ঠকিয়ে খেয়েছে তারা, একথা জোরগলায় ঘোষণা করে, এবং দরে না বনলে ঠিকরে বেরিয়ে আসে ঘন্টুকে নিয়ে।

ফলে এই হ'ল, বেচারা ঘন্টুর সেই বাসি রুটিটা-আসটা, শুকনো পাঁউরুটির টুকরোটা ঘুচল, মিষ্টি কথার পাওনাটুকুও ঘুচল। যারা ভালবাসত, তারা বলতে লাগল, 'আ-গেল ছোঁড়া, ইদিক নেই উদিক আছে, আবার একটা মুরুব্বী ধরে এনেছে!'

সুখের দিন শেষ হ'ল ঘন্টুর।

সেই অপ্রতিহত গতিতে বেড়ানো বন্ধ হ'ল, ইচ্ছেমতন কাজে যাওয়া বন্ধ হ'ল। এখন নিয়মিত সক্কাল না হতেই বড় একটা ঝুড়ি নিয়ে বেরোতে হয় তাকে এবং নিশ্ছিদ্র কাজ করতে হয়।

অন্যমনা হয়ে একবার রেলগাড়ী আসা-যাওয়া দেখলে,' কি একটা গরুর পিছনে হেট্ হেট্ করে ছুটলে, অথবা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে দু'দণ্ড বসে থাকলে পিসতুতো দিদি বাতাসী যত পারে হাতের সুখ করে নেয়।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, রোদের চেয়ে বালির তাত!

পিসির ভারী হাতের থাপ্পড়ের চেয়ে পিসির মেয়ের ছোট হাতের চড়ে জ্বালা বেশী। সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ একদিন ঘণ্টুর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল।

ভাবল, আমি কার? কে আমার?

ভাতের বদলে যদি রোজগারের পয়সাই ধরে দিতে হয়, তাহ'লে আর ঠাকুমা পিসির কাছে পড়ে থাকার দরকার কি?

বাতাসীর মুরুব্বীয়ানার নিচে আর নয়।

তাই হঠাৎ একদিন বাতাসীর চোখের সামনে দিয়ে একটা প্রায় চলন্ত রেলগাড়ীতে চেপে বসল ঘণ্টু।

লোক্যাল ট্রেন, যখন তখন থামে, যে কোন জায়গায় অকারণে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুষ্ট ছেলেগুলো সেই থামা গাড়ীর মধ্যে দিয়ে ওঠে নামে, এটা কিছু নতুন নয়, তবে গাড়ীটা নড়ে ওঠার পরও যখন ঘণ্টু নড়ল না, তখন বাতাসী ভাঙাকাঁশি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অ মুখপোড়া, হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, গাড়ী ছেড়ে দেবে যে!'

বলাবাহুল্য এতে ঘণ্টু ভীত হ'ল না।

বাতাসী চেঁচাতে লাগল, 'ফিরলে তোর পিঠে কুলো ভাঙবে মা, তোকে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠাবে, তোর মুখে বাসি 'আকা'র ছাই দেবে—'

ঘণ্টু এহেন ভীতি প্রদর্শনেও দমল না। বরং জানালা দিয়ে মুখ

বাড়িয়ে দিদির দিকে একটু ভেঙচি কেটে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাল। আর সেই মুহূর্তেই নিশ্চিত হ'ল বাতাসী, ঘণ্টু আর ফিরবে না।

না, ঘণ্টু আর তার জন্মস্থানে ফিরল না। সাত বছরের ঘণ্টু নিরঙ্কুশ স্বাধীন হ'ল।

নেমে পড়ল যেখানে ইচ্ছে।

স্টেশনটার নাম জানে না, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কোনদিন চায়ের দোকানের ধারে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে একটু চা রুটি খায়, কোনদিন স্টেশনের রেস্টুরেন্টের ধারে কাছে তীর্থের কাকের মত বসে থেকে তলানি ভাত ডাল কিছু জুটিয়ে নেয়।

তবু বড় আনন্দ!

নিত্য নিয়মিত কয়লার ঝুড়ি নিয়ে ছুটতে হয় না, ঠাকুমা, পিসি আর দিদির চোখ রাঙানি খেতে হয় না, এ কি সোজা সুখ? এই সাত বছর বয়সেই দিব্যজ্ঞানী ঘণ্টু বুঝে নিল, মাথার ওপর ওপরওলা না থাকাটাই হচ্ছে চরম সুখ।

কিন্তু সুখ কদিনের?

এই দুঃখময় ধরাধামে সুখের মত নশ্বর আর কি আছে?

স্টেশনের চা-পানওলাটা একদিন ওকে ডেকে অকারণেই এক ধমক দিয়ে বলল, 'এই ছোকরা, রোজ রোজ মাগ্না খাবি না কি? কাজ কর।'

খাওয়াটা খুব একটা কিছু হচ্ছিল না, তাই ঘণ্টু প্রথমেই ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'এঃ, ভারি তো খেতে দেয়!'

'ভারি খেতে দেব! ও হো হো, মরে যাইরে! আমার বাবার ঠাকুর চোদ্দপুরুষ, গুরুবংশের নাতি! তোমায় আমি ভারী ভারী খেতে দিইনি বলে গোঁসা হয়েছে? আহা-হা-হা-হা! তা বাপ কী খেতে চাও? বিরিয়ানি? মোরগ মসল্লা? চিংড়ির কাটলেট?'

ঘণ্টুর জ্ঞানের জগতে এসব খাদ্যের নামের প্রবেশাধিকার নেই, ঘণ্টু তাই বিরক্ত স্বরে বলে, 'দুবেলা ভাত দাও তো কাজ করতে পারি।'

লোকটা দেখল মন্দ না।

মাইনের কথা তুলল না ছোঁড়া, জানেও না। শুধু পেটভাতায় মন্দটা কি? রাতদিন চায়ের বাসন ধোয়া, ভাঁড় ধোয়া, কেটলীকে চকচকে করে মাজা, তাছাড়া পান সাজা! উদয়াস্তই কাজ দেওয়া যাবে।

একটুকরো কারবলিক সাবান দিল, একটা নতুন ইজের আর গেঞ্জি দিল ঘণ্টুকে সে।

সাবান দিয়ে গা হাত ধুয়ে নতুন ইজের গেঞ্জি পরে, ঘণ্টু যেদিন দোকানের নিচে টুলে পা ঝুলিয়ে বসল, নিজেকে পৃথিবীর সম্রাট মনে হ'ল ঘণ্টুর।

কাজটাও তার ভালই লাগল।

অন্তত কয়লা কুড়নোর থেকে হাজার গুণ ভাল।

দু'বেলা কেন, চারবেলাই খেতে পায়, কাজ প্রচুর করে বলে বকুনিও কম খায়, মোটামুটি সুখের অবস্থা। কিন্তু সেই!

সেই সুখের নশ্বরতা!

কপাল ভাঙল। মুরুব্বী জুটল।

আর এক চা-ওলা ফুসলোতে লাগল 'বিনি মাইনেয় খাটিস্ কেন রে?'

ঘণ্টু টুলে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'মাইনে নিয়ে কি করবো? সবই তো দেয়।'

'আরে বুদ্ধু! সবই তো দেয় বলে অমনি খাটবি?'

'ও ঠিক আছে!'

'এখন তো ঠিক আছে। বলি হঠাৎ যদি ছাড়িয়ে দেয়, তখন তোর হাতে কি থাকবে? ঘোড়ার ডিম?'

'ছাড়িয়ে দেবে কেন?'

'দেবে কেন! ওরে বাবা! সগ্গো থেকে পড়ল যেন! যখনই কেনাকাটায় মন্দা পড়বে, তখনই তোর ভাতের পিণ্ডিটা ভার ঠেকবে। তোর মতন এমনি কত ছেলে এল গেল!'

'ঠিক আছে, মাইনে চাইব।' বলে আবার পা দোলাতে লাগল ঘণ্টু।

কিন্তু মাইনে চাওয়ার পরের অবস্থাটা আর তেমন মোলায়েম থাকল না। মনিব তাকে বেধড়ক পিটলো এবং শাসালো, 'দেখি তুই এ তল্লাটে কোথায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের কাজ পাস?'

ঘণ্টুর চাহিদা যে মাত্র পাঁচ টাকা, একথা গায়েই মাখল না মনিব, ঐ পঞ্চাশ টাকার ওপরই জোর দিতে লাগল। স্টেশন সুদ্ধু লোক মজা দেখতে লাগল, আর যে ঘণ্টুকে তাতিয়েছিল, সে হি হি করে হাসতে লাগল।

আবার রেলগাড়ীতে উঠল ঘণ্টু।

বিনাটিকিটের যাত্রী। সেবারে ধরেনি, এবারে চেকার ধরল।

কিন্তু ঘণ্টুর চেহারা দেখে তার কাছ থেকে কিছু আদায়ের আশা নেই বুঝেই বোধকরি চেকার সাহেব ঘাড়ে দু ঘা রদ্দা দিয়ে বললেন, কাজ, করবি?'

ঘণ্টু এখন চালাক হয়েছে, তাই বলল, 'মাইনে দিতে হবে।'

'ওরে বাবা! এ যে বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপনা চক্কর! মাইনে দেব না বলেছি তোকে? তা কত দিতে হবে বাপ? একশো? দুশো?'

'পাঁচ টাকা তো দেবে?'

ইদানীং চেহারাটি বেশ গাঁট্টাগোট্টা হয়েছিল, মালুম হচ্ছে কাজ আদায় হবে। চেকার সাহেব খুশি হলেন। এইখানেই তাঁর শালার বাড়ীতে লোকাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কান টানতে টানতে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিলেন ঘণ্টুকে।

শালাও রেল কর্মচারী।

রেল কোয়ার্টার্সে কাজ, দোতলা একতলা নেই, খুব একটা কাজও নেই, শালাজ বৌ মানুষটা স্নেহময়ী! চারবার কেন ছেলেপুলের সঙ্গে

সাতবারই খেতে দেয়, যখন যেটুকু ওরা খাচ্ছে, ঘণ্টুকেও দিচ্ছে। তাছাড়া নিষ্ঠুরের মত খাটায়ও না।

ভাল শার্ট ধুতি কিনে দিয়েছে, বিছানা মশারি দিয়েছে, ঘণ্টুর বলতে গেলে তূরীয় অবস্থা !

মাসের শেষে মাইনে পাঁচ টাকা পেতেই ঘণ্টুর সব দাঁত কটা বেরিয়ে পড়ল। মনে হ'ল জীবনের জোর পাওয়া বুঝি পেয়ে গেছে। কিন্তু টাকা নিয়ে সে করবে কি ? টাকার সার্থকতা তো খাওয়ায়, সে তো পাচ্ছেই সর্বদা। বলল, 'ও তুমি রেখে দাও।'

'আমি রেখে দেব কি রে ? তোর মাইনে তুই নিবিনে হাতে করে ?'

'দূর ! আমি কোথায় রাখবো ? বাতাসে উড়ে যাবে কি ইঁদুরে খাবে ঠিক কি ?'

মনিব-গিন্নী হাসতে হাসতে তুলে রাখল। পাড়ায় গল্পও করল ছেলেটার সরলতার। বলে কি না 'টাকা বাতাসে উড়ে যাবে কি ইঁদুরে খাবে' !

মাস তিনেক।

বিধাতা আবার মুরুব্বী জোটালেন ঘণ্টুর। পাড়ার আর একজনদের চাকর। সে ভুজুং দিল 'তুই তো মুখ্যুর ডিম, গুনতেও জানিস না। ক'মাসের টাকা জমে কত হয় জানিস ?'

ঘণ্টু লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'মা জানে।'

'মা জানলে তো সব হ'ল ! ক'মাস কাজ করেছিস তুই এখানে ?'

'তা কে জানে ! ত্যাখন তো শীত-শীত বেলা ছিল—।'

'চমৎকার ! বলি শোন, টাকাটা চেয়ে নে। বল আমার যা হয়েছে আমাকে দিয়ে দাও, আমি আংটি গড়াব।'

আংটি !

ঘণ্টুর মনে হ'ল সে যেন কোন স্বর্গলোকের গান শুনলো। হেসে নেচে এক পাক ঘুরে নিয়ে বলল, 'আংটি কোথায় ?'

'আ মর ছোঁড়া! কোথায় আবার? স্যাকরার দোকানে! তুই টাকাটা তোর মায়ের কাছ থেকে বার করে আন, আমি কিনে দেব। কিন্তু খবরদার আমার নাম করিস না।'

নিষেধবাণী মনে রাখল ঘণ্টু।

নাম করল না প্ররোচনা-দাতার। টাকাটা চাইল। 'আংটি কিনবো, টাকা দাও।'

মনিব-গিন্নী তো হেসেই খুন, 'আংটি কি রে? কে নাচাল তোকে?'

'নাচ কিসের? আংটির ইচ্ছে হয়েছে।'

'কী মুস্কিল! তুই কি সোনা চিনিস, না দাম জানিস? নির্ঘাৎ কেউ তোকে ঠকাবার তাল করছে। ওসব কথায় ভিজিস না। আংটি কিনতে হয় বাবু কিনে দেবেন।'

বাবু কিনে দেওয়াটা—নেহাত সুদূরপরাহত মনে হ'ল ঘণ্টুর। এই দণ্ডে হ'লেই ভাল হয়। নিজের আঙুলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আর ধৈর্য ধরা কঠিন হ'ল।

রাগের মাথায় বলে বসল ঘণ্টু, 'তার মানে তুমি আমার টাকাটা দেবে না, ভোগা দিয়ে নিয়ে নেবে।'

এরপর আর মনিব-গিন্নীর হিতৈষী হওয়া সাজে না।

ভারী ভারী মুখে তিন পাঁচে পনরোটা টাকা ফেলে দিলেন তিনি। ঘণ্টু নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

বিকেলবেলাই আংটি হাতে পরে বাড়ী ফিরল ঘণ্টু, হাত ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখাতেও এল, মনিব-গিন্নী ভারীমুখে বললেন, 'বেশ হয়েছে!' বললেন না—'আংটিটা যে ডাঁহা পেতলের রে!'

কিন্তু ঘণ্টুর কাছে সোনাই বা কি? পেতলই বা কি?

পরের মাস থেকে ঘণ্টু দশ টাকা মাইনে চাইল।

মনিব-গিন্নীর মেজাজ খারাপ ছিল, এবং বুঝছিলেন কুপরামর্শে পড়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে ছোঁড়া। রাগ করে বললেন, 'দশ টাকা দিতে যাব কেন রে?'

'দেবে না কেন? সব বাড়াতে তো চাকরদের দশ বারো কুড়ি প'চিশ মাইনে, তুমি আমায় বোকা পেয়ে ঠকাচ্ছ।'

রাগে দিশেহারা হলেন ভদ্রমহিলা।

কার্যকারণ বুঝেও হলেন। বললেন, 'যা বেরো, যেখানে পঁচিশ টাকা মাইনে পাবি, যা সেখানে। সাত বার করে খেতে দেবে, রাত দিন ঘুড়ি ওড়াতে লাট্টু ঘোরাতে মার্বেল খেলতে দেবে, আর পঁচিশ টাকা মাইনে দেবে, এমন বাড়ী খুঁজে বার করগে যা।'

মুরুব্বি ওকে একটা চাকরি ধরিয়ে দিল, দু'দিন কাজ করেই 'বাপ-বাপ' করে কাজ ছেড়ে চলে আসতে হ'ল ঘণ্টুকে। অত কাজ তার বারো বছরের হাড়ে সওয়া সম্ভব নয়।

এ-দোর ও-দোর করে অবশেষে কাঁচড়াপাড়া ছাড়ল ঘণ্টু। আর এই প্রথম ঘণ্টুর চোখ দিয়ে একটু জল গড়িয়ে পড়ল।

তারপর অনেক বানের জলে ভাসল ঘণ্টু, অনেক ঘাটের জল খেল, অনেক মুরুব্বীর হিতৈষণায় পড়ে জেরবার হ'ল, শেষ অবধি হাতে টাকার অভাবে হাতের আংটি বেচতে গিয়ে, পেতলের আংটি সোনা বলে চালান'র দায়ে হাজতে গেল। এই পর্যন্ত ঘণ্টুর বাল্য-ইতিহাস।

অনেকদিন পরে ঘণ্টুকে দেখতে পাওয়া গেল। কলকাতার রাস্তায় ফল বেচছে ঘণ্টু।

ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, ইয়া বুকের ছাতি, কে বলবে যে দুঃখু ধান্ধা করছিল এতদিন! হয়তো সবাই নির্দয় বলে যৌবন ওর প্রতি সদয়তা দেখিয়েছে।

এতদিনে আদর্শ জীবন পেয়েছে ঘণ্টু। এই জীবনই তার আজীবনের কাম্য।

কলকাতা শহরে নালার পাঁক বেচলেও পয়সা, কাজেই ফল বেচে পয়সা নেহাত কম হয় না।

ঘণ্টু দৈনিক খরচা দিয়ে হোটেলে খায়, যেদিন ইচ্ছে সিনেমা দেখে, পয়সা বাজি ধরে তাসের জুয়া খেলে, আর একটা বড়লোকের বাড়ীর

গাড়ী বারান্দার নিচে ঘুমোয় এবং রাস্তার কলে স্নান করে। এর চাইতে আদর্শ জীবন আর কি আছে ?

ঘণ্টুর মুখে হয় বিড়ি, নয় হিন্দী সিনেমার গানের কলি।

ঘণ্টুর যেদিন ইচ্ছে না হয় ডালা নিয়ে বেরোয় না, রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, ধারে ভাত খায়, ধারে পান বিড়ি খায়।

তা ধার তাকে দেয় ওরা।

কারণ ঘণ্টু যে দিলদরিয়া ! ঘণ্টু ছ' পয়সার পান খেয়ে দশ পয়সা দিয়ে চলে আসে, এক টাকা তিন আনার পরটা খেয়ে পাঁচ সিকে হামেসাই দেয়। ঘণ্টু ধার দিয়ে মুখ ফুটে ফেরত চায় না।

বেপরোয়া স্ফূর্তিবাজ এই ছোকরাকে সবাই ভালবাসে।

তবে হ্যাঁ, এক বিষয়ে ভারী চালাক হয়েছে ঘণ্টু। মুরুব্বীয়ানার কবলে আর পড়ে না কিছুতেই।

সর্বস্ব রসাতলে যাক্ তার, কারুকে ওপরওলা হতে দেবে না।

তাসের আড্ডায় এক বন্ধু ভুজুং দিয়েছিল কিছুদিন, টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়িয়ে দেবে। বলে, 'টাকায় টাকা সুদ, এবেলা ওবেলা ডিম পাড়বে, ছানা দেবে ! দশটাকা ছাড়, দশদিনে একশো টাকা করে দেব।'

ঘণ্টু অটল।

বলে,'না ব্রাদার, ডিমে কাজ নেই, ছানায় কাজ নেই—বেশ আছি।'

বেশ আছে। আছে খায়, না থাকে খায় না, বেশ আছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কী যে হল, খামোকা ভাল থাকায় ঘুণ ধরল ঘণ্টুর। ঘণ্টুর মনে হতে থাকল কোন কিছুর মানে নেই।

কেন রোজ ফল বেচতে বেরুবে ঘণ্টু, কেন হোটেলে গিয়ে খাবে, কেন তাস খেলতে গিয়ে হারবে কিংবা জিতবে, আর কেনই বা সন্ধ্যে হ'লে সিনেমা হলে গিয়ে ঢুকবে, কি গান ভেঁজে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াবে ?

যেটাই পরম সুখ ছিল ঘণ্টুর, সেটাই চরম অর্থহীন মনে হতে লাগল।

অথচ কারণটা—মানে তাকেই যদি কারণ ধর, সামান্যই। রাস্তার যে কলে চান করতে যায় ঘণ্টু, সেখানে একটা মেয়ে রোজ ঘণ্টাখানেক ধরে কল আটকে থাকে, বাসন ধোয়, কাপড় আছড়ায়, কৌশল করে গায়ে মাথায় শাড়ী জড়িয়ে চানও করে নেয়। রোজই তার যেন ঘণ্টুর সময়টাই সময়।

সয়ে সয়ে একদিন ঘণ্টু মুখ ছোটাল, 'আ গেল, এ যে দেখি কলতলায় মৌরুসী নিয়েছে! বলি লোকের কাজ নেই? যত কাজ তোমার?'

মেয়েটা এই হঠাৎ আক্রমণে কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ল না। ঘাড় ঘুরিয়ে, মুখ বাঁকিয়ে, চোখের একটি অপরূপ ভঙ্গী করে বলে উঠল, 'লোকের তো ভারী কাজ! না বৌ, না ছেলে, না ঘর, না সংসার, থাকুক না দু' ঘণ্টা বসে!'

অনেক দিন আগে একবার ঘণ্টুর চোখে জল এসেছিল, কেন কে জানে—আজও এল। হয়তো ওই মেয়েটা নিতান্তই মেয়েমানুষ বলে, আর সেই কারণেই ঘণ্টু নিরুপায় বলে এই আক্ষেপ।

অথবা, যে 'না থাকাটা' ঘণ্টুর কাছে পরম আনন্দের, সেই 'না থাকাটা' অন্যের কাছে এমন তাচ্ছিল্যের, তাই দেখেই ঘণ্টুর চোখ ভিজলো, কে জানে।

মোট কথা, ঘণ্টু জ্বালাকরা চোখ নিয়ে বলে উঠল, 'আর নিজেরই বুঝি সব আছে?'

মেয়েটা অগ্রাহ্যের ভঙ্গীটা আরও জোরালো করে বলল, 'থাকবে না কেন? মা আছে, বাপ আছে, ভাই বোন আছে।'

ঘণ্টু ভেঙচে বলল, 'আছে তো সগ্‌গে বাতি! আমার নেই তো তোর কি?'

'আমার আবার কি? লোকে হাসে তাই গায়ে লাগে। একের নম্বরের বুদ্ধু একটা! বন্ধুরা ষড় করে বাজি হারিয়ে তোকে ঠকায়, ধার নিয়ে দেয় না, ছিঃ!'

এই কথা !

কারণ বললে, কারণ ! না বললে নয় ।

মনভাঙার সূত্রপাত কিন্তু সেই দিন থেকে ।

যে ঘণ্টু একদা বলেছিল, সব যায় যাক, সে হঠাৎ বন্ধুদের এই নিষ্ঠুরতায় ভেঙে পড়ে। তাসের আড্ডার ওরা ডাকতে আসে, ঘণ্টু বলে, 'শরীর ভাল নেই ।'

ওরা ধার চায়, ঘণ্টু বলে, 'পয়সা নেই ।'

ওরা বলে, 'হ'ল কি ঘণ্টার ?'

ঘণ্টু নিজেও জানেনা হ'ল কি ? তবে সিনেমায় আর আকর্ষণ নেই তার, গলায় নেই গান। হোটেলে একবেলা যায় তো আর বেলা যায় না ।

শুধু নিত্যনিয়মে ফলের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বেরোয় ধীর মন্থর গতিতে। ফলশ্রুতি টাকার গেঁজেটা উত্তরোত্তর স্ফীত হচ্ছে । আগমন আছে, বহির্গমন নেই ।

কিন্তু তাতেই বা কি ? জীবনেরই যার মানে নেই, টাকাতেই বা লাভ কি তার ?

মেয়েটা কলতলায় থাকলে, ধারে কাছে আর যায় না তার ঘণ্টু, অথচ সেই কলতলাটাই যেন সহস্রবাহু হয়ে টানতে থাকে ঘণ্টুকে ।

নিজের হৃদয় রহস্য বুঝতে অপারগ ঘণ্টু দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যেতে বসল। এই সময় হঠাৎ একদিন মেয়েটা এসে বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে বলল, 'এই, আর কলে যাস না যে ? রাগ ?'

ঘণ্টু মাথা নাড়ল ।

'তবে ?'

তবে কি, সে উত্তর না দিয়ে ঘণ্টু হঠাৎ এক কিম্ভূত কাজ করে বসল। কোমর থেকে গেঁজেটা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে উঠল, 'নে ।'

বাচাল মেয়েটা সহসা ভয় পেল ।

গেঁজেটা ফেলে দিল।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'তোর টাকা আমি নিতে যাব কেন?'

ঘণ্টু মাটিতে পড়ে-যাওয়া গেঁজেটা ফের কুড়িয়ে নিয়ে কৃতার্থমন্যের হাসি হেসে বলল, 'শুধু শুধু কি আর নিবি? বদলিতে আমার যা নেই তা দিবি। ঘর, সংসার, বৌ! আর এই বুদ্ধুটার মুরুব্বী হবি, যাতে কেউ না তাকে ঠকিয়ে খেতে পারে।'

ধাক্কা

'পুরনো কাপড় ?'

বিশাখা বেজার মুখে বলে, 'এইতো একবেলা মাত্র কাজে ঢুকেছ, এক্ষুনি আদায়ের চেষ্টা ? তোমাদের ধন্যবাদ বাবা ! কাপড় কোথায় পাবো ? কাপড়-ফাপড় নেই ।'

বলে বেজার মুখটা আরো বেজার করে ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে শাকের গোছাটা নিয়ে কুচোতে থাকে বিশাখা। তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা সেরে নেবে, তা নয়, এখন এল ব্যস্ত করতে ।

কিন্তু বিশাখার এই বিরক্ত ভঙ্গীতে কি কাপড়ের উমেদার আহত হয়ে চলে যাবে ?

তা যায় না।

অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে তাড়ানো অত সোজা নয়। প্রচলিত প্রবাদে আছে, 'জানি না, পারি না, নেইকো ঘরে, এ তিন কথায় দেবতা হারে ।'

তা' দেবতা হয়তো হারতে পারেন, যতই হোক মান-সম্মান আছে তাঁদের, কিন্তু মানসম্মানহীন মানুষ ? তাদের হারাতে হলে পাথর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই হাড়ির হালের প্রতিমূর্তি নতুন ঝিটা যখন বিশাখার ওই বিরক্তির অভিব্যক্তিকেও উপেক্ষা করে বলে উঠলো, 'হেই মা, ছাও একখান পুরোন-ধুরোন কাপড়, তোমাদের হাত ঝাড়লেই পর্বত, গরীবকে একখানা দিলে তোমার দশখান হবে', তখন মুখটাকে পাথরেই পরিণত করতে হয় বিশাখাকে।

পাথুরে পাথুরে গলাতেই বলতে হয়, 'তোমার কাছে শাস্ত্রকথা শুনতে বসিনি শোভার মা ! পুরনো কাপড় আমার নেই। তোমরা বাবা বড্ড আদায়বাজ !' শোভার মা তবু নড়ে না।

বোধ করি কাতরতার অঙ্কুশ বিদ্ধ করে ওই পাথর গলাবার বাসনায় কাতর করুণকণ্ঠে বলে, 'মাগো, এই মাটি ছুঁয়ে দিব্যি গালছি মা,

আদায় করতে নয়, '—'লজ্জা নিবারণের যুগ্যি দ্বিতীয় একখান নেই ঘরে। এই কানিটুকু পরেই ছ্যান্ করছি, গায় শুকোচ্ছে।'

বিশাখা আরো পাথর হয়।

বলে, 'তা এতদিন তো চালাচ্ছিলে? আমার বাড়িতে এসেই একেবারে অচল অবস্থা হলো? আগের মনিবরা দেয়নি?'

'ও মাগো, সকালে যে বলনু তোমায়, আজ দু'মাস ঘরে বসে আছি, রোগে রোগে খুলে খাচ্ছে। ঘরের ঘটিটা বাটিটা অব্দি বেচে বেচে চালিয়েছি।···ন্যাকড়া-কানি যা ছেলো, সব 'উলি ডুলি' হয়ে গেছে। হক্ বলছি মা, রাস্তা দে আসতে মাথা কাটা যায়!'

মাথা যে কাটাই যাওয়া উচিত তা বিশাখাও দেখেছে, কিন্তু ছুঁড়ির শরীরের অবস্থাও তো দেখছে সে।······ক'দিন কাজ করতে পারবে ওই হাড়ের খাঁচা-খানা? বিশাখার এই ঘরবাড়িটা পুরো মুছে তুলতেই তো ওর ঘাম ছুটে গেছে ওবেলা। তা ছাড়া বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা, মশলা পেষা, আছে তো সবই। পারবে না। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থা বলেই আপাততঃ ঢুকিয়েছে ওকে বিশাখা, ভালমত একটা লোক পেলেই বিদায় দেবে। তবে আবার পুরনো শাড়ীটা বরবাদ দিতে যাবে কেন?

অবিশ্যি স্বাস্থ্য শক্তি একটু থাকলে একেই রাখতো। চটিপরা, ব্লাউসপরা, ডুরে শাড়ীপরা ঝি দেখে দেখে, আর তাদের বাক্যি শুনে শুনে, হাড়-মাস কালি হয়ে গেছে বিশাখার, তবু তারা কাজে ওস্তাদ। এই রোগা হ্যাংলা দীন দুঃখী-গুলো সেদিকে যে চরম বিরক্তিকর! কাজ নিয়েই তো দরকার। বলে, তোর পায়ে পড়ি, না তোর কাজের পায়ে পড়ি। আগের ঝিটার কাজ ছিল যেমন, অহঙ্কারও ছিল তেমন।··· বিশাখা একদিন বলেছিল, 'বাসি রুটি আছে সন্ধ্যার মা, নিয়ে যেও।' সে মুখের ওপর জবাব দিয়েছিল, 'বাসি রুটি সাতজম্মে খাই না মা, কে মরবে আমাশা হয়ে!'

শুনে ইচ্ছে হয়েছিল বিশাখার তক্ষুনি ছাড়িয়ে দেয়, কেবলমাত্র

কাজের কথা ভেবেই চুপ করে থেকেছে। সে হিসেবে এই ছুঁড়িটা মন্দ ছিল না। কিন্তু রুগ্ন নিয়ে কি হবে?...ত'ছাড়া ভাবল বিশাখা—হাড়-দুঃখী মানুষও দু'চক্ষের বিষ বাবা!

অতএব?

অতএব ছাড়াতেই হবে।

অতএব পুরোনো কাপড় অযথা ব্যয় করা চলে না।

অতএব বলতেই হয়, 'তা' আমি আর কি করবো বাছা! পুরনো কাপড় নেই। নতুন তো আর কিনে দিতে পারি না? দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছো কেন? কাজে হাত দেওগে?'

বিশাখা এবার চুড়ি বাজিয়ে আলু ছাড়ায়।···তবে দুঃখী মানুষ রাখায় আর একটা সুবিধে, ভাবল বিশাখা, একটু মুখের সুখ করে নেওয়া যায়। এক কথা বললেই ফোঁস্ করে উঠে একশো কথা শুনিয়ে দেয় না।···তবু—'

ওই 'তবু' নিয়েই বিশ্ব-সংসারে এত জ্বালা!

শোভার মারই কি মনে হচ্ছিল না, দূর ছাই, কাজে দরকার নেই আমার। এমন নিষ্ঠুর মনিব!

শেষ পর্যন্ত ওই 'তবু'—

চোখের জল মুছতে মুছতে শোভার মা বাসন মাজতে বসে কলতলায় গিয়ে।

ভগবান, দুঃখীর যে কেন রোগ দাও? ছমাস ধরে না ভুগলে তো এত দুরবস্থা হতো না তার! সব কষ্ট সওয়া যায়, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে রাস্তায় বেরোনোর কষ্ট বড় অসহ্য কষ্ট!

তবু শোভাটাকে তার মাসীর কাছে রেখে দিয়েছে তাই রক্ষে, নইলে—

বিশাখার বড় মেয়ে কলেজ থেকে ফিরে দুলে দুলে চুল বাঁধছিল। মার কাছে এসে বলে, 'পুরনো শাড়ী একটা দিলেই পারতে মা, বড় বিশ্রী ছেঁড়া পরে এসেছে।'

বিশাখা বিরক্ত স্বরে বলে, 'ওদের ওই স্বভাব ! অভাব দেখাবার জন্যে বেছে বেছে ওই রকম পরে—স্রেফ 'ফর শো।'

'তা' হলেও একটু দিলে-টিলে তোমার হাতে থাকতো। যা সব অহঙ্কারী ঝি থাকে তোমার ! তার থেকে'—

'যা যা তুই আর আমায় জ্ঞান দিতে আসিস নি।' বিশাখা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'আমি বলে আজ বাসনওলিকে আসতে বলে দিয়েছি, কাঁচের ডিশ আনবার জন্যে। একে একে চার পাঁচখানা ভালো ভালো ডিশ ভেঙে চুর হয়েছে—'

বলতে বলতেই বাসনওয়ালীর তীক্ষ্ণকণ্ঠ বেজে ওঠে, 'কই গো—বৌদি ! বাসন রাখবেন না কি ?'

'ওই এসে গেছে'—বিশাখা আনন্দমধুর কণ্ঠে বলে, 'আয় বোস। আমার ডিশ এনেছিস ?'

'এনেছি বৈকি বৌদি ! আমাকে অর্ডার করলে জিনিস পেতে দেরি হয়েছে কখনো ?'

বিশাখার বড় মেয়ে ওখান থেকে হেসে হেসে বলে, 'তা আর দেরি হবে কেন ! তার বদলে তুমি যে এক বস্তা কাপড় পাবে। মাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে তুমি তো দিব্যি—'

বিশাখা বকে ওঠে, 'তুই থামবি ?'

'থামছি বাবা ! থামছি। রাম ঠকা ঠকো তাই বলি !'

বিশাখা চাপা গলায় বলে, 'ঠকা আবার কি ? সবটাই লাভ। গেরস্থর ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে যা আসে তাই ভাল !'

'বেশ বাবা ! কর লাভ, মোট কথা আমার নতুন শাড়ীগুলো না দিয়ে দিলেই হলো !'

'হ্যাঁ, তাই দিয়ে দেব।'

বলে বিশাখা পুরনো কাপড়ের বস্তা খুলে ছড়ায়। অনেক শাড়ী জমিয়ে ফেলেছে বিশাখা দুই মা মেয়ের ভাঁড়ার থেকে !

এই বাসনওয়ালীটা একটু বেশী নেয় বটে, তবে জিনিস আনে চমৎকার!

বিশাখাও তার চমৎকার পাড়ের চমৎকার শাড়ীগুলো ভাঁজ খুলে দেখায়,—'দেখছিস? দেখতে পাচ্ছিস? কোনোখানে কোনা ছেঁড়া নেই। আমার কাছে সেরকম কাপড় পাবি না।······এখন বল কখানা কাপড় নিবি?'

বলা বাহুল্য বাসনওয়ালী একটা অসম্ভব দামই হাঁকে।

বিশাখা বলে ওঠে, 'কী রে, গলায় ছুরি দিতে চাস? ওই চারখানা ডিশে তেরখানা কাপড়? ছ'খানা কাপড় আর দুটো জামা নে।······ জামা নিবি না? তোর বড় দেমাক!······নে আটখানা কাপড় নে! তাও দিবি না? বারোখানা! ······তুই এত জেদী কেন বল্‌তো? দে দশখানায় দে। আর একখানাও না। আর না চাস তো নিয়ে যা তোর জিনিস। আর নেই আমার। এই ভালো ভালো পাড়ের শাড়ী'—

হঠাৎ বিশাখার বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ওঠে, 'আঃ শোভার মা, এখন তুমি আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে এলে ছাই ফেলতে! ধন্যি বাবা!······ নাও বাসনওলি, একটু পাশ দাও।'

শোভার মার সামনে এই পুরনো শাড়ীর পাহাড় উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়ায় রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় বিশাখার। তাই অন্য পথে রাগটা প্রকাশ করে। 'অত বাসন এক্ষুনি মাজা হয়ে গেল তোমার?'

শোভার মা কিন্তু নির্বাক।

শোভার মা দাঁড়িয়ে পড়ে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে থাকে সেই লাল নীল সবুজ কমলা ফুল পাড়, চুড়ি পাড়, ডুরে রঙিন শাড়ীর সমারোহ!

'সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' বিশাখা বিরক্ত ভাবে বলে, 'এক্ষুনি তোমার ওই ছাই মাটির ফোঁটা পড়বে। যাও ফেল গে যাও!'

শোভার মা আস্তে আস্তে চলে যায় গামলা ভর্তি ছাই মাটি এঁটো নিয়ে।

বিশাখা বাসনওয়ালিকে নির্দেশ দেয় তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে ফেলতে। শোভার মার তাকানোটা কেমন যেন সর্বগ্রাসী মত! পড়বি তো পড় ওরই চোখের সামনে পড়লো!……

ডিশ চারখানা তুলে নিয়ে এদিকে সরে এসে টেবিলের ওপর রাখে বিশাখা। তারপর বাসনওয়ালিকে অনুরোধ জানায়, 'আবার শীগগিরের মধ্যে আসিস। কাপড় জমাচ্ছি আরো। আজ আর তাড়াতাড়িতে অন্য কিছু দেখা হল না!'

দেখা সত্যিই হ'ল না।

সময়ের জন্যে নয়, শোভার মার চোখের জন্যে।

বড় অস্বস্তিকর চাউনিটা।

চাউনিটা যেন একটা পাথরের ভার নিয়ে কোনখানে চেপে বসেছে।

কিন্তু বেচারা শোভার মা, সেকি সত্যিই কোনো অর্থবহ দৃষ্টি নিয়ে ওই শাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল? তার দৃষ্টিতে কি ধিক্কার ছিল? ব্যঙ্গ ছিল? আক্রোশ আর অভিযোগ ছিল? না, এ সবের কিছুই ছিল না।

শোভার মা জানেও না, দৃষ্টির মধ্যে ওইসব ভাব ফোটাবার কোনো অধিকার তার আছে। হয়ত শোভার মা এরপর যখন শহুরে বস্তির ঝিয়ের ভূমিকায় পোক্ত হবে, তখন শিখবে। এখন জানে না। তাই এখনও বোধ করি নিজেও তাকায় নি, যেন ওর সব কটা ইন্দ্রিয় অদ্ভুত একটা দৃষ্টিভরা চোখ হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল। তারপর মনিবনীর তাড়া খেয়ে, তাড়া-খাওয়া একটা পশুর মত ছুটে চলে গিয়েছিল আহত পশুর দৃষ্টি নিয়ে। আর তারপর ওই লাল নীল সবুজ কমলা হলদে গোলাপী একরাশ রং শোভার মার অল্পবুদ্ধি মাথার মধ্যে যেন একসঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়াতে থাকে, উঠোন ধুতে হাতটা কাঁপে শোভার মার, ঝাঁটাটা শিথিল হয়ে মুঠো থেকে খসে পড়ে যেন।

বামুন ঠাকুর হাঁক পাড়ে, 'এই ঝি, উনুনে আগুন দে। সন্ধ্যে হয়ে এল।'

শোভার মা একবার কয়লার স্তূপ, আর কয়লা ভাঙা হাতুড়িটার দিকে তাকায়, তারপর শিথিল কণ্ঠে বলে ফেলে, 'পারছি না ঠাকুর মশাই, শরীরটে কেমন করতেছে।'

ব্যস!

উচ্চারণ শেষ হতে যা দেরি।

ঠাকুর উচ্চ চীৎকার করে ঘোষণা করে, 'মা, ঝি বলছে উনুনে আগুন দিতে পারবে না।'

পারবে না!

উনুনে আগুন দিতে পারবে না!

বিশাখার মাথার মধ্যেই অতএব দপ্‌ করে একটা উনুন জ্বলে ওঠে। এইমাত্র সে ভাবছিল, কি করবো, মাগীর যাবার সময় ছেঁড়া-ফেঁড়া যা' হোক একখানা শাড়ী দিয়ে বলবো নাকি, নাও বাছা, 'না' করেও স্বস্তি তো পাই না, আমাদের মায়ার শরীর! বলতে দিল না হারামজাদা মাগী সে কথা! প্রকাশ করতে দিল না বিশাখার শরীর মমতায় ভরা! তার বদলে কিনা এতবড় আস্পর্ধা প্রকাশ করে বসলো!

কাজেই বিশাখা তেড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, 'কী বলছো ঠাকুর?'

'ওই যে বসে আছে, বলছে উনুনে আগুন দেবে না!'

বিশাখা এবার দাওয়ার ধারে পা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে বসে-থাকা মানুষটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের ঝাল ঝাড়ে। 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এক্ষুনি, আর এক মিনিটও বসে-থাকার দরকার নেই! এতবড় আস্পদ্দা তোমার যে, মুখের ওপর 'পারব না' বল?'

হ্যাঁ, বলতে পারে বিশাখা। ব্লাউসপরা চটিপরা ঝি তো নয়, আঁচলে গিঁঠ্‌ দেওয়া শতছিন্ন ন্যাকড়াপরা ভিখিরির মত হাড়হাবাতে! বলতে ভয়টা কি?

শোভার মা বোধহয় একবার বলতে চেষ্টা করে, 'পারবো না' বলেছে সে নিতান্তই শারীরিক অক্ষমতার জন্যে। শরীরটা কেমন করছে। কিন্তু সে কথা দাঁড়ায় না তার। বিশাখা তীব্রকণ্ঠে বলে, 'শরীর যে 'কেমন' করছে কেন, সে আর বুঝতে বাকী নেই আমার! এসে দাঁড়ানো মাত্তর কাপড় চাই জামা চাই, না দাও তো কাজ করব না! ·আমাদের সব ঠাউরেছিস কি? লোক আর জুটবে না আমার? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই!···নিয়ে যা তোর একদিনের মাইনে'—বলে বিশাখা ঘরে ঢুকে আট আনা পয়সা এনে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ঘরে চলে যায়।

শোভার মা আস্তে পয়সা কটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।······ আর ঠিক সেই সময় সেই কাণ্ডটা ঘটে। অভাবনীয় কাণ্ড!

একসঙ্গে চার-চারখানা ডিশ হাত থেকে পড়ে খতম! কিন্তু অভাবনীয়?

না, ভাবনারই?

বিশাখা তো তাই বললো।

বললো, 'জানতাম! জানতাম আমি! ভাবছিলামই এই রকম একটা কিছু হবে। ও জিনিস আমার ভোগে লাগবে না। যা 'নজর' দিল! উঃ, চোখে যেন সাপের বিষ!···কী বলছিস 'নজর' কথার মানে নেই? মানে নেইতো এ অঘটনটা ঘটলো কি করে? এতকাল কাপড দিয়ে কাঁচের বাসন কিনছি, কই কখনো এমন হতে দেখেছিস? উঃ মাগা বিদেয় হল ভাল হল, নইলে রাতদিন আমাদের খাওয়া-পরায় নজর দিত!······নাও এখন সরে দাঁড়াও তোমরা, কেউ আবার কাঁচের কুচি মাড়িয়ে আমার মাথা খেও না। ঝেঁটিয়ে সাফ করি!···থাক্ থাক্ তোমাদের আর আসতে হবে না, নিজে অকর্ম করেছি, নিজেই মেটাই! উঃ হাঁটুটাতেই কি কম ধাক্কা লেগেছে আমার!'

দণ্ড

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের' যে প্লেন্‌টা মাদ্রাজ থেকে আসছিল, খবর পাওয়া গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে সে প্লেন্ ঘণ্টা তিনেক লেট্ হয়ে আসছে।

যারা পরিজন প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজনকে রিসিভ করতে এসেছে, তারা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। ছ' আট ঘণ্টা হলে ফিরে গিয়ে আবার আসতো, তিন ঘণ্টায় দমদম থেকে যাতায়াতের চেষ্টার মানে হয় না। অতএব এই তিনটি ঘণ্টা প্রতীক্ষার অসহনায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

অসহনীয়কে সহনীয় করতে অনেকে চায়ের অর্ডার দিল, অনেকেই বই কাগজ খুলে বসল, অনেকে আবার স্থির হয়ে বসে থাকতে না পেরে চঞ্চলভাবে ঘুরেই বেড়াতে লাগল। অবশ্য চারদিকের স্টলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলে সময় কেটে যায় বেশ।

কোণের দিকে কয়েকটি আসন সংগ্রহ করে জনাকয়েক মাঝারি বয়সের ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছে এঁরা বিজনেস-ম্যান এবং সর্বদাই প্লেনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। দু'চার জন পরিচিত, দু'চার জন অপরিচিত, কিন্তু গল্প জমে উঠতে দেরি হয় না। এইসব অনেক অভিজ্ঞতার মানুষদের গল্প জমাবার একটা টেকনিক থাকে।

আজ এঁরা প্রত্যেকেই এঁদের জীবনে প্লেন সম্পর্কিত যত রকম বিরক্তিকর ঘটনা ঘটেছে, তাকে বিস্মৃতির গুদাম থেকে টেনে বার করছেন। তার বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দেহে টাটকা তুলি বুলিয়ে পরিবেশন করছেন একে একে।

টাই-বাঁধা নিখুঁত স্যুট-পরা ফর্সা ভদ্রলোকটি বলছিলেন কী ভাবে কেবলমাত্র প্লেনের লেটের জন্য তাঁর একবার প্রায় দেড় লাখ

টাকার কাজ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি থামতেই, পায়জামা আর পাঞ্জাবীপরা উঁচু-নাক আর টাক-মাথা ভদ্রলোকটি শুরু করলেন ওই প্লেনের লেটের জন্যে তাঁর প্রথম মেয়ের বিয়ে দেখা ভাগ্যে না ঘটায় কী পরিমাণ মর্মান্তিক দুঃখের ওপর আবার স্ত্রীর কাছে কী পরিমাণ লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

ভদ্রলোক রসিক ব্যক্তি, সেই অদৃশ্য মহিলাটি সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করছিলেন, মনে হচ্ছিল—তিনি রুদ্রাণী ভৈরবী এবং রণচণ্ডীর মিক্সচার।

টেরেলিনের বুশ-শার্ট পরা ভদ্রলোক গল্প ফাঁদলেন প্লেন লেট্ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে তাঁর বাবার মৃত্যুশয্যায় এসে পড়ে শেষ দেখা দেখতে পেয়েছিলেন।

খুব একটা বীভৎস দুঃখের ঘটনার গল্প বলতে বসলেন রোগা টিনটিনে ভাঙা-ভাঙা গলা ভদ্রলোক।

তাঁর ভাগ্নীর ব্যাপার।

ভাগ্নীজামাই দেড় বছর পরে আসছে জার্মানী থেকে, কি যেন একটা শিখে। ডজন দুই আত্মীয় এসেছে রিসিভ্ করতে। ভাগ্নীও এসেছে তার সঙ্গে। জামাই সহজ সুস্থ স্বাস্থ্যবান, প্লেন যখন থেমেছে তখনও ভাল, হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেল, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান!

সে জ্ঞান আর ফিরল না।

'কি ভয়ানক, ইস্! হ'লটা কি?'

'সেই তো কথা। ডাক্তাররা বলল—হার্ট ফেল! কিন্তু হার্ট কেন ফেল করল হঠাৎ, সেটাই প্রশ্ন।'

'হঠাৎ এতদিন পরে আত্মীয়দের দেখে বিচলিত হয়ে, না কি?'

'হয়তো তাই! কিন্তু সেটা কি সত্যি একটা কারণ হতে পারে? কত লোক দশ বিশ বছর পরে—'

'সকলের হার্ট সমান স্ট্রং নয়। আনন্দে তো লোকে হাসে, অনেকে

আবার কাঁদে! মানুষ যত বিচিত্র, জীবন তত বিচিত্র! আর প্রত্যেকের জীবনেই কত বিচিত্র ঘটনা!'

এই দার্শনিক ব্যাখ্যাটি করে সাদা ট্রাউজার আর শার্টপরা ভদ্রলোক একটি সিগারেট ধরালেন।

একটু তফাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চুপ করে বসেছিলেন হাতে মোটা চুরুট নিয়ে। ভদ্রলোকের ভারী গড়ন, ময়লা রং, ঘাড়টা খাটো-খাটো। সেই ঘাড়টা গুঁজে নীরবে বসে থাকার জন্যে, আর বোধ করি কালো স্যুটের জন্যে, ভদ্রলোককে কেমন 'কুদৃশ্য' মনে হচ্ছিল।

আগের জনের দার্শনিক উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সহসা একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল তাঁর মধ্যে, আর একটুক্ষণ বোধ করি ইতস্ততঃ করে উঠে এলেন এঁদের কাছে।

এঁরা তাকালেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের আলোচনা শুনছিলাম।'

'শুনছিলাম' বলে থেমে রইলেন একটু।

যেন তিনি যে শুনছিলেন, সেইটাই খবর। আর সেই মূল্যবান খবরটিই তাঁর বক্তব্যের বিষয়।

নীরবতাটা অস্বস্তিকর লাগায় দার্শনিক বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, নানা জটিল অভিজ্ঞতা নিয়েই তো মানুষের জীবন—'

'অভিজ্ঞতা?' কালো স্যুট তাঁর বসা-বসা ভারী গলায় বলেন, 'কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আপনাদের? কিসের অভিজ্ঞতা?…খুন করার অভিজ্ঞতা আছে? জানেন আমি একবার একজন ইয়ংম্যানকে খুন করেছিলাম। আর এই প্লেনই তার জন্যে দায়ী।'

এদের মনে হল, ভদ্রলোক বিকৃত-মস্তিষ্ক। অথচ মুখের চেহারায় এমন একটা গভীর বেদনা ও বিষণ্ণতার ছাপ যে, ঠিক পাগল বলে কৌতুক করাও চলে না।

দার্শনিক হাতটা তুলে কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটায় একবার চোখ ফেলে

বলেন, 'আপনার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী কি আমাদের শোনানো অসম্ভব?"

ভদ্রলোককে বসবার জায়গা করে দিলেন এঁরা।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'বলতে ইচ্ছে করছে। আপনাদের কথাবার্তা শুনে ইচ্ছে করছে। একবার পুলিশের কাছে বলেছিলাম, কান করেনি।'

যাক, স্পষ্টই বোঝা গেল।

মাথারই দোষ!

তা' হোক, মন্দ কি! গোলমেলে মাথার কথা শুনতে মজা আছে।

সকলেই বেশ যেন অবহিত হয়ে বসলেন।

ভদ্রলোক চুরুটটা ফেলে দিয়ে পুরু কাচওয়ালা চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটি ছেলেকে খুন করেছিলাম আমি! তাজা তরুণ টকটকে টগবগে ছেলে! ওটা ছিল সাতমাস আগে।…আপনাদের অবশ্যই মনে আছে বাইশে মার্চের সেই ভয়ঙ্কর প্লেন দুর্ঘটনার কথা? এই 'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের'-ই 'ম্যাড্রাস-বাউণ্ড' প্লেন্‌খানা কী ভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কাগজে কাগজে তার ছবিও দেখে থাকবেন! সেই প্লেন্‌টায় যাচ্ছিলাম আমি। মানে যাবার কথা ছিল। প্যাসেজ বুক করা আছে, সঙ্গে কেবল মাত্র একটি এ্যাটাচিকেস্, নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াচ্ছি প্লেন্ ছাড়ার অপেক্ষায়, এই সময় সেই ছেলেটা এল।'

ভদ্রলোক একবার থামলেন, চশমাটা চোখে দিলেন, আর একটা চুরুট বার করলেন।

আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করছিলেন। তিনি বোধ করি ঈষৎ আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বক্তব্যকে লক্ষ্য করছেন, হয়তো পাগল বলেই সন্দেহ করছেন।

এ ভদ্রলোকের সাজ পোশাক এখানে একটু বেমানান। এরকম

আধময়লা ধুতি শার্ট পরা লোক কেউ ঘুরছে না এখানে। তাই ওঁর দিকে গ্রাহ্যের দৃষ্টিতে তাকাল না কেউ।

কালো স্যুট চুরুটটা ধরিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'ছেলেটা এল যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত। ছটফটিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছে, একবার বেরিয়ে এল এন্‌কোয়ারি অফিস থেকে। আবার গেল সেদিকে। আবার যেন কোথা থেকে ঘুরে এল।

বড় কেউই লক্ষ্য করছিল না ছেলেটির দিকে। সকলেই নিজের তালে ব্যস্ত। আমি একা ঘুরছিলাম, তাই দেখছিলাম। অথবা—ওর নিয়তি আমার মধ্যে ভর করে দেখাচ্ছিল আমাকে। নিয়তি-টিয়তি এসব আমি কখনো মানতাম না বুঝলেন। ভাগ্য, ভগবান, সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু তারপর থেকে—সে যাক, ছেলেটিকে আমি লক্ষ্য করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কোনো একটা কিছুর ব্যর্থতায় ও অমন ছটফটিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ওর সুন্দর মুখে হতাশার ছাপ দেখেছিলাম আমি।'…এঁরা সকলেই একবার করে ঘড়ি দেখে নিলেন, ভদ্রলোক বড় ঢিমে চালে গল্প ধরেছেন, প্লেন্ ছাড়ার আগে শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এ এমন একটা স্তিমিত কাহিনী যে উদ্‌গ্রীব হয়ে 'তারপর কী হল মশাই ?' বলে প্রশ্ন করতেও বাধছে।…শোনবার এমন কিছু ছিলও না। খুব একটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না, শুধু ওই 'খুন' কথাটার কি ফয়সালা হয়, সেইটুকুই যা কৌতূহলের।

'আমি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। হঠাৎ আমার ওপর ওর চোখ পড়েছিল বলেই ডাকাটা ওর চোখে পড়ল। ও এগিয়ে এল আমার কাছে।…দেখুন আশ্চর্য, ওতো না-এগোলেও পারতো ? আমাকে একটা বাজে বুড়ো বলে অগ্রাহ্য করতে পারতো।…কিন্তু ও তা করল না। কাছে এগিয়ে এল।…তার মানে ওর মৃত্যুদূত ওকে ঠেলা মেরে পাঠিয়ে দিল।

আমি ওকে প্রশ্ন করলাম। ওর সমস্যার কথা জিজ্ঞেস

করলাম। ও বলল। খুব দ্রুতভঙ্গীতে অথচ স্পষ্ট ভাষায় জানাল সমস্যাটা কি !

টেলিগ্রামটাও দেখাল।

ম্যাড্রাস গভর্ণমেণ্ট একটা ভাল পোস্টের জন্যে ইণ্টারভিউ কল্ করেছে, ঠিক পরের দিনই সেই তারিখ। টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে তারা, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সে টেলিগ্রাম ওর হাতে এসে পৌঁছেছে আড়াই দিন পরে। অবিশ্বাস করবেন না, এ রকম তো আকছারই হয়। মাত্র দুঘণ্টা আগে 'তার'টা পেয়েছে ছেলেটা, আর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে এয়ারপোর্টে, যদি কোনো উপায়ে একটা প্যাসেজ জোগাড় করতে পারে।···কিন্তু নাঃ! কিছু উপায় হল না।···হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল ছেলেটি। বলল, এই ইণ্টারভিউটার ওপর ওর ভবিষ্যতের অনেক আশা নির্ভর করছে। ওর একজন মামা আছেন ওখানে, তদ্বির তল্লাসের ভার তিনি নেবেন, হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা। শুধু ইণ্টারভ্যুটা হয়ে গেলেই—অথচ এই কাণ্ড !

ছেলেটির সেই হতাশার মুখ আমাকে পীড়িত করল। ভাবলাম, মানে শয়তান আমাকে ভাবাল, আমার প্রয়োজন তো সামান্যই, আমার জায়গায় যদি ও যায়, ক্ষতি কি ?

প্রথমটা বিশ্বাস করেনি ও।

অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল।

তারপর পাগলের আবেগে আমার একটা হাত চেপে ধরল।··· আপনারা বিশ্বাস করবেন ? এখনো সেই স্পর্শটা আমার হাতের একেবারে ভেতরে হাড়ের মধ্যে· মজ্জার মধ্যে লেগে আছে।

ও বলল, 'আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে হচ্ছে।'

ঈশ্বর হয়তো তখন অলক্ষ্যে বসে হাসলেন। অথবা শয়তান।

টিকেটটা চেঞ্জ করিয়ে নিলাম ওর নামে। সময় সংক্ষেপ হয়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি খবরটা বাড়িতে জানাবার জন্যে কোথায় যেন ফোন করে এল, তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে আমাকে একটা প্রণাম করল।

আমি থতমত খেলাম। প্রণামের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বললাম, 'তোমার যাত্রা সাফল্যময় হোক!'

ভাবলাম খুব একটা আশীর্বাদ করলাম আমি।

তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যতক্ষণ না প্লেন্‌টা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল, দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল ওর সেই আনন্দে উজ্জ্বল, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত মুখটা যেন আকাশে ফুটে রয়েছে, মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি করছে। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলে কেন এমন করে আমার মন দখল করে বসল, বুঝতে পারলাম না। নিজের এই সেন্টিমেন্ট দেখে নিজেই নিজেকে উপহাস করলাম। তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে, খুব যেন একটা ভাল কাজ করতে পেরেছি এই মনোভাব নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে চমৎকার ঘুমোলাম, আর সকালে উঠে কাগজ খুলেই—আঁ আঁ আঁ—

আকস্মিক একটা গোঁ গোঁ ধ্বনির সঙ্গে হাতের চুরুটটা খসে পড়ল ভদ্রলোকের। প্রবল ঝাঁকুনিতে চশমাটা ছিটকে কোথায় চলে গেল। এতগুলো লোক হৈ চৈ করে উঠেও চট করে বাঘের থাবা থেকে খাটো-ঘাড় ভদ্রলোকের ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না। দেখা গেল, তাঁর কালো কোটের ভিতরের শার্টের কলারটা চেপে ধরে অনবরত ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছেন সেই আধময়লা ধুতি শার্ট পরা ভদ্রলোক।

তাঁর মুখেও কোনও বাক্য নেই, শুধু দুর্বোধ্য এক গোঁ গোঁ ধ্বনি। নিতান্ত নিরীহ চেহারার ওই আধবুড়ো লোকটা, যে নাকি এখানে ছিল তাও কেউ খেয়াল করেনি, সে হঠাৎ ওরকম ক্ষেপে উঠল কেন?

এটা কী?

পাগল কি তবে সেই লোকটাই?

অনেক কষ্টে তার থাবা থেকে এঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রোতা ভদ্রলোকেরা বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কি মশাই?'

'ব্যাপার! পরে শুনবেন। আগে একে শেষ করি।'

ভয়ঙ্কর এক তীব্র উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ধুতি-শার্ট আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চান এঁর উপর। এই বয়সের ভদ্রলোকের এ রকম উত্তেজনা বড্ড বেশী অস্বাভাবিক।

কারণটাই বা কী?

পুরনো শত্রু সে নয়, সে তো আগেই দেখা গেছে। পরস্পরে সম্পূর্ণ অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছেন।

তবে ?

গল্প বলিয়ে ভদ্রলোক নিচু হয়ে চশমাটা খুঁজছিলেন। কুড়িয়ে পেলেন না, কার পায়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে গেছে। চশমাহীন মুখটা আরো কুৎসিত আর অসহায় অসহায় লাগছে।

বসে পড়ে বললেন, 'উনি বোধ হয় আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছেন—'

শান্ত স্বরেই বললেন ভদ্রলোক।

মানে বলতে গেলেন, তবে বলা হল না। আততায়ী ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন। থামিয়ে দিলেন সে কথা। প্রচণ্ড গর্জনে বলে উঠলেন, 'ভুল? ভুল করেছি? পাছে ভুল করে ফেলি, সেই ভয়ে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তোর কথা শুনেছি আমি শয়তান!······আর ভুল হয়? সাত মাস ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। শুধু তোকে খুঁজে বার করবার জন্যে রোজ এই দমদমে আসছি। তোকে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

এতগুলো লোক পাহারা না দিলে ফের যে ভদ্রলোক কালো কোটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিতেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা ধরে আছে। এরা বলছে, 'পুলিশকে খবর দেওয়া হোক।'

'আপনি আমায় সাত মাস ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

চশমা হারানো ভদ্রলোক অসহায় মুখ নিয়ে উঠে এলেন। বললেন, 'কেন বলুন তো?'

'কেন? বলতে লজ্জা করছে না? পাজী, বদমাশ, শয়তান! জানিস্ আমার একমাত্র ছেলে সে? তুই তাকে দয়া দেখাতে গেলি? নিজের জন্যে তৈরি যমের পরোয়ানাটা তাকে গছিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি—'

হঠাৎ গর্জন থেমে গেল।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মলিন-বেশ প্রৌঢ়।

এঁরা ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছিলেন। অনেকক্ষণের আড্ডাধারী ভদ্রলোকেরা।

কিন্তু সহসা সেই প্রতীক্ষিত শোরগোল উঠল। প্লেন্ ছাড়ার সঙ্কেত দিয়েছে।……অপরের জীবনের রহস্যভেদ করবার সময় কারো আর হাতে নেই। উঠিপড়ি করে ছুটতে হবে এখন।

কে আগে সামনের সারিতে পৌঁছতে পারবে তার জন্যে কাড়াকাড়ি, লাঠালাঠি।

দৌড়চ্ছে সবাই। কার যেন পায়ের চাপে আর কার পায়ের আঙুল ছেঁচে গেল। কারও জুতোর চাপে যেন সেই ছিটকে যাওয়া চশমাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর।

ঠেলাঠেলি আর শোরগোলে এতক্ষণের সভ্য জায়গাটা যেন হাটের মত হয়ে উঠল।

কে উঠে গেল, কে বসে রইল, কেউ তাকিয়ে দেখল না।

ক্রমশঃ জায়গাটা নিথর নিথর হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ পরে সেই ফেনা থিতিয়ে-যাওয়া বেলাভূমিতে একটি ছবি দেখতে পাওয়া গেল।……

সেই নিরালা কোণ্‌টায় অনেকগুলো শূন্য আসনের মাঝখানে দু'টি

আসনে বসে আছেন দুই প্রৌঢ়, একজন দু'হাতে মুখ ঢেকে, একজন চশমাহীন অসহায় দৃষ্টি মেলে।

এখন আর ওঁকে প্রৌঢ় মনে হচ্ছে না। স্থবির বৃদ্ধের মত লাগছে। সেই স্থবিরের মুখ থেকে আস্তে বাতাসের মত মৃদুস্বর উচ্চারিত হল, 'আমিও খুঁজছি! এই সাতমাস ধরে খুঁজে বেড়াছি। না, ক্ষমা চাইবার জন্যে নয়। দোষ স্বীকার করবার জন্যে।······সম্ভব অসম্ভব বহু চেষ্টা করেছি। দুর্ঘটনায় নিহতদের ঠিকানা সংগ্রহ করে খুঁজতে গিয়েছি, পাশের বাড়ি থেকে বলেছে, কোনও আত্মীয় এসে ওই হতভাগ্য মা বাপকে নিজেদের কাছে নিয়ে গেছে। ঠিকানা বলতে পারেনি। আজ হঠাৎ ঈশ্বর আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন!'

'ঈশ্বর!'

হতভাগ্য পিতা চমকে মুখ তুলে চাইলেন। বললেন, 'ঈশ্বর!! জানো আমি তোমাকে খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

'কিন্তু আমিও তো তাই চাইছি। ভয়ঙ্কর একটা কোন শাস্তি না পেলে, ফাঁসির মত, দ্বীপান্তরের মত, খুব ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি না পেলে শান্তি পাচ্ছি না আমি। এই যন্ত্রণায় হয়তো নিজেই নিজেকে একদিন —না, না, আপনি আমাকে দয়া করুন। আমায় পুলিসে দিন। আপনার ছেলের হত্যাকারীর যাতে উচিত শাস্তি হয় তার জন্যে চেষ্টা করবেন না আপনি?'

মলিন-বেশ প্রৌঢ় নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম, নিজেকে সামলাতে পারিনি, তাই অমন একটা কুৎসিত কাণ্ড করে বসলাম! এখন বুঝতে পারছি, এই সাত-মাস ধরে কী পাগলামী করে বেড়িয়েছি!'

উনি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

ওঁকেও হঠাৎ দশবছর বয়স বেড়ে-যাওয়া কোলকুঁজো বুড়োর মত লাগল। ওঁর ধুতিটা আরো ময়লা আর শার্টটা আরো মোচড়ানো দেখাল। কিন্তু ওঁর এগোনো হল না। কালো স্যুট-পরা ভদ্রলোক

উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, 'চলে যাচ্ছেন? আমার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না?'

হতভাগ্য পুত্রহারা পিতা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনার শাস্তির ব্যবস্থা তো ভগবানই করেছেন! আমি আর—'

'ভগবান! হা ভগবান! কোথায় তিনি?' ভদ্রলোক হতাশ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার কোনো উপায়ই হল না তা হলে? পুলিশের মত আপনিও আমায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন?'

ভদ্রলোক ফিরে নিজের আসনে বসতে গেলেন। একটা বেঞ্চের পায়ায় ধাক্কা খেলেন। চশমা-ছাড়া চোখটা একবার রগড়ে নিলেন। বোঝা গেল চোখের দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ওই ব্যাকুল বৃদ্ধের হতাশ কুশ্রী মুখের দিকে মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আস্তে ফিরে এলেন। আরো আস্তে বললেন, 'না, ত্যাগ করে চলে যাব না। আপনার চশমাটি খোয়া গেল, অসুবিধেয় পড়বেন, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিইগে—'

প্রতিশোধ পিপাসু প্রতিহিংসায় উন্মাদ পুত্রহারা পিতা তাঁর শীর্ণ কঠিন আঙুল ক'টি বাড়িয়ে পুত্র-হত্যাকারীর মোটা মোটা ভারী হাতের থাবাটা চেপে ধরলেন।

ডাক্তারের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। সুরমার দিকে তাকিয়ে আস্তে প্রশ্ন করলেন, "সকালে কোনরকম বেভাব দেখেন নি? কোন রকম দুর্বলতা বোধ, বা মাথাধরা, কিংবা—'

সুরমা মাথা নাড়লেন, 'কই কিছুই তো না। যেমন সহজ মানুষ তেমনি! খেলেন, পান নিলেন, বেরোবার সময় যেমন মা-বাবার ছবিকে নমস্কার করে যান তেমনি; হঠাৎ এই বেলা দুটোর সময় অফিসের কজন লোক অজ্ঞান অচৈতন্য মানুষটাকে গাড়ি করে—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না সুরমা, গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে এল। মুখটা অন্য দিকে ফেরালেন।

ডাক্তার একটু সময় দিয়ে বললেন, 'বিচলিত হবেন না, ভাবনার কিছু নেই, চিকিৎসার সুবিধের জন্যেই এগুলো জিগ্যেস করে ব্যস্ত করছি আপনাকে। ধরুন সকালে না হোক, গতরাত্রে কোন বচসা, কি—'

সুরমা মাথাটা নাড়লেন।

বচসা!

সোমনাথের সঙ্গে?

বচসারই মানুষ বটে। একটা অক্ষরে কাজ মিটলে দুটো অক্ষর বাজে খরচ করেন না যিনি। অন্ততঃ সুরমার সঙ্গে তো বটেই। বরং বন্দনার সঙ্গে কথা বলতে মাঝে মাঝে স্বভাবকে অতিক্রম করে ফেলেন সোমনাথ। যেটা সময় সময় সুরমাকে অভিমানাক্রান্ত না করে পারে না।

অথচ বন্দনার, সোমনাথের নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাই সারনাথের স্ত্রী বন্দনারও, ভাসুরের উপর নীরব গভীর মর্মান্তিক এক অভিমান! যে অভিমানকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

মাঝে মাঝে একটা কুশ্রী সন্দেহ এসেও যেন বিষের ঝাপটা মারে। ভগবানের নাম করে, সারনাথের ঝাপসা হয়ে আসা মুখটাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করে এ সন্দেহকে তাড়ায় বন্দনা।

সন্দেহ যদি বা যায়, অভিমান যায় না। এ কেমন বড় ভাই? জলজ্যান্ত আস্ত একটা ভাই হারিয়ে গেল, আর তিনি সেটা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তা নিশ্চিন্ত হওয়া ছাড়া আর কি? খবরের কাগজের নিরুদ্দেশের কলমে একটা বিজ্ঞাপন ঠেকিয়ে রাখা আবার চেষ্টা! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক করে খোঁজবার কথা নয়? কই তেমন কই করলেন সোমনাথ? অনেক দিন চিঠি না পেয়ে বন্দনা যখন কেঁদে কেটে পাগল হবার যোগাড়, তখন বলতে গেলে সুরমার তাড়নাতেই একবার গেলেন খোঁজ করতে।

ব্যস! কদিন পরে এসে খবর দিলেন, সারনাথ একদিন নাকি হঠাৎ কোথায় চলে গেছে, চাকর জানে না। রেঁধেবেড়ে বসে থেকেছে, মানুষ আর আসে নি। অফিসেও যায় নি পরদিন। তার পরদিনও না, কোন দিনও না! সুরমা যখন কেঁদে-কেটে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ গা, তা তন্ন তন্ন করে খবর নিয়েছিলে? কোনো বিপদ আপদ হয় নি তো?'

তখন চিরনির্লিপ্ত সোমনাথ সেই তাঁর নির্লিপ্ত ভঙ্গীতেই বলেছিলেন, 'বিপদ আপদ হলে তো জানতেই পারা যেত! অতটুকু শহর!'

হ্যাঁ, অতটুকুই শহর। নামটাও ছোট, 'জলগাঁও'। কিন্তু শহরটা কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে? না কি নরখাদক আদিবাসীদের বাসভূমি? তাই একটি বারের জন্য সেখানে বন্দনাকে নিয়ে যাওয়া যেত না! যে বন্দনা শুধু সেই জায়গাটা একবার দেখবার জন্যে পাগল হয়ে দেয়ালে মাথা কুটেছে!

না, নিয়ে যান নি সোমনাথ। কারো সঙ্গে যেতেও দেন নি। শুধু শুকনো মুখে বলেছেন, 'গিয়ে আর কি হবে? সেখানে থাকলে তো—

কেউ না কেউ খবর দিতই। তা ছাড়া বাংলা ইংরিজি সমস্ত কাগজেই তো চিঠি ছাপানো হচ্ছে—'ফিরে এসো' বলে।'

ভাসুরের ওপর আর কি কথা বলবে বন্দনা? শুধু নিদারুণ এক অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছে মনের মধ্যে। বন্দনা মা-বাপ-মরা, বন্দনা গরীব-দুঃখীর ঘরের মেয়ে, তাই না এত নিরুপায় নিঃসহায় বন্দনা! বাপের বাড়ির জোর থাকলে বন্দনা নিজে চলে যেতে পারত না? অজন্তা-গুহার গুহায় গুহায় ঢুকে খুঁজে দেখত না? দেখত না কোথায় লুকিয়ে বসে থেকে মজা দেখছে সারনাথ?

বন্দনার ভাগ্যে কাজও কি জুটল সারনাথের তেমনি অদ্ভুত! বন্দনার তো চিরদিন জানা ছিল অজন্তা এক অনাদি অবিনশ্বর প্রস্তর মহিমা, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার যে আবার রীতিমত অফিস আছে, সে অফিসে কাজ করবার জন্যে হাজার মাইল পথ ভেঙে গিয়ে কেউ প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়, এসব জানা ছিল না বন্দনার।

বিধাতা তাকে ভাল করেই জানালেন।

এই চাকরি নেওয়ার ব্যাপারেও সোমনাথ যদি আপত্তি করতেন, সারনাথ কি জেদ করতে পারত? সোমনাথ আপত্তি করলেন না।

বললেন, 'নিয়ে দেখ না। একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স—ভাল না লাগে, তখন বিবেচনা করো।'

অথচ তিনি ভালই জানতেন, চট করে বন্দনাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না সেখানে। তবে? ভাসুরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের ধোঁয়া বন্দনার মনে। কিন্তু মজা এই, মানুষটাকে দেখলে সৌম্য শান্ত দেবমূর্তির মত লাগে। আর তখন নিজের সন্দেহ আর অভিযোগগুলো যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে। সোমনাথ যখন তখন এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়েটার আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে খেলনা পুতুলের মত ছেলেমানুষি সব জিনিসপত্র এনে জড়ো করেন, তখন মমতায় মন ভরে যায়।

অথচ—

সন্দেহের সাপও ছোবল হানে।

যখন তখন অলক্ষিতে অমন করে বন্দনার দিকে চেয়ে থাকেন কেন সোমনাথ ?

নিষ্পলক নিথর দৃষ্টিতে !

বন্দনার নিষেধ শোনে নি সারনাথ। চলে গিয়েছিল অজন্তা গুহার কেয়ার-টেকারির চাকরি নিয়ে। বলেছিল, 'ভয় খাচ্ছ কেন ? সন্দেহ হচ্ছে কোনও পাষাণী সুন্দরীর প্রেমে পড়ে যাব ?'

বন্দনা রাগ করে কথা বলে নি যাবার সময়।

সারনাথ লিখত, 'বেশীদিন নয়, শীগগিরই তোমায় নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করব।'…লিখত, 'বাসার অসুবিধে ? তাতে তুমি ডরাও না কি ?…বাঘের ডেরায় বাঘিনী থাকে, সাপের গর্তে সাপিনী, একটা 'মানুষ' যেখানে থাকতে পারছে, 'মানুষী'ও পেরে যাবে।'

এই চিঠিটাই শেষ চিঠি।

তার পরই হঠাৎ চিঠি বন্ধ হয়ে গেল। সত্যিই কি রহস্য-গল্পে পড়া কোন কাহিনীর মত পাষাণীর প্রেমে পড়ে কোন একরকম হয়ে গেল সারনাথ ? এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে না। অথচ বন্দনার মনে হয়, বন্দনা নিজে একবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই বুঝি সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। তবু যাওয়া হচ্ছে না। এই অদ্ভুত নিরুত্তর এক জীবনের বোঝা বয়ে বয়ে এগোতে হচ্ছে বন্দনাকে, কে জানে কোন্ উত্তরের লক্ষ্যে !

'ভাবছি, ডাক্তার ভট্‌চাজকে একবার কল দিই'—ডাক্তারের এই সিদ্ধান্তে চমকে ওঠে বন্দনা। এতক্ষণ কোথায় ছিল সে ? কোন্ হাজার মাইল পারে ? শুনতে পেল—

সুরমা ম্লানভাবে বলছেন, 'আপনি যা ভাল বুঝবেন—'

ওষুধপত্র দিয়ে তখনকার মত বিদায় নিলেন ডাক্তার। আর সুরমা যেন এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। শুয়ে পড়লেন বিছানার একপাশে উপুড় হয়ে।

বন্দনা সান্ত্বনা দিতে গেল না।

বন্দনা আইস্‌ব্যাগ হাতে যেমন বসেছিল রোগীর শিয়রে, তেমনি বসে রইল। আর নিষ্পলকে চেয়ে রইল রোগীর ভাবলেশশূন্য অচৈতন্য মুখের দিকে। সোমনাথের যদি কোনও মেয়ে থাকত, সে মেয়ে বন্দনার বয়সী হত না কি ?

তথাপি বন্দনা আজ সকালে ওই মানুষটার মুখের ওপর বলেছে, ‘সব সময় কী এত দেখেন আমার মুখের দিকে ?’

হ্যাঁ, বলেছে আজকে। কদিন ধরে সংকল্প করে করে আজ বলেছে।

ডাক্তারকে সে কথা বলে নি বন্দনা।

বলবার নয় বলেই বলেনি।

আচমকা বন্দনার এই তীব্র প্রশ্নে সোমনাথের মুখটা বাসি শাকের মত সাদাটে হয়ে গিয়েছিল। কেমন একরকম অপ্রতিভ মুখে বলেছিলেন, ‘তাকিয়ে থাকি ?’

‘থাকেন কি না নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন ?’ ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে বলেছিল বন্দনা। আর সোমনাথ দরজার কপাট ধরে যেন টাল সামলাচ্ছিলেন। বাইরে বেরোবার দরজা। দোতলা থেকে নেমে এসে বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন সোমনাথ তখন। আর বন্দনা শেষ কথাটা ছুঁড়ে মেরেছিল, ‘আমার খুব খারাপ লাগে, সেটাই বলে দিলাম।’

সোমনাথ আস্তে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আর পরমুহূর্তেই বন্দনার মনে হয়েছিল ওবেলা আবার কী করে মুখ দেখাবে সোমনাথকে। যে সোমনাথের একটা মেয়ে থাকলে বন্দনার মত বয়সের হত !

সোমনাথ বন্দনার মস্ত উপকার করেছেন। টাট্‌কা-টাট্‌কি আর মুখ দেখাতে হল না বন্দনাকে।

কিন্তু······

কোন দিনই কি হবে ?

স্ট্রোক্ !

ডাক্তার ভট্টচাজও তাই বললেন।

তলে তলে কবে এত রক্তের চাপ মাথায় উঠেছিল সোমনাথের? সুরমা বাড়ির ডাক্তারের কাছে ভেঙে পড়ে অস্ফুট স্বরে বলছিলেন, 'ঠাকুরপোই ওঁকে শেষ করে ফেলেছে ডাক্তারবাবু! চাপা মানুষ, মুখে তো হা-হুতোশ করেন না—'

'কোন খবরই নেই?'

প্রশ্ন করেছিলেন ডাক্তার।

সুরমা মাথা নেড়েছিলেন।

'সাধু-সন্ন্যিসী হওয়ার দিকে কোন ঝোঁকটোকও তো ছিল বলে মনে হত না।'

'নাঃ!' বলেছিলেন সুরমা জোর দিয়ে। তার পর আস্তে বলেছিলেন, 'কি জানি ওই সব পুরনো গুহাটুহায় কত রকম আত্মা-টাত্মা—'

ডাক্তারবাবু যেন হেসেছিলেন একটু। তার পর সোমনাথের ব্যবস্থাতেই তৎপর হয়েছিলেন। যেন, যে হারিয়ে গেছে সে তো গেছেই, যে আছে তাকে আবার হারিয়ে বসো না। ধরে রাখবার চেষ্টা কর।

কিন্তু মাথায় এই রক্তের চাপ কি সোমনাথের সারনাথকে খুঁজে না পেয়ে? নাকি না-খোঁজার অপরাধবোধে? সেই অপরাধবোধের গ্লানি মুছতেই কি ওই খোঁজা-খোঁজা খেলা সোমনাথের?

যে খেলার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন বন্দনাকে, আর অবিরত সেই খেলাঘরে ডাক দেন তাকে।

'বন্দনা, তোমার কি মনে হয় বিজ্ঞাপনের ভাষাটা একটু বদলে দেওয়া দরকার?'…'বন্দনা, এবার ভাবছি চিঠির ফর্মে একটা বিজ্ঞাপন লিখে দিই—'…'আচ্ছা বন্দনা, সুরমার নাম নিয়ে একটা আবেদন লিখলে কেমন হয়?'…হিন্দী কাগজেও দিয়ে দেখব বন্দনা? ইংরিজি বাংলা কাগজ হয়তো ওদিকে যায় না।'

বন্দনার এক-এক দিন ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে ওঠে, প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে, 'কিছুতে কিছু হবে না। আপনাদের এই খোঁজা-খোঁজা খেলায় আমার কোনও আস্থা নেই। একবার আমায় ছেড়ে দিন, আমি সেখানের প্রত্যেকটি লোককে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করে দেখি গে! দেখি তাকে কোন অশরীরী আত্মায় ভর করেছে, না কোনও শরীরী মায়াবিনী?'

ক্রমশঃ এই শেষের সন্দেহটাই প্রবল হচ্ছে বন্দনার। তার কেমন যেন মনে হচ্ছে সোমনাথ বুঝি কিছু জানেন।···হয়তো দেখেও এসেছেন সেই প্রেতিনীআশ্রিত ভাইকে।

নিজস্ব নিরীহতায় কিছুই করে উঠতে পারেন নি। ধরে আনতে পারেন নি চুলের মুঠি ধরে। অথচ ভাইয়ের এই কলঙ্ককাহিনী বন্দনার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বার ভয়ে এমন করে সেদিকের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন।

কই, জলগাঁও থেকে তো কোনদিন কোন চিঠি আসতে দেখে না বন্দনা? সারনাথের সহকর্মীদের সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ রাখতে পারতেন না সোমনাথ?

রাখেন নি।

জলের লেখার মত মন থেকে মুছে ফেলেছেন দেশটার নাম।

তবে কেন কুটিল একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না বন্দনার? কেন মনে হবে না, সারনাথের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা হয়তো সোমনাথের কাছে বাঞ্ছনীয় হয়েছে? ভাবলে মনটা কি রকম যেন করে ওঠে, ওই দেবোপম মুখের অন্তরালে—

'ছোটবৌ!'

সুরমা ক্লান্ত করুণ স্বরে ডাকলেন, 'আমার তো হাত-পা আসছে না! একবার দেখ তো গরম জলের ব্যাগটা কোথায় আছে? ডাক্তার ভট্টচাজ নাকি বলে গেছেন, পায়ে গরম, মাথায় বরফ চালিয়ে যেতে—'

বন্দনার ঠোঁটটা একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের রেখায় বেঁকে গেল।

তা সত্যি, তোমার হাত-পা না ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ তোমার স্বামী জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় দুলছেন! স্বামীকে হারানোর ভয়ে হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে তোমার!

আর বন্দনা?

সহজ সুস্থ আস্ত স্বামীটা যার হারিয়ে গেল? খোলা কৌটোয় রাখা কর্পূরের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?

সুরমা আবার ডাকলেন, 'ঠাকুরকে গরম জল চড়াতে বলে ব্যাগটা খোঁজ ছোটবৌ! কত কাল তো দেখি না সেটাকে, দরকারও পড়ে নি।'

শ্রান্ত নিশ্বাস ফেললেন সুরমা।

বন্দনা আস্তে উঠে গেল।

খুঁজতে লাগল জিনিসটাকে।

কিন্তু যা হয়।

বিশেষ করে এমন একটা আধমরা সংসারে যা হয়। কোন কিছুর ঠিক থাকে না।

কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ব্যাগটাকে।

কতকাল সংসারের আলটুবালটু জিনিসে হাত পড়ে নি। কতকাল কোনও বাক্স আলমারি ট্রাঙ্ক সুটকেশ গোছানো হয় নি। কতকাল বইয়ের র‍্যাকে হাত পড়ে নি, শিশি-বোতলের তাকের ধুলো ঝাড়া হয় নি।

অথচ আগে এসব কা উৎসাহ নিয়েই করত বন্দনা!

সারনাথ বলত, 'বাতিক! বাতিক! একটু কি বসতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

বন্দনা বলত, 'বসব কেন? বুড়ী নাকি?'

এখন কতকাল হল যেন, শুধু বসে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দনা।... কা করবে? কাজ কোথা? ঝি আছে, রান্নার একটা লোক আছে, বাকীটা সুরমা দেখাশোনা করেন। কী বা রান্না! কত বা খাওয়া-দাওয়া! কাজ পায় না বন্দনা।

অথচ এসব কাজ তো ছিল।

এসব কাজ মাঝে মাঝে করলে, আজ বন্দনাকে ওই তুচ্ছ জিনিসটা খুঁজে বাড়ি মাথায় করতে হত না।

সম্ভাব্য জায়গাগুলো শেষ করে অসম্ভাব্য জায়গাগুলো খুঁজছে সে এখন। আলমারির মাথায়, খাটের তলায়, দেরাজের পিছনে, লেপের চালিতে।

সুরমা আবার ডাকেন 'ছোটবৌ—'

বোঝা যাচ্ছে একা ভয় পাচ্ছেন সুরমা। তাই বন্দনাকে আহ্বান করছেন।

বন্দনা এঘর থেকেই বলে, 'খুঁজছি—'

দু-ঘরের মাঝখানের দরজাটা খোলা, দেখা যাচ্ছে সুরমার পাশ মুখটা। সুরমার মুখটা যেন অবলম্বন হারিয়ে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। সেই মুখটা এদিকে ফিরিয়ে সুরমা বলেন, 'থাক্ ছোটবৌ, আর বৃথা খুঁজিস নে! ডাক্তারখানায় স্লিপ লিখে ঠাকুরকে বরং একটা আনতে দে—'

বন্দনা তাই করতে যায়, আর কলমটা হাতে করে হঠাৎ বন্দনা থমকে দাঁড়ায়। এই একটা জড় পদার্থ, যেটা বাড়িতে যখন্ ছিল, তখন নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকবে, তাকে খুঁজে পাওয়ার আশাটা এত সহজেই তা হলে ত্যাগ করছে বন্দনা?

অথচ এত বড় পৃথিবীতে যে কোন জায়গাতে পালিয়ে যেতে পারে, লুকিয়ে থাকতে পারে, ধরা না দিয়ে মজা দেখতে পারে, এমন একটা সচল আর খেয়ালী বস্তুকে খুঁজে বার করতে পারছে না বলে সোমনাথকে দুষছে বন্দনা, মনে মনে অভিযোগের পাহাড় জমিয়ে তুলছে!

কলমটা রাখল বন্দনা, বলল, 'না দিদি, খুঁজে বার করবই। যাবে কোথায়? মানুষ তো নয় যে পায়ে হেঁটে চলে যাবে—'

ও-পাশের ঘরের একটা ভাঙা চৌকির তলা থেকে চিরকালের

আনাড়া একটা তোরঙ্গ টেনে বার করে বন্দনা। যাতে রাজ্যের বাজে পুরনো জিনিস থাকে। থাকতেও পারে এর মধ্যে। কোন সময় হয়তো বাজে ভেবেই—, কিন্তু এত দিনের পড়ে-থাকা বাক্সটার ডালায় তেমন ধুলো নেই কেন?

কেন নেই সেটা ধরা পড়ল। ডালা খুলতেই ধরা পড়ল। ডাঁই করে খবরের কাগজের কাটিং জমিয়ে রাখা হয়েছে। নিরুদ্দেশের কলাম!

এযাবৎ যত ছাঁদের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সোমনাথ, সব কেটে কেটে জমিয়ে রেখেছেন? কখন কেটেছেন, কখন রেখেছেন? আশ্চর্য ছেলেমানুষি তো?

না কি—

হঠাৎ মুখটা একটু কঠিন হয়ে ওঠে বন্দনার, চেষ্টার হিসেব রাখছেন সোমনাথ? হিসেব আর ওজন?

দু-হাতে সব এলোমেলো করে দেয় বন্দনা।

না, ব্যাগটা এখানেও নেই।

দেখা যাচ্ছে একটা জড় পদার্থও নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। বিরক্তির সঙ্গে সোমনাথের ওই 'চেষ্টার দলিল'গুলো দু-হাতে খামচে খামচে তুলতে থাকে বন্দনা, আর তুলতে তুলতে হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটে।

বন্দনার চোখ দুটো কাচের চোখ হয়ে যায়, বন্দনার হাত দুটো পাথরের, আর বন্দনার মস্তিষ্কটা সুইচ অফ্ করে দেওয়া বিদ্যুৎ-যন্ত্র। বন্দনার নিশ্বাস প্রশ্বাসই কি পড়ছিল? চিরদিনের জন্যে সব থেমে যায় নি?

নাঃ, চিরদিনের জন্যে নয়, হয়তো মাত্র এক মিনিটের জন্যে। মাত্র এক মিনিট পরেই সব কিছু ফিরে এল বন্দনার। চোখের দৃষ্টি, হাতের সাড়, মগজের অনুভূতি। আর তখনই বন্দনা ওই পুরনো টেলিগ্রামটা চোখের সামনে তুলে ধরল। রাশি রাশি ঝুরো কাগজের নীচে থেকে যেটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।

এখন বেশ স্পষ্টই পড়তে পারছে বন্দনা।

পড়ে মানে বুঝতেও পারছে। তারিখটা পর্যন্ত ধরতে পারছে। সারনাথের শেষ চিঠিটার তারিখের থেকে দু-দিন পরে।···

পড়তেই লাগল বন্দনা :

পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেল···মস্তিষ্কের কোষে-কোষে যেন ধ্বনি হয়ে বাজতে থাকল···'সারনাথ এক্সপায়ার্ড সাডেন্‌লি টোয়েনটিয়েথ··· সারনাথ···সারনাথ এক্সপায়ার্ড সাডেনলি···সারনাথ' আরো কিছু যেন লেখা ছিল পরে, সে আর চোখে ধরছে না···অক্ষরগুলো অর্থহীন হয়ে ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু সেগুলোর অর্থ ধরা পড়লেই বা নতুন কি অর্থ আবিষ্কৃত হত? যেটুকু ধরা পড়েছে, তা থেকেই তো বন্দনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। যে উত্তরের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিল সে এতদিন।

সোমনাথের খোঁজা-খোঁজা খেলার উত্তর পেয়েছে বন্দনা, বন্দনার বয়সী মেয়ে যার থাকতে পারত, সেই সোমনাথের অপলক চোখে চেয়ে থাকার উত্তর পেয়েছে। সোমনাথের হঠাৎ কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উত্তর পেয়েছে।

কিন্তু সব উত্তর পেয়ে বন্দনাই শুধু প্রশ্ন হয়ে থাকবে ?

উত্তর দিতে পারবে না এই অসীম স্নেহের, এই অপরিসীম মমতার, এই অলৌকিক করুণার !···সোমনাথ শুধু জানবেন, সোমনাথের একটা ব্যবহার বন্দনার খুব খারাপ লাগে ? না, সোমনাথকে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবে না বন্দনা এক অসহায় নিরুত্তরতার মধ্যে থেকে।

দৃঢ়-পায়ে উঠে দাঁড়াল বন্দনা।

কলমটা তুলে নিল দৃঢ় আঙুলে। রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বলল, 'ঠাকুর ছুটে ডাক্তারখানায় গিয়ে এইটা নিয়ে এস তো। এলেই একেবারে গরম জল ভরে ও-ঘরে—'

ঠাকুর চমকে বলল, 'ও কি ছোটমা, উনুনে কি পড়ে জ্বলে উঠল ?'

'কিছু না। একটা বাজে কাগজ।'

এ-ঘরে এসে বলল, 'তুমি ওঠ দিদি, আমি দাদার কাছে বসছি। ঠাকুরকে বলেছি একেবারে ব্যাগে গরম জল ভরে আনতে—'

সুরমা এপাশে সরে এসে মাটিতে বসে পড়ে বলেন, 'পেলি?'

বন্দনা আইসব্যাগটা বাগিয়ে ধরে আস্তে সোমনাথের মাথায় রেখে, একটু যেন হেসে বলল, 'নাঃ। মানুষের মতই ব্যবহার করল সেটা, একেবারে জন্মের শোধ হারিয়ে গেল!'

নির্বোধ

'সন্দেশ না, সন্দেশ না, দোহাই আপনার!'

মারাত্মক কিছু একটা যেন হতে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি তাতে বাধা দিতে হবে, এইভাবে হৈ চৈ করে উঠল মেয়েটা।

পরিবেশক ছেলেটি ঈষৎ থতমত খেয়ে পরবর্তী পাতের দিকে সরে গেল, কিন্তু ওর কানের পর্দায় জলতরঙ্গের সুর বাজতে লাগল, আর চোখের পর্দায় ফুলঝুরির ফুলকি ঝরতে লাগলো।

কিন্তু বাকী যারা—

মানে ছাদ ভর্তি করে যে নারীবাহিনী খেতে বসেছে, তারা ভাবল, মেয়েটা কী অসভ্য! খাবি না খাবি না, তা নিয়ে আবার দোহাই পাড়বার মত আদিখ্যেতা কিসের? আর কিছুই নয়, এ হচ্ছে নিজেকে একটু বিকশিত করা, একটু প্রমিনেণ্ট করা! ছুতো করে ঝলসে ওঠা! পাদ-প্রদীপের সামনে আসবার বাসনা যাদের প্রবল, অথচ আসবার উপযুক্ত গুণ কিছু নেই, তারাই এমন অকারণে হৈ হৈ করে, বৃথা কথা নিয়ে চেঁচায়!

মনস্তত্ত্বের সব তত্ত্বই আজকাল সকলের জানা। তাই নারীবাহিনী ভেবে নেন, মেয়েটা হচ্ছে সেই ক্লাসের। বসেছে দেখনা, বেছে বেছে সবচেয়ে বড় আলোটার মুখোমুখি!

একজন পাশের জনকে নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'বাচাল মেয়েটা কে রে?'

'গিন্নীর ভাইঝি।'

'সেই ও বছরে যে ভাই মারা গেল?"

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই একটিই তো ভাই ছিল।'

'ভাজ এসেছে?'

'না ভাজ আসেনি, অন্য ছেলে মেয়েও কেউ আসেনি, ওই

একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করেই দিয়েছে আর কি। দেখতে তো মন্দ নয়, পাঁচজনের বাড়িতে যদি কারো চোখে পড়ে যায়।'

'মেয়ে তো ধিঙ্গী অবতার!'

'মা সামনে নেই, পিসির বাড়ি, তাতেই আরো—'

ঠিক এই সময় অন্য আর এক গ্রুপেও ওই মেয়েটার কথাই আলোচিত হচ্ছিল।

প্রশ্নকর্তা সেই পরিবেশক ছেলেটি, উত্তরদাত্রী একটা হাফ্-তরুণী।

'ওই বাচাল মেয়েটা কে রে?'

'ওমা অলকদা, নীরাদিকে তুমি বাচাল বললে!'

'তা' যে যা, তাকে তাই বলতে হবে।'

'বলে দেব নীরাদিকে।'

'ওঃ তা'হলে তো আমার একেবারে যাবজ্জীবন ফাঁসি হয়ে যাবে! তা' কে তাতো বললি না?'

'নীরাদি? নীরাদি জ্যেঠাইমার ভাইঝি!'

'ওঃ তাই নাকি! বড় মামীর যে ভাই সেবার—'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো—'মেয়েটা মুখটা একটু করুণ-করুণ করে, 'জ্যেঠাইমার ভাজ আসেন নি।'

'যেটিকে পাঠিয়েছেন সেটি তো একখানি! কটা আইসক্রীম খেয়েছে জানিস? অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ।'

মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'বাবাঃ অলকদা, এত বাড়িয়ে বলতে পারো তুমি! বলে দেব, বলে দেব!'

হাততালি দিয়ে পালায় মেয়েটা।

বয়সে এখনো কিছু কমতি আছে বলে যে পাকামিতে কমতি আছে, তা নয়।

কথাগুলি 'বলে দেওয়াই' যে অলকদার পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তা সে ভালই বুঝেছে। 'বলে দেবার' জন্যেই যে এত করে বলা, তা'ও বেশ

বুঝেছে। অতএব 'বলে দিতে' অর্থাৎ সাদা কথায় বার্তা পৌঁছে দিতে চলে গেল সে।

সে রাত্রে আর নয়, দেখা হল পরদিন সকালে। অলকের গরদের পাঞ্জাবি কুঁচকে লাট্, নীরার চোখে মুখে উগ্রপ্রসাধনের বাসি ছাপ।

কিন্তু যেন সদ্য সাজের চেয়ে মনোরম।

অন্ততঃ দু'জনেরই তাই মনে হ'ল।

আক্রমণ করল নীরাই। 'অজানা অচেনা মেয়েদের 'বাচাল অসভ্য' ইত্যাদি ভাল ভাল বিশেষণে ভূষিত করা বুঝি আপনার পেশা?'

অলক নিরীহ গলায় বলল, 'এ সব কথার মানে কি? বুঝতে পারছি না তো?'

'না, তা পারবেন কেন? আমি বাচাল, আমি পঞ্চাশটা আইসক্রীম খেয়েছি—'

অলক হেসে ওঠে, 'যাক্ তাহলে কার্যসিদ্ধি হয়েছে আমার!'

'তার মানে?'

'মানে অতি সোজা! মিথ্যে অপবাদ দিলে তেড়ে এসে ঝগড়া করবে না, জানি এমন মেয়ে বিরল!'

'ঝগড়া করাই চান বুঝি?'

'নিশ্চয়! ভাব করার ওটাই তো প্রথম এবং প্রধান সোপান।'

নীরা লাল হয়ে উঠল।

তারপর বলল, 'ভাব করার কি দরকার?'

'পৃথিবীতে ভাব করবার মত লোকের বড় অভাব, তাই।'

'আর বুঝি লোক খুঁজে পেলেন না?'

'আপাততঃ তো নয়।'

'দু'দিনের জন্যে ভাব করে লাভই বা কি? এই তো আজ কনে চলে যাবে, আমরাও কাল যে যেখানের চলে যাব। জীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে!'

অলক একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'সারা জীবন ধরেও

দেখা হতে পারে। এই ভাবই 'লাভে' পরিণত হবে কিনা কে জানে!'

'আঃ! কী অসভ্য আপনি!'

বলে বেশ গুছিয়ে বসে নীরা।

অসভ্য ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়ানোর কোন ইচ্ছে দেখা যায় না তার।

বর-কনে বিদায়ের দিন, সবাই এদিকে ওদিকে ব্যস্ত।

কনের মামাতো বোন, এবং পিসতুতো ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবার সময় কারুর হবে না, এই ভাবল ওরা। তাই পরমানন্দে 'ভাব'কে বাড়াতে শুরু করল।

'সন্দেশ দেখে মূর্চ্ছা যান বুঝি?'

'স্রেফ! দেখলে মাথা ধরে ওঠে।'

'ফ্যাসান!'

'আচ্ছা! মশাইয়েরও এমন কিছু নেই যেন!'

'কিছু না! ছেলেরা অত ফ্যাসান করে না।'

এমনই সব মাথা-মুণ্ডহীন কথা। কথার জন্যেই কথা।

ওদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখবার সময় হয়, এমন লোকের অভাব হয় না। কনের মার কানে ওঠে। 'অলক তো তোমার ভাইঝির সঙ্গে খুব জমিয়ে ফেলেছে!'

কনের মা শুনে এক অপ্রত্যাশিত আশায় পুলকিত হন। জমিয়ে যদি ফেলে থাকে মন্দ কি! অলক তো একটি পাত্রের মত পাত্র, নীরাও খুবই খাসা দেখতে।

দাদা মারা গেছেন, বৌদির তো ওই অবস্থা! আমি লুকিয়ে কিছু পাঠাই, আর বৌদির বাবা কিছু দেন, এইতে তো কোন মতে চালায়। এই যে মেয়ে পাঠিয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি তাকে এক গোছা শাড়ী বার করে দিয়েছি, তবে না পাঁচজনের কাছে মুখ রক্ষে। মেয়েটা সপ্রতিভ আছে। মনে হচ্ছে পাছে কেউ বাপ-মরা দুঃস্থ মেয়ে ভেবে

বসে, তাই অত হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে। তা সে একরকম ভাল। গরীব গরীব ভাব নিয়ে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়ানর চাইতে অনেক ভাল।

ঠিক আছে, ভাবটা আরও একটু জমুক, তারপর পাকড়াচ্ছি অলককে। বলব, বাপ-মরা মেয়ে দয়ার পথ ছাড়া তোর মত সু-পাত্র পাবে কোথা? তারপর ভাবলেন, আরও একটু চালাকি করলে হয়।

কাল তো দু'জনেই যাবে চন্দননগর থেকে, অলককে বলব, 'মেয়েটাকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দে তুই।'

প্রেমে পড়ে বসবেই তাহলে। রেলগাড়ী হচ্ছে পঞ্চশরের একটি ঘাঁটি।

যে লাগিয়ে দিতে এসেছিল, সে তেমন সুবিধে করতে না পেরে অন্য ঘাটে নৌকো বাঁধতে গেল। বলতে গেল, 'দেখছিস? সকাল থেকে দুটোতে আর কোথাও নেই, সর্বদা একসঙ্গে ঘুরছে।'

'মাথাটি ঘুরেছে আর কি!'

'কার মাথা কে ঘোরাল বল দিকি?'

'বলা শক্ত! দু'জনেই দুজনের বোধ হয়। কি রকম বিভোর বিহ্বল চাউনি দেখছিস না?'

আড়ালে আড়ালে চলছেই এ রকম কথা।

কিন্তু ওদিকে যে আর এক মাথাঘোরার মত কাজ হয়েছে, তা কে জানত? জানতে পারল যখন সারাবাড়ীতে ঘুরপাক খেল কথাটা।

গরদের পাঞ্জাবী খুলে রেখে স্নান করতে গিয়েছিল অলক, স্নান করে এসে পকেট থেকে পার্সটা খুঁজে পাচ্ছে না।

অলককেই দূষতে লাগল সবাই, বিয়েবাড়িতে কেউ ওভাবে রাখে? সোনার বোতামটা যে চুরি যায় নি, এই রক্ষে!

রক্ষে!

আবার বলতে গেলে রক্ষেও নয়।

চাকর-বাকর নিলে, বোতামটাও রাখত না। কিন্তু তা রেখেছে।

অতএব চোর সেই শ্রেণীর, যে কাঁচা টাকাটা মারতে পারবে, সোনার বোতাম হজম করতে পারবে না।

'ঘরের ছেলেমেয়েই কেউ নিয়েছে।'

রায় দিলেন গিন্নীর শ্বাশুড়ী। কনের ঠাকুমা, অলকের দিদিমা।

তা তিনি ভাঙা গলায় চেঁচালে আর কি হবে? বাড়ির ছেলেমেয়েকে কে যাবে সার্চ করতে?

করবে না। কিন্তু প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠছে সবাই, কত ছিল পার্সে?···মনে নেই?

···ওমা! তবু?···কুড়ি পঁচিশ?···তাই বা কম কি?

এর পর বর-কনে বিদায়ের কাল এল। সবাই তৎপর হল।

কনের মা এই হিজিবিজির মধ্যে আর বিয়ের কথা তুললেন না। শুধু কলকাতায় পৌঁছে দেবার কথাটা বললেন।

'ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তুই যদি ওকে একটু পৌঁছে দিস বাবা! বাড়ি অবধি পৌঁছতে হবে না, ষোল নম্বর বাসে তুলে দিলেই—'

অলক বলল, 'এত ইয়ে করে বলছেন কেন বড় মামীমা? হুকুম করুন, "এই অলক, আমার ভাইঝিকে পৌঁছে দিবি"—তবে তো ঠিক বলা হয়।'

কনের মা হাসলেন।

তারপর বললেন, 'তোর আবার টাকা-কড়ি হারাল, মন খারাপ—'

অলক হাসল।

'সামান্য ক'টা টাকা, তার জন্যে আবার মন খারাপ—'

নীরার কাছে ও ঠিক ওই কথাই বলে, আর একটু ঘোরালো করে। 'বড়মামী বলছেন, 'আমার ভাইঝিটাকে আবার তোর ঘাড়ে চাপাচ্ছি, টাকা হারিয়ে তোর মন খারাপ—' তা আমি বললাম, 'সামান্য দুটো টাকা হারিয়ে আবার মন খারাপ! বলে মনটাই হারিয়ে বসে আছি—'

নীরা ঝঙ্কসে উঠে বলে, 'এই কথা বললেন পিসিমাকে?'

'বললাম তো। বলব না কেন?'

'উঃ কী ভীষণ ঠাট্টা করেন আপনি—'

'কে বললে ঠাট্টা?'

'আহা সত্যি আবার হয় না কি?'

'হবে না কেন?'

'দুদিনের মধ্যে মন হারানো—'

'দু' মিনিটের মধ্যেও হতে পারে। তাই মামীমাকে বলেছি—ভাইঝিটাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘাড়ে চাপিয়ে আর কী এত শাস্তি বিধান করলেন আমার? বরাবরের জন্যে হলেও বা—'

'কক্ষনো না! কক্ষনো না'—নীরা চেঁচিয়ে লাফিয়ে একাকার করে। 'কক্ষনো একথা বলেন নি আপনি পিসিমাকে।'

'আহা মনে মনে তো বলেছি!'

ফাজিল অলক কথায় মাৎ করে।

নির্বোধ নীরা মুগ্ধ হয়।

কিন্তু অলকের যে সবটাই ফাজলামি, তাও নয়। মামীর কাছে মামীর ভাইঝির অবস্থা সে শুনেছে। বাপ মারা গেছেন, পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, কষ্টে চলছে, অথচ মেয়েটা এমন হাসিখুসি ফুর্তিবাজ, পিসির ইচ্ছে হয় যে একটা ভাল ঘরে পড়ুক।

অলক ভাবে, মেয়েরা স্বামীতে তদ্গত হয় খুব। তা'ছাড়া—দেখতে তো সত্যিই ভাল।

মামী বলেছেন ওকে ওর গন্তব্যস্থলের বাসে চড়িয়ে দিলেই অলকের ছুটি। সেটা তো ভদ্রতা নয়, বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে, আর ওর মার সঙ্গে দেখা করে নেওয়া যাবে।

ওরা যখন দু'জনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের উদ্দেশে—বিয়ে বাড়ির সবাই হাসাহাসি করে, 'গিন্নীর ভাইঝির বিয়েটা তাহলে পাকলো?'

'মনে তো হচ্ছে।'

'তখনই বলেছি ধিঙ্গী মেয়েটাকে মা একা পাঠিয়েছে বর পাকড়াতে!'

'অলককে তো বেশ চালাক ছেলে বলেই জানতাম।'

'বাচাল ছুঁড়িদের হাতে পড়লে অনেক চালাকের চালই উড়ে যায়।'

ওরা অবশ্য পিছনের এই আলোচনার ছন্দাংশও জানে না, ওরা পরমানন্দে গল্প করতে করতে গিয়ে ট্রেন ধরে, এবং চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসার এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই ওদের ভাবী জীবনের ছবিটা প্রায় স্থিরীকৃতই হয়ে যায়, অবশ্য মনে মনে।

গল্পের ভঙ্গীটা এই—

'আমাকে বাসে চড়িয়ে দিয়েই আপনার ছুটি—'

'পাগল! আবাস পর্যন্ত না দেখে ফিরবো ভেবেছেন?'

'ওমা, আপনার যে অনেক সময় নষ্ট হবে!'

'তা আর কি করবো! মামীর ভাইঝিকে যখন ঘাড়ে করতে হয়েছে—। চা খাবেন?'

'বাঃ! এই তো খেয়ে বেরোনো হল?'

'তাতে কি। রেলগাড়িতে চা খাওয়ার একটা আলাদা সুখ আছে।'

চা ডাকল অলক, কিনল, পকেট থেকে পয়সা বার করল, আর ঠিক সেই সময়, হ্যাঁ—ঠিক যে সময় বাকি খুচরো পয়সাগুলো অলক আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে রাখছে, সেই সময় নির্বোধ মেয়েটা তার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই সুন্দর ছবিটার ওপর ঢেলে বসল এক দোয়াত কালি।

না, সে ছবি আর উদ্ধার হবে না।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই কালির অন্ধকার এসে জমেছে অলকের মুখে। চায়ের কাপটা ঠেলে রেখেছে অলক, খানিকটা চা সুদ্ধ, টোস্টে হাত দেয় নি।

আর নীরা ?

নিজের হাতে যে নিজের ছবি ঘোচাল ? সে তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে, কাঠের পুতুলের মত ! যতই নির্বোধ হোক সে, বুঝছে সমস্ত সম্ভাবনায় ইতি হয়ে গেল !

অথচ এর কিছুই না হতে পারতো। কিন্তু হলো।

জগতের অসংখ্য নির্বুদ্ধিতার ইতিহাসে আর একটি কাহিনী সংযোজিত হল।

অলক যখন পয়সা পকেটে রাখছে, তখন নীরা হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনার হারানো জিনিসটা যদি ফিরে পান ?'

অলক মৃদু হেসে বলল, 'ফিরে পেতে চাই একথা তো বলিনি।'

'আহা, সে কথা হচ্ছে না। এ একেবারে মোটা ব্যাপার। অদৃশ্য নয়, স্রেফ দৃশ্যমান। আপনার পার্সটার কথা বলছি—'

পার্স ! চমকে উঠল অলক।

নীরা অপ্রতিভ হাসিমুখে বলে, 'আসলে কী হয়েছিল জানেন, আপনি ওই রকম অসাবধানের মত পকেটে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন বলে, আমি চালাকি করে সরিয়ে রেখেছিলাম—'

অলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'চালাকি ?'

'বাঃ, তা'ছাড়া ?'

'তা বটে ! তাছাড়া আর কি ! তারপর বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন'—ব্যঙ্গস্বরে বলে অলক।

নীরার বুকটা কেঁপে ওঠে।

মুখটা শুকিয়ে যায়। বলে, 'ভুলে যাব কেন ?—কিন্তু হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, বলে এমন গোলমাল উঠল যে, বলতে লজ্জা করল।'

অলক তীক্ষ্নস্বরে বলে, 'সে লজ্জাটা এখনো করলেই ভাল হতো !'

নীরা এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না, আস্তে নিজের স্যুটকেস থেকে

পার্স টা বার করে অলকের সামনে রেখে দেয়। অলক হাতও দেয় না। ট্রেন চলতে থাকে।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি এসে থামলে, তু'জনেই উঠে দাঁড়ায়। নীরা আস্তে বলে, 'ওটা তুলুন।'

'ওঃ তুলতে হবে বুঝি!' তুলে নেয় অলক।

তার পর তার মুখটা খুলে দেখে নিয়ে বলে, 'চালাকি করে খুব বেশী 'লাকি' হতে পারতেন না। মাত্র দশটি টাকা!' নীরা আরক্ত মুখে বলে, 'আপনার কি ধারণা আমি—'

'কী মুশকিল! ধারণা নিয়ে কি কথা চলে?'

বাসে নয়, ট্যাক্সিতে তোলে অলক। অনেকগুলো টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দেয়, আর নীরাদের বাড়ি নামবার আগের মোড়ের দোকান থেকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সন্দেশ কেনে। পুরো দশ টাকার সন্দেশ!

পার্সের ভিতরকার সেই নোটখানা দিয়ে। তারপর—ওদের দরজায় এসে সন্দেশের বাক্সটা ওর হাতে ধরে দিয়ে বলে, 'আচ্ছা চলি

নীরা অস্ফুটে বলে, 'ভেতরে যাবেন না?'

'নাঃ। ভেতরে গিয়ে আর কি হবে?'

'এ সব কি হবে?'

'কী আর হবে?' অলক হেসে উঠে বলে 'খাবার জিনিস, খাবেন। কুটুমবাড়ি থেকে এলে তো মিষ্টি দেওয়ার রেওয়াজ আছে।'

চলে যায় অলক।

নীরা চেঁচিয়ে হাট বাধাতে পারে না; 'সন্দেশ নয়, সন্দেশ নয়, দোহাই আপনার! সন্দেশ দেখলেই আমার মাথা ধরে।'

বলতে পারল না, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই দশ টাকার সন্দেশের ডালি হাতে করে। আর ভাবতে লাগল, অলক তাকে 'চোর' ভাবল! তুচ্ছ একটু মজা করতে গিয়ে—'

কিন্তু—

নেবার সময় সত্যিই কি 'মাজ'র উদ্দেশ্যেই নিয়েছিল নীরা ?

ভাবেনি কি, গোলমালের বাড়িতে কে অত বুঝবে ?

এখন হয়তো নিজের কাছেই সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা করছে, তাই—

কিন্তু অলক যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। আর সে কথা নির্বোধ নীরাও বুঝতে পেরেছে।

এই পৃথিবী

রাতদুপুরে 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু' ডাক পড়লে, ডাক্তারের বাড়ির লোকেরা যে আহ্লাদে অধীর হয় না, একথা আর কেউ না জানুক, ডাক্তারের বাড়ির লোকেরা খুব ভালই জানে। ওই 'ডাকের' পেছনে টাকার আভাস আছে জেনেও হয় না।

এ হেন ডাক শুনে ডাক্তারের মা রেগে জ্বলে অনায়াসে বলে উঠতে পারেন, 'শত্তুর, সব শত্তুর! বাছাকে আমার বাঁচতে দেবে না।'

ডাক্তারের স্ত্রী অক্লেশে রোগীর উদ্দেশে বলতে পারে, 'মরবার আর সময় পেল না, রাতদুপুরে মরতে সাধ হল!'

আর ডাক্তারের মেয়ে 'ডাকনদার'কে গিয়ে ভুরু কুঁচকে বলতে পারে, 'বাবার শরীর ভাল নেই, এইমাত্র তো শুলেন, এখন কি করে ডাকবো বলুন?'

টাকার বাজনার সম্ভাবনা ভুলেই বলতে পারে।

কিন্তু যেখানে সে সম্ভাবনাও নেই?

সেখানে?

বিরক্তির তাপটা মেজাজের কোন 'মিটারে' গিয়ে পৌঁছয়?

অন্তত ডাক্তার বসাকের স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গাবতী বসাকের মুখ দেখে মনে হয়, 'মিটারে' কুলোবে না, তাপমান যন্ত্রটা ফেটে পড়বে।

অথচ এই প্রবল রাগকে দমন করে বসে থাকতে হবে, টুঁ শব্দটি করবার জো নেই। কারণ এই দুপুর-রাতের শান্তিভঙ্গকারীটি হচ্ছে ডাক্তার বসাকের প্রাণের বন্ধু সুধাকান্তর বড় ছেলে সুকান্ত।

সুকান্ত ডাক্তারবাবু বলে ডাকে না, ডাকে কাকাবাবু বলে।

কিন্তু একবার-আধবার কি ডাকে?

না, তাহলে 'কাকাবাবু' শুনলেই দুর্গার এত হাড় জ্বালা করত না। এ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার।

সুধাকান্তর স্ত্রীর হার্টের অসুখ, যখন তখন মরমর হ'ন, আর সেটা বেশীর ভাগই মাঝ-রাত্তিরে হন। অতএব সুকান্তকে ঘুম চোখে ছুটে আসতে হয়, আর জানলার নিচে থেকে চেঁচাতে হয়, 'কাকাবাবু! কাকাবাবু!'

অবশ্য বেশীদূর ছুটতে হয় না তাকে, ডাক্তারের বাড়ি থেকে খান পাঁচ ছয় বাড়ির পরেই সুধাকান্ত সেনের বাড়ি। যে সুধাকান্ত ডাক্তারের আশৈশবের বন্ধু।

কাকাবাবু শুনেই উঠে বসেন ডাক্তার। কারণ ঘুম তাঁর সজাগ। তা' দুর্গার ঘুমও খুব একটা অঘোর ঘুম নয়। সেও জেগে যায়। ডাক্তার বসাক বলেন, 'কে যেন ডাকল—'

দুর্গা বলে, 'নতুন কেউ নয়! তোমার সুধার ছেলে। আবার বোধ হয় গিন্নীর মরণ চাগল। আশ্চয্যি কাঠপ্রাণ! মরেও না তো!'

ডাক্তার ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'কেন? মরলে তোমার কোনো উপকার হবে? বেঁচে থেকে তোমার পাকা ধানে মই দিচ্ছে?'

'দিচ্ছে না, তা'ও বলা যায় না। এই যে দিন নেই, রাত নেই, তোমার ওপর হামলা করছে—'

'করছে, করবে। ডাক্তারদের ওপর হামলা সবাই করবে!'

'তুমি না হয় মহাপুরুষ, সুখ-দুঃখু নেই। আমার এই রকম নিত্যি ঘুম ঘুচে ঘুচে রোগ জন্মে যাচ্ছে—'

'সেটা তোমার বাবার ডাক্তার-জামাই করবার সময় মনে করা উচিত ছিল। আশ্চর্য, মেয়েদের নাকি বলা হয় স্নেহময়ী, মমতাময়ী! সুধার বৌ মারা গেলে, ওর সংসারের কী হবে, ভেবে দেখেছ কোনোদিন?'

দুর্গা তবু হেলে দোলে না।

দুর্গা মরীয়া হয়ে ওঠে। তাই ডাক্তার ছুটে নেমে যাচ্ছেন দেখেও তর্কে নামে। পিছু-পিছু গিয়েই বলে, 'বেঁচে আর আছে কই? মরেই তো গেছে। সংসারের কী উপকারে লাগে?'

ডাক্তার এ কথার যে কী উত্তর দেন শোনা যায় না, দ্রুত নেমে যান।

ডাক্তারের মা ঘর থেকে হাঁক পাড়েন, 'বৌমা, অ বৌমা, ননী আবার বেরোলো নাকি ?'

দুর্গা বিরক্ত গলায় বলে, 'বেরোলেন তো।'

'আহা মরে যাই, এই তো শুয়েছে—আবার কে কোথা থেকে—'

'কে আর কোথা থেকে ? সুধাবাবুর ছেলে।'

'আমারও তাই মনে হল। কী বলবো বৌমা, বললে তোমরা মনে করবে, বুড়ী কুটিল। কিন্তু ওই সুধার বৌটি একটি থিয়েটার! ওর ওই রোগের বারো আনাই দেখানো······এই তো সকালে গঙ্গা নেয়ে ফিরছি, দেখি ফেরিওলা ডেকে দোরে দাঁড়িয়ে দরাদরি করে জামার ছিট কিনছে। এক্ষুনি রাতারাতি আবার কী হল !'

'কী হল জিগ্যেস করবেন আপনার ছেলেকে ?'

বলে দুর্গা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

আর ডাক্তারের ষোল বছরের মেয়েটা জেগে জেগে শুয়ে মনে মনে ভাবে, নির্ঘাৎ ওই সুধা-জ্যেঠার বৌয়ের প্রতি বাবার ছেলেবেলায় বিশেষ একটু 'ইয়ে' ছিল। নইলে এত এমন !'

উপন্যাস পড়ে ডেঁপো হয়ে ওঠা ওই মেয়েটা যাই ভাবুক, আসলে কথাটা তা' নয়। সুধাকান্তই আশৈশব ননী ডাক্তারের প্রাণকান্ত। সুধার বৌয়ের অসুখ যেন ননী ডাক্তারেরই বৌয়ের অসুখ। সুধাকান্তর স্ত্রী মারা গেলে, ননী ডাক্তারেরই সংসার ভেঙে পড়বে যেন।

যতকাল ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে ননী বসাক, সুধাকান্তদের বাড়ির বাঁধা ডাক্তার সে। সুধার বাপ ভুগে ভুগে মারা গেছেন, একটা বোন পাঁচ বছর ভুগে তবে সেরেছে। ছেলেমেয়েগুলো ছেলেবেলায় বারো মাস ভুগেছে। সব ভোগার দায়ে ভুগেছে ননী ডাক্তার।

আগে সুধাকান্ত নিজেই আসতেন, বড় ছেলেটা বড় হয়ে উঠে পর্যন্ত বাপের কাজের ভারটা ঘাড়ে নিয়েছে।

কিন্তু ডাক্তারের কাজের ভার তার বড়ো-হয়ে-ওঠা ছেলের তো নেবার সাধ্য নেই! তাই সুধাকান্তর প্রায় সমবয়সী হয়েও ননীকে তরুণ যুবকের ভূমিকা নিতে হয়।

মাঝ-রাত্তিরেও এক মিনিটে পাঁচখানা বাড়ির সামনের রাস্তাটা পার হতে হয়।

সেদিন ডাক্তার বসাক যখন ফিরলেন, তখন ভোর হয়-হয়।

দুর্গার মনে হচ্ছিল, আজ তা'হলে সত্যিই শেষ সময় এসেছে। ভয়ও হল একটু। মরতে আমি আজ স্পষ্টাস্পষ্টি ও রকম বলে বসলাম! ও তো মরছিলই, মরবে, আমিই যেন নিমিত্তের ভাগী হলাম!

শেষ রাত্রিতে ডাক্তার ফিরলেন।

ডাক্তারের মা ভাঙা-ভাঙা গলায় ডাক দিলেন, 'বৌমা, অ বৌমা, ননী ফিরল?'

বৌমা সাড়া দিল না।

বৌমা ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। এক্ষুনি সাহস নেই স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার।

কিন্তু ভয় ভাঙতে দেরিও হল না।

শুনতে পেল, শাশুড়ীর ছেলের উত্তর।

'হ্যাঁ, এই তো আসছি—'

'তা' কেমন? খুব বাড়াবাড়ি?'

'না—ওই যেমন হয় আর কি—' ডাক্তারের গলা অলস ক্লান্ত, 'সুধার আতঙ্ক তো জানোই? ক্রমশঃ যেন বাতিকে দাঁড়াচ্ছে। একটু ইয়ে দেখলেই হৈ চৈ করে ব্যস্ত হয়ে—'

দুর্গা ভাবে ওটা আর কিছুই নয়, 'কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।' বৌয়ের রোগে রোগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, তাই দেখিয়ে দেখিয়ে হৈ চৈ করতে হয়।

আবার কান খাড়া করল, শাশুড়ী বলছেন, 'তা, তুই রাতটা

একেবারে ভোর করে এলি কেন বাবা? এক আধ ঘণ্টাও তো ঘুমোবি?'

'আর বল কেন!' ডাক্তারের স্বর আরো অলস ক্লান্ত, 'আমি বাঁচব না, আমি এক্ষুনি মরে যাবো—' বলে কান্নাকাটি—'

'যা যা, একবার গা টা গড়িয়ে নে গে যা—' বলে মা নিজেও বোধ করি সেই কর্মই করতে ফের বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

দুর্গা সাড়া শব্দ করে না। দুর্গা ঘুমে অচেতন।

দুর্গা ভাবছে, এবার একদিন মাথার দিব্যি দেব, যদি রাতে যায়। বন্ধুর বৌ 'আমি মরছি—' বলে কান্নাকাটি করে ন্যাকামির স্রোত বহাবে, আর রাত জেগে জেগে নিজে মরতে হবে?

কিন্তু দুর্গার এসব রাগ-ঝাল বিশেষ কিছু কাজে লাগে না। এ বিষয়ে ননী ডাক্তার অচল অটল।

বাড়াবাড়ি অসুখ বলে না ডাকলেও পথে যেতে আসতে প্রায়ই একবার বন্ধুর বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ান। সুধাকান্ত বাড়ি থাকুন বা না থাকুন, নিজেই ডাক দেন, 'সুধা আছিস?'

মেয়েছেলেরা কেউ বেরিয়ে আসে, ননী ডাক্তার বলেন, 'মা কেমন আছে রে?'

হয়তো বলে, 'একটু ভাল।'

হয়তো বলে, 'সেই রকমই।'

ডাক্তার ফিরে আসেন। আর ভাবেন, 'এ ওষুধটা বোধ হয় একটু লেগে গেল—'

ভাবেন, 'নাঃ ওষুধটা বদলানো দরকার।'

ফিরে এলে দুর্গা বলে, 'দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আসা হয়েছে?'

ডাক্তার হেসে বলেন, 'মেয়ে জাতটা কী হিংসুটে!'

দুর্গা বলে, 'সুধাবাবুর বৌয়ের রোগের অবস্থা আর চিকিৎসার ইতিহাস শুনলে, তোমাকে কেউ আর 'ডাক্তার' বলে গণ্যই করবে না।

যে ডাক্তার এগার বছর ধরে একটা রুগীকে ঝুলিয়ে রেখেছে, সে আবার ডাক্তার ?'

ডাক্তার হাসেন।

বলেন, 'ভিজিটের রুগী হলে, লোকে বলতো ইচ্ছে করে ঝুলিয়ে রেখেছে। হার্টের রুগীরা তো ডাক্তারদের এক একখানি তালুক !'

দুর্গা মনে মনে বলে, 'ভিজিটের ডাক্তার হলে, তোমার বন্ধুর পরিবার অনেকদিন আগেই সেরে উঠতেন।'

মুখে বলে না।

হাসিখুসি ডাক্তার, বন্ধু আর বন্ধুর পরিবারের অপমান হল ভেবে চট করে গম্ভীর হয়ে যাবেন।

এই এক দুর্বলতা ডাক্তারের।

বাড়ির কেউ যে সুধাকান্তর স্ত্রীর এই অসুখের ন্যাকামি দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তা' ডাক্তার জানেন। তাই ওদের বিষয়ে এতটুকু কথার এদিক-ওদিক হলেই, মনে করে বসেন অপমান হল।

আর ব্যাপারটা এই, নিজেও ডাক্তার, বোঝেন রোগটার বারো আনাই আতিশয্য, কাজেই সেইটাই প্রাণপণে সামলে বেড়ান।

ওদিকে সুধাকান্ত-গিন্নীর সর্বদাই অভিমান !

সকালে ডাকতে এলে ডাক্তার যদি সকালেই না গিয়ে একটু বেলা করে যান, অমনি রাগে ক্ষোভে তিনি প্রথমটা আর ভাল করে কথাই বলেন না।

তারপর শুরু করেন, 'সংসারের এই আপদ বালাইটা তো মরেও না। ডাক্তারে যাকে ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছে, তারও আবার বাঁচার সাধ !'

ননী ডাক্তারকে আবার প্রবোধ দিতে হয়। অর্থাৎ ওষুধ বদলাতে হয়।

সুধাকান্ত অবশ্য অকৃতজ্ঞ নয়।

দেখা হলেই বলেন, 'তুই ছিলি, তাই তোর বৌদি এখনো পৃথিবীর আলো হাওয়ার ভাগীদার হয়ে আছে।'

ননী ডাক্তার হেসে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বলেন, 'থাক্, খুব ফাজলামি হয়েছে।'

সুধাকান্তর ছেলেরা বলে, 'কাকাবাবু না থাকলে যে কী হত!'

ডাক্তার হেসে বলেন, 'কী হত বল দেখি? সমুদ্রেরা আকাশে গিয়ে উঠত, আর পাহাড়েরা পাতালে তলিয়ে যেত?'

সুধাকান্তর মেয়েরা বলে, 'কাকাবাবু যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ আর মনে হয় না জগতে রোগ-শোক কিছু আছে—'

সুধাকান্ত হেসে উঠে বলেন, 'ওই দুটো নিয়েই তো আমাদের কারবার, তাই ধুলোপড়া দিয়ে ওদের ঢাকা দিয়ে রাখি।'

কিন্তু মেয়েদের কথাটা খুব বেশী অত্যুক্তি নয়। রোগীর ঘরের আবহাওয়া ভাল করে তোলাও যে একটা প্রধান চিকিৎসা, এ নীতিতে বিশ্বাসী ননী ডাক্তার।

তাই সরস কথাবার্তায় আবহাওয়া হালকা করে তোলার ভার তুলে নেন নিজের হাতে।

আর কৃতকার্যও হন।

বাক্‌পটু মানুষ, স্বভাবে হাসিখুসি, সরস কথাবার্তায় সত্যিই রোগীর ঘরের ভারী হাওয়া হালকা করে দেন।

আজও সকালে ও বাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকে গল্পগাছা করে এসেছেন ডাক্তার। তখন তাঁর কথার ভঙ্গিমায় হেসে গড়িয়ে পড়েছেন শ্রীমতী সেন।···

আর হঠাৎ আজই রাত্রে—

হ্যাঁ, রাত্রে সুকান্তর উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠ ডাক্তারের দরজায় আছড়ে পড়ল 'কাকাবাবু! কাকাবাবু!'

মাঝরাত্রে নয়, প্রথম রাত্রে।

ডাক্তার বসাক তখনো ফেরেন নি। বাড়িতে খবর দিয়েছেন বেশী রাত হবে, একজন রোগী বাঁচে কি না!

একেই তো সবাই শুনেছে ফিরতে বেশী দেরি হবে, তার ওপর আবার এই হাজা-পচা নিত্য রোগীর জন্য সেই বিরক্তিকর চির পরিচিত ডাক!

দুর্গা নিজেই নেমে আসে।

বলে, 'আবার কী হল?'

'যায় যায় অবস্থা, কী রকম যেন করছেন', উদ্‌ভ্রান্ত সুকান্ত বলে, 'এলেই পাঠিয়ে দেবেন। জুতো খোলবার আগেই—'

বলা বাহুল্য দুর্গার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

অথবা ধৈর্যচ্যুত হয়েই সে নিচে নেমেছে।

তাই তীক্ষ্নস্বরে বলে ওঠে, 'তোমার মার প্রাণটাই প্রাণ? জগতে আর কারো প্রাণ প্রাণ নয়?'

এতগুলি 'প্রাণের' শরাঘাতেই বোধ করি সুকান্ত থতমত খেয়ে বলে, 'কী বলছেন?'

বলছি—'রোগীকেই শুধু বাঁচতে হবে? ডাক্তারের বাঁচার কোনো দরকার নেই? সেই কোন সকালে বেরিয়েছে মানুষটা, এখনো ফেরে নি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আবার এখন তুমি বলছ, জুতো না ছাড়তেই পাঠিয়ে দিতে!—মায়ামমতা বলেও তো কথা আছে একটা?'

এবার আর বুঝতে ভুল হয় না সুকান্তর। থতমতও খায় না। শান্তস্বরে বলে, 'নিরুপায় হয়েই আসি কাকিমা! মার অবস্থা দেখলে—'

আজ ডাক্তার বাড়ি নেই।

আজ দুর্গা ব্যাপারটা হাতের মুঠোয় পেয়েছে। তাই ও কথাতেও লজ্জিত হয় না। বিরস স্বরে বলে, 'নিরুপায়ের কি আছে? জগতে কি আর ডাক্তার নেই? তোমার কাকাবাবু তো রুগী সারিয়ে তুলতেও পারলেন না এ পর্যন্ত—'

তা' শেষ অবধি আর শোনে নি সুকান্ত। জগতে আর ডাক্তার আছে কি না এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

দুর্গার যে একটু ভয়-ভয় না করলো, তা' নয়। তবু দুর্গা মনকে শক্ত করে ভাবলো, ঠিক আছে! একটু রাগ হয় তো তাও ভাল। বাঁচি আমরা।

তা' রাগ যে ওদের সত্যিই হয়েছিল, তা বোঝা গেল খানিক পরেই। যখন ডাক্তার বসাক সবেমাত্র একটা রোগীকে মেরে তার 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

রাত একটা তখন।

ডাকতে এসেছে সুধাকান্ত নয়, তার ছেলেমেয়েরা কেউ নয়, বাড়ির চাকর।

চাকর পাঠানো দেখেই হোক, অথবা দীর্ঘ সময় যমে-মানুষে টানাটানির পর যমের হাতে পরাজয় স্বীকার করে আসার গ্লানিতেই হোক, ডাক্তার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ফেলেন, 'জ্বালালে! আবার এখন 'মা'র বাড়াবাড়ি? বলগে যা, কাকাবাবু এইমাত্তর ফিরলেন, খুব টায়া—ইয়ে ক্লান্ত, এখন আর যেতে পারবেন না, সকালে যাবেন।'

চাকরটা চলে গেল।

বিনা বাক্যব্যয়েই গেল।

আর ঠিক তখনই ননী ডাক্তারের মনে হল, দূর ছাই, না ফিরিয়ে দিলেই হতো! এই ধড়াচূড়া পরেই একবার দেখে এলে হতো।

কিন্তু এখন আর যাওয়া যায় না। দুর্গা সব শুনেছে দাঁড়িয়ে।

তা' ছাড়া সত্যিই শরীর যেন ভেঙে পড়ছে।

অবোধ ডাক্তার, পৃথিবী সম্পর্কে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ননী ডাক্তার কি তখন ভেবেছিলেন, তাঁর ওই সামান্য 'শরীর ভেঙে পড়া'র পথ ধরে তাঁর আজীবনের গড়া একখানি স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়বে? গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে?

ভাবেন নি।

কিন্তু গেল।

ডাক্তারের চিরদিনের 'সুধা' ওই ক্রটিটুকুর রসায়নে কেমন করে না জানি বিষে পরিণত হয়ে গেল!

পরদিন যখন ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ননী ডাক্তার ও বাড়ি ছুটলেন, সুধাকান্ত দোতলা থেকে নামলেন না। বড় ছেলে সুকান্তও না। বড় মেয়ে সুবচনা নেমে এসে ভারী মুখে তিক্ত বচনে বলল, 'মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছেন, এখন আর দরকার নেই!'

ঘুমের ওষুধ!

ডাক্তার আকাশ থেকে পড়েন।

তাঁর দেওয়া কোনো ঘুমের ওষুধ তো ছিল না। না জানা, না বোঝা, কী আবার ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বসে থাকল সুধা—হার্টের রুগীটাকে!

সুবচনার বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কানে ঠেকল না ডাক্তারের, ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ঘুমের ওষুধ আবার কোথায় পেল? কোন্ ওষুধ দিতে গেল হঠাৎ?'

কথা শেষ হবার আগেই সুবচনা ভুরু তুলে বলল, 'ওষুধ আর পাবেন কোথায়, ডাক্তারেই দিয়ে গেছে। ডাক্তার পাল এসেছিলেন, ওষুধ দিয়ে গেছেন।'

ডাক্তার গোপালচন্দ্র পাল পাড়ার ডিস্‌পেনসারির ডাক্তার, পাড়ায় সকলে ওর নামে হাসে। বলে 'গোপাল পাল, গোরুর পাল—'

তাই ননী ডাক্তার বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেন না। বলেন, 'আঃ তোদের বাবা তু'ঘণ্টা ধৈর্য ধরে না। পালটাকে আবার কে ডাকতে গেল?'

সুবচনা মধুর বচনে উত্তর দিল, 'নিরুপায় হয়েই ডাকতে হয়েছে কাকাবাবু, চোখের সামনে একটা রোগীকে তো আর বিনা ওষুধে মরতে দেওয়া যায় না!······তা' উনি তো সব দেখে-শুনে বললেন, 'এ যাবৎ যা কিছু চিকিৎসা হয়েছে, সবই ভুল।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে।

দুর্গা-ঘটিত ব্যাপার জানেন না ডাক্তার। নিজের গত রাত্রের সেই ত্রুটিটুকুই একমাত্র কারণ মনে করে, মনে মনে গর্জে ওঠেন। বিশেষ করে চিরদিন 'কাকাবাবু' বলে আহ্লাদে গড়িয়ে-পড়া এই মেয়েটার সংবাদ পরিবেশনের অসভ্য ভঙ্গীতে পিত্তি জ্বলে যায়।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'শুনে কৃতার্থ হলাম! ডাক্ দিকি বাবাকে!'

সুবচনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'বাবাকে এখন ডাকবো কি করে? সারারাত জেগে এই তো শেষরাত্রে টায়ার্ড হয়ে একটু শুয়েছেন!'

না, তারপর আর দাঁড়ান নি অবিশ্যি ডাক্তার। চলে এসেছিলেন তাঁর আশৈশবের বন্ধুর দরজা থেকে।……

অতঃপর সে দরজা বন্ধই হয়ে গেল ননী ডাক্তারের মুখের সামনে। খোলা রাখবার দরকারই বা কি আর? ডাক্তার পাল তো বার তিন চার দর্শনী সংযুক্ত 'দর্শনেই' এগারো বছরের পুরানো রোগীকে সারিয়ে তুলেছে।

কই আর তো যখন তখন 'মরমর' হন না সুধাকান্ত-পত্নী।

এখন তাই রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে, (আর সেটা হরদমই হয়) সুধাকান্তর ছেলেরা কাকাবাবুকে চিনতে না পারার ভান করে চলে যায়, আর মেয়েরা চোখোচোখি হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে বেজায় হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চলে যায়।

আর সুধাকান্ত তাড়াতাড়ি 'এই যে, ফিরছ?' বা ওই রকম কিছু বলে সরে পড়েন।

আর?

আর—শুনতে পাওয়া যায়, 'বিনি পয়সার রুগী' বলে ননী ডাক্তার বন্ধুর বৌটাকে এত অছেদ্দা করে চিকিৎসা করেছে যে, আজ এক যুগ ধরে মানুষটা 'মিথ্যে মানুষ' হয়ে পড়ে থেকেছে!…কেন বাবা, এই তো হাত বদল হয়েই তো দিব্যি সেরে উঠেছে সেন-গিন্নী!…চোখ

কান বুজে ঠেলা-মারা একটা ওষুধ দেওয়াকে কি আর চিকিৎসা করা বলে? ভুল চিকিৎসায় মরতেই বসেছিল বরং রুগী। নেহাত্ত পরমায়ু ছিল বলেই—'

মশকবাহিত ম্যালেরিয়ার মত, মাছিবাহিত কলেরার মত, ভাইরাসবাহিত সর্দির মত, পাড়ার মহিলাকুলবাহিত হয়ে খবরটি ননী ডাক্তারের অন্তঃপুরে এসে পৌঁছয়।

দুর্গার ইচ্ছে করে স্বামীকে বলে, 'তুমি তো সুধাবাবুর বৌয়ের রোগ সারাতে পার নি, সে তোমার আজন্মের রোগটা সারিয়েছে তো— মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে? চিনেছ তো পৃথিবীকে?'

বলতে পারে না।

স্বামীর মুখের চেহারাটা দেখেই বোধ করি বলতে পারে না। ডাক্তার বলেন বলে তো সত্যিই পাষাণ নয় সে?

চন্দনের জন্যে

আজকেই শেষ দিন। ভারতী একবার ওর এই বাইশ বছরের পরিচিত ঘরটার সমস্ত দৃশ্যটার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো, আজকেই শেষ দিন।

হ্যাঁ, আজকেই কুমারী জীবনের শেষদিন ভারতীর। আর ক'ঘণ্টা পরেই ভারতী আর 'ভারতী সেন' থাকবে না, 'ভারতী ব্যানার্জি' হয়ে যাবে। হয়ে আবার ফিরে আসবে সত্যি। এ ঘরেই ফিরে আসবে, কিন্তু মনের মধ্যের সমস্ত অধিকার-বোধ কি হারিয়ে ফেলবে না? ভাঙচুর হয়ে যাবে না সমস্ত?

আর কি ভাবতে পারবে ভারতী,—'এটা আমার ঘর, এটা আমার টেবিল, এই টেবিল-ল্যাম্পটা আমার, এই আলমারি, সেলফ্, বিছানা বালিশ, সব আমার?'

পারবে না।

ভাবতে পারবে না।

যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সংস্কার তাকে গোত্রান্তরের অনুভূতিতে ঠেলে দেবে রেজেষ্ট্রী অফিসের সেই সই করার সঙ্গে সঙ্গে।

গোত্রান্তরিত হবে ভারতী সেন। ভারতী ব্যানার্জি হয়ে যাবে।

তবু তার বাবা অমিয় সেন জানতে পারবে না সে কথা।

তার মা মাধবী সেনও টের পাবে না সে খবর। বিকাশ বলেছে, 'আগে থেকে জানাজানি করে কোনো লাভ নেই। সেটা শুধু ইচ্ছে করে অসুবিধে বাড়ানো। জানলে—প্রতিরোধ আসবেই।···কী দরকার সে সব অশান্তিতে? পরে বলা হবে।···মরার পর তো আর ওষুধ নেই।'

অতএব কাউকে না জানিয়ে মরাটাই সাব্যস্ত করে নিয়েছে ভারতী।···আর খানিক পরে, মাকে 'ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে পড়বে।

তারপর ফিরে আসবে!

মা ভাববে নিত্য দিনের মত লাইব্রেরি থেকে পড়েই এল বোধহয়। বাবা যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবেন, নিত্য দিনের মতই ডাকবেন,'ভারতী, কই রে?'

ভারতীর হাতেই তিনি হাতের ফোলিও ব্যাগ, গলার 'টাই', পকেটের পেন, কব্জির ঘড়ি, চাপিয়ে চাপিয়ে দেন।...আজও দেবেন।...

কিন্তু ক'দিন পরে আর দেবেন না!

ক'দিন পরে যেদিন বিকাশ এসে ভারতীর সঙ্গে একসঙ্গে অমিয় সেনকে আর মাধবী সেনকে প্রণাম করবে, সেদিন থেকে আর দেবেন না। মেয়ের এই অবিশ্বাস্য অবিশ্বাসের কাজ দেখে পাথর হয়ে যাবেন তিনি।

বিকাশ বলেছে, 'ভাবছ কেন? কিছুই হয় না। বড় জোর দু'এক মাস। তারপর বাবাকে লুকিয়ে দুপুরের সময় মার সঙ্গে দেখা করা, তারপর একটা বিশেষ দিনে, বিজয়াদশমী কি নববর্ষে, জন্মদিনে কি রাখিপূর্ণিমায় ঘ্যাঁচ্‌ করে এসে বাবার পায়ে একটা পেন্নাম ঠোকা! ব্যস! তারপর দেখো, আদর ধরবে না! বিনি পয়সায় এমন একখানি সোনার চাঁদ জামাই জোগাড় করে এনে দেওয়ার জন্যে বাবা তোমায় দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন!'

কিন্তু দু'মাস এক মাস সময়টা কি কম? আর চোরের মত চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করাটা কি কম লজ্জার?

জীবনের যেটা শ্রেষ্ঠ দিন, সে দিনটা যাবে কেবল মিথ্যার জাল বুনে?

তাছাড়া আর কি?

সকাল থেকেই তো শুরু হয়েছে সেই জাল-বোনা। মা যখন বলেছেন, 'ভারতী, তোর চোখটা অমন ভারী ভারী লাল লাল দেখাচ্ছে কেন রে? মাথার জানলা খুলে শুয়েছিলি বুঝি?'

ভারতীকে বলতে হয়েছে, 'হ্যাঁ মা! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দেখি বৃষ্টির ছাট এসে মুখে লাগছে!'

এই কথাই বলেছে ভারতী। মানে যা মুখে এসেছে।

দাদা বলেছে, 'চা ঢালতে অত ফেলছিস যে? হাত কাঁপছে নাকি?'

ভারতী বলেছে, 'হাত কাঁপতে যাবে কেন? চা ফেলেছি ইচ্ছে করে। চিনিতে পিঁপড়ে ছিল।'

বাবা বলেছেন, 'ভারতী, তোর শরীরটা তো ভাল দেখাচ্ছে না, জ্বরটর হয়নি তো?'

ভারতী অম্লান বদনে বলেছে, 'কি যে বল বাবা! শরীর খারাপ কেন হতে যাবে? কাল রাত্তিরে বড্ড রাত করে শোয়া হয়েছে তাই, একটা বই এত ভাল লেগে গেল!'

সব মিথ্যে, জাল!

একবারও বলতে পারেনি, 'কাল সারারাত কেঁদে কেঁদে আমার চোখটা অমন লাল হয়ে গেছে মা!' বলতে পারেনি, 'হ্যাঁ দাদা, সকাল থেকেই আমার হাত পা কাঁপছে! তোমাদের ছেড়ে চলে যাব ভাবছি আর আমি থর থর করছি!' বলতে পারেনি, 'হ্যাঁ বাবা, শরীর খারাপ। ক'দিন ধরে ভেবে ভেবে শরীর ভেঙে পড়ছে আমার!'

বলতে পারেনি।

ধরা পড়া চলবে না।

অথচ এই মায়াজাল বুনতে হতো না ভারতীকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠদিনে, যদি ভারতীকে তার বাবা অমিয় সেন সম্প্রদান করতে বসতেন! বাবার পরনে থাকতো গরদের জোড়, শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ করতেন বাবা, নিষ্ঠা আর আবেগের সঙ্গে!

ভারতীর মা আসন্ন বিচ্ছেদের করুণ সুরটি আবহসঙ্গীতের মত অন্তরালে রেখে, মহোৎসাহে জামাইবরণের আয়োজন করতে

লাগতেন !...হাস্যবদনে বলতেন, 'দেখ তো সবাই, আমার মেয়ে জামাইকে কেমন মানিয়েছে ?'

আর ভারতী ?

ভারতী সারাদিনের উপবাস-ক্লিষ্ট শুচি-স্নিগ্ধ দেহ মন নিয়ে, চেলি চন্দন ফুলের মালায় মণ্ডিত হয়ে, হোমাগ্নিকে সামনে রেখে আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে বসে শুনতে পেত 'যদে তদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম—'

কিন্তু কে উচ্চারণ করতো সেই পরম বাণী ?

সে কি বিকাশ ?

না, সে আর কেউ ? অন্য কেউ ? তাকে চেনে না ভারতী। সে কোনোদিন এসে বলেনি, 'নাঃ ! ভেবে দেখলাম তোমায় নইলে আমার অবস্থা অচল। বেঁচে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না।'

বিকাশের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে দেবার জন্যে ভারতীকে এত ছল চাতুরী খুঁজে বার করতে হচ্ছে ! বিকাশকে পাবার জন্যে ভারতীকে এত সব ছাড়তে হচ্ছে !

হয়তো সত্যিই অমিয় সেন আবার ক্ষমা করবেন ভারতীকে, হয়তো মাধবী সেন তাঁর হঠাৎ একদিন 'ব্যানার্জি' হয়ে যাওয়া মেয়েকেও বলবেন, 'কতদিন আসিস নি বাপু, মন কেমন করে মরি !'

হয়তো দাদা বলবে, 'যাই বলিস 'ভারী', তোর ফ্ল্যাটটা দেখে হিংসে না হয়ে যায় না ! স্রেফ্ ছবি বানিয়েছিস !'

তবু—

তবু চেলি চন্দন পরে বিয়ে তো হবে না কোনো দিন ভারতীর ! একসঙ্গে অনেকখানি সিঁন্দুর ঢালা হবে না সিঁথিতে !

'বিয়ে' শব্দটা তার জীবনের মধ্যে জেগে থাকবে একটা মেঘলা দুপুরের ভয়-ভয় লুকোচুরির স্মৃতি নিয়ে !

তবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে ভারতী। তাড়াতাড়ি

চুলটা বেঁধে নিয়ে হাত মুখ ধুতে যায়। আর সেই সময় মা সাড়া নেন।

হয় তো চৌবাচ্চার জলের শব্দেই তাঁর দুপুরের ঘুমটি হঠাৎ পাতলা হয়ে যায়, তবে ওঠেন না। ঘর থেকেই সাড়া করেন, 'ভারতী বুঝি চললি লাইব্রেরিতে?'

ভারতী কিছু একটা শব্দ করলো।

কিন্তু সেটা 'হ্যাঁ', না 'না'?

মাধবী সেন আপন মনে বললেন, 'কী যে বাতিক তোদের বাবা! কলেজ টলেজ মিটলো, আবার এখন নতুন ধুয়ো করে রোজ লাইব্রেরি ছোটা! বিয়ে থাওয়ার নাম নেই, খালি পড়া আর পড়া! পড়ে পড়ে মনটাও কাগজের মত শুকনো হয়ে যাচ্ছে।'

বললেন। বলে পাশ ফিরে শুলেন।

ভারতী মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাবল, মা কি সব জেনে ফেলেছেন?

মনটা যে শুকনো হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলেন সেটা?

আরো কিছু বলবেন এইবার?

ভারতীর সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়বে?

কিন্তু না।

মাধবী আর উঠলেন না।

ভারতী এবার তাড়াতাড়ি করে শাড়ি বদলে নিল। চেলি নয়, বালুচরী নয়, পুরনো পরা টাঙ্গাইল শাড়ি।...তারপর আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত একটু প্রসাধনের ছাপ বুলিয়ে নিল মুখে, আর ঠিক সেই সময় বুক থেকে গলায়, গলা থেকে চোখের কিনারায়, ঠেলে উঠে এল এক প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস।

উঠে এল।

হয়তো একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে বলেই আর ভিতরে থাকতে পারল না।

ঘড়ির দিকে তাকাতে ভুলে গেল ভারতী, আছড়ে পড়লো বিছানার ওপর। তার কুমারী জীবনের এই শেষ দিনে শেষবারের মত তার কুমারীকালের একক শয্যার ছোটমাপের মাথার বালিশটায় মুখ গুঁজে 'হু হু' করে কেঁদে উঠলো।

বাষ্পটা জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে…ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ভিতরটা।…সিঁদুর-চন্দন-হীন শূন্য-শূন্য বিয়েটার মধ্যে এখন যেন কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছে না ভারতী।

মনে হচ্ছে বিকাশ তাকে নির্বোধ পেয়ে ভয়ানক একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বুলা আর আকাশ

রাত অনেক !

বাড়িটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নিশুতি। হয়তো বাড়ির কেউ জেগে নেই। নিশ্চয় কেউ জেগে নেই। বাদে বুলা। বুলা নামের কি মানে বুলা জানে না। বুলার নামটা প্রথম কে রেখেছিল সে কথা কারুর মনে নেই। বুলা যে বুলা এইটাই মূল তথ্য।

স্কুলে কলেজে বুলার আর কোন নাম আছে কিনা কেউ জানতে চায় না। কি হবে জেনে? বুলাকে কি অন্য কোন নামে ডাকতে পারা যাবে? ডাকলে ভাল লাগবে?

ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে অনামী পাহাড়ের অনামী ঝরণার মত হাল্কা আর ঠিকরে ওঠা, ঝিকঝিকিয়ে ওঠা, ওই মেয়েটাকে বুলা ছাড়া আর কোন নামে ভাবাই চলে না। বুলা মানে সেই মেয়েটি, যে ইংরিজীতে এম-এ পাশ করে এখন বাংলায় এম-এ দিচ্ছে। বুলা মানে সেই মেয়েটি, যে গীটার বাজানোয় প্রাইজ পেয়ে এখন বেহালায় ছড় টানছে। বুলা মানে সেই মেয়েটি, যে খাতার পাতায় টুকরো টুকরো কথায় হীরে পান্না ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখছে, কবিতা লিখছে না। বুলা মানে সেই মেয়ে, যে অনেক বুদ্ধির মালিক হয়েও নেহাত বোকাদের মত প্রেমে পড়ে বসে আছে।

হ্যাঁ, একেবারে নেহাত বোকাদের মত। আর তাই সারা বাড়ি যখন নিষুতি হয়ে গেছে, তখন বুলা জেগে বসে আছে। জেগে উঠেছে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বারান্দা নয়, যেন একটা বাক্সর খোপ। দুজন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে কি না পারে। হয়তো পারে। যদি দুজনে গায়ে গা ঠেকাতে পারে, অন্ততঃ ঠেকলে শিউরে না উঠে সহজভাবে নিতে পারে।

এখন কেউ নেই।

এখন বুলা একা।

এখন নিচের রাস্তাতেও কেউ নেই। মানে কেউ জেগে নেই। রাস্তার ধারে ধারে এখানে সেখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে অনেক লোক। যাদের ঘর নেই, বারান্দা নেই, শুধু অপরের ঘরের সামনের রোয়াক আছে; শুধু লোকেদের বারান্দার তলা আছে।

বুলার ঘর আছে।

বুলার বারান্দা আছে। মানে এখনও আছে। আর থাকবে না। ঘণ্টা কয়েক পরে বুলার কি থাকবে বুলা জানে না।

হ্যাঁ, বুলা জানে। বুলা জানে, তারপর—আরও অনেক দিন পর চিরদিন আর চিরকাল বুলার ভালবাসাটি থাকবে। না, আরও থাকবে। সমস্ত পৃথিবীটা থাকবে বুলার।

এই বারান্দাটা দেখল বুলা।

দু'হাত মেলে সবটা মাপা যায়। দেখল ওর ধারে ধারে বুলার টবের বাগান। দু হাতের আঙুলে তার বৃক্ষসম্পদ গোনা যায়।

বুলা ঘরে ফিরে এল।

দেখল নিচু চৌকির সামান্য বিছানা। দেখল ছোট টেবিল আর নিচু চেয়ারটা। দেখল বইয়ের র‍্যাকটা। র‍্যাকের বইগুলো।

আর আলনাটাও দেখতে পাচ্ছে বৈকি বুলা। আলনায় বুলার শাড়ি ঝুলছে, একটা দুটো তিনটে ছটা, অনেকগুলো। ব্লাউসও আছে, গুনতে পাচ্ছে না ক'টা। আলনার পাশে হুকে বুলার ব্যাগ আর বটুয়া ঝুলছে কত যেন!

ওগুলো ঝুলবে।

শুধু একটা বাদে।

একটার বেশী ব্যাগ হাতে নেওয়া যায় না। নিয়ে কি দরকার?

আশ্চর্য! ভয়ঙ্কর দরকার বলেই না কবে কবে যেন ওগুলো কিনেছিল বুলা? অনেক শাড়ির অনেক রং, তাই অনেক রঙের ব্যাগ নাহলে কি করে চলতে পারে?

তখন ভেবেছিল বুলা, চলতে পারে না। এখন সেকথা ভেবে হাসি পেল বুলার।

আজকের রাতটা শেষ হলে ওই নিচু চৌকির বিছানাটায় বুলা বলে এই মেয়েটা শোবে। কিংবা শোবে না। শুধু বসবে আর উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াবে। যে বারান্দাটা শুধু দুহাত মেলে মাপা যায়।

ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল বুলা। দাঁড়াল। দেখল আরও একটা জিনিস করা যায় এখান থেকে। এই বারান্দা থেকে। অনেক বড় আকাশটাকে এখান থেকে দেখা যায়। এখান থেকে সেই আকাশটার সঙ্গে কথা বলা যায়।

বুলা জানে না কখন ওই আকাশটা নীলচে অন্ধকার থেকে গোলাপী হয়ে ওঠে, আর তারপর সোনালী হয়ে যায়। বুলা রোজ এ সময় ওই নিচু চৌকির সরু বিছানাটায় ঘুমোয়। যখন আকাশটা সাদা ঝকঝকে হয়ে যায়, তখন বুলা জাগে।

বুলা অনেক রাত অবধি পড়ে।

বুলা সকালের রোদ ঘরে এসে লুটিয়ে পড়লে ওঠে।

আজ বুলা দেখতে পাবে, কেমন করে ওই নীলচে অন্ধকারটা আস্তে আস্তে গোলাপী হয়ে যায়। আর গোলাপী থেকে সোনালী।

তারপর যখন সাদা ঝকঝকে হয়ে যাবে, তখন বুলা ঘর থেকে বেরোবে।

বুলার মা বলবেন, 'তোর কি ঘুম বুলা?' বলবেন, 'আমরা চা খেয়ে নিলাম।'

বুলা বলবে, 'ডাকলে না কেন?'

বুলার মা বলবেন, 'রাত অবধি জাগিস!'

বুলার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে যাবেন। বলবেন, 'তোর বাবার এখনও চা খাওয়া হয়নি। তোরা দুজনে খা।'

বুলা তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে যাবে।

রোজ এই একরকম, কালও এইরকম হবে, বুলা জানে।

বুলা জানে বাবার আর বুলার চা বুলা তৈরি করবে। রোজ করে। বুলা কোনও দিন অনেক ভোরে উঠলেও বুলার মা বলেন, 'তোর কি ঘুম, বুলা ?'

বুলা জানে না ওঁরা কখন ওঠেন। জানে না ওঁদের কী ঘুম। বুলার মার, আর বিধবা দিদির। বুলা কোনওদিন ওঁদের সকালের চা খাওয়া দেখতে পায় না। বুলা দেখে ওঁরা রান্নাঘরে চলে যাচ্ছেন। বুলা বাবার সঙ্গে চা খায়, বুলা বাবার চা তৈরি করে।

বুলার বাবা সকালবেলা অনেকক্ষণ ধরে উপাসনা করেন। আগে করতেন না, বুলার বড়জামাইবাবু মারা যাবার পর থেকে করেন।

বুলার দিদি বলেছে, 'বুলার তুমি বিয়ে দিও না মা !'

বুলার মা বলেছেন, 'বুলার বিয়ে আমি দেব না।'

বুলার বাবা বলেছেন,'বুলা যদি বিয়ে না করে থাকতে চায়, আমার আপত্তি নেই। বুলা প্রফেসারি করতে চায় তো করতে পারে।'

বুলার কাছে কেউ মত চায় নি। বলেনি, 'বুলা তোর দিদি বিধবা হয়েছে বলে বিয়েতে তোর আতঙ্ক হয়ে গেছে নাকি ?'

না বুলার আতঙ্ক হয়নি।

বুলা জানে, মানুষ বেঁচে থাকে, মরে যায়। ওটা দৈব। ওটা কিছু নয়। একজনের সঙ্গে আর একজনের বাঁচা আর মরার কোন যোগসূত্র নেই।

বুলার দিদির বর মরে গেছে।

দিদি কষ্ট পাবে, দিদির জন্যে অনেক কষ্ট জমানো আছে ভাগ্যের ঘরে, তাই দিদির বর মরে গেছে। বুলার জন্যে ভাগ্য কি জমিয়ে রেখেছে বুলা জানে না। বুলা মানে না, দিদির জন্যে আর বুলার জন্যে একই জিনিস রাখবে ভাগ্য। রেখেছে জমিয়ে। বুলার দিদির বর মারা গেছে। বুলার বর মারা যাবে না। তাই বুলা বিয়ে করবে।

পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।

কাল সকালে যখন বাবার আর বুলার চা খাওয়া হয়ে যাবে, তখন বুলা রান্নাঘরে গিয়ে বলবে, 'মা আমি আজ খাব না।'

বুলা জানে বুলার জন্যে তুলে রাখা মাছ আর বুলার জন্যে বাড়া ভাতটা পড়ে থাকলে, বুলা না খেলে, ভীষণ একটা যন্ত্রণা হবে বুলার মার। বুলা পালিয়ে গেল বলে, বুলা নিজে নিজে বিয়ে করবে ব'লে যতটা রাগ হবে বুলার মার, তার চেয়ে বেশী ওজনের যন্ত্রণা হবে মার বুলার মাছটা আর বুলার বাড়া ভাতটা পড়ে থাকলে।

তাই বুলা রান্নাঘরে গিয়ে বললে, 'মা, আমি আজ খাব না।'

বুলার মা চমকে উঠে বলবেন, 'কেন, কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

বুলার দিদি বলবে, 'বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন আছে বুঝি?'

কাল রবিবার, তাই ওকথা বলবে বুলার দিদি। রবিবারে বুলার বন্ধুরা মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে।

হ্যাঁ, সহপাঠিনীদেরই বন্ধু বলে বুলারা।

বুলা মিথ্যা কথা বলবে। বুলাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। নইলে বুলার ভাগের ভাত আর মাছ নিয়ে অনেক—অনেকক্ষণ বসে থাকবেন বুলার মা।

মা বলবেন, 'জন্মদিন? কার?'

বুলা বলবে, 'একটা মেয়ের।'

মনে মনে বলবে বুলা, মার সঙ্গে আমি মিছে কথা বলছি। কিন্তু পৃথিবীতে কোন একটা মেয়েরও কি আজ জন্মদিন নয়? বুলাকে কি খুব বেশী মিথ্যা কথা বলতে হবে?

তারপর বুলা চলে আসবে।

বাবার ঘরে ঢুকবে।

বাবার ঘরটা গুছিয়ে দেবে। বাবার খাবার জলের কুঁজোয় জল আছে কি না দেখবে, দেখবে বাবার সমস্ত জামায় বোতাম আছে কি

না। এই সবকিছুই দেখবে বুলা। মার জন্যে ভাবে না বুলা। বুলার দিদি আছে। মার জন্যে বুলার দিদি আছে।

বাবার ঘর থেকে বুলা নিজের ঘরে চলে আসবে। পড়ার বইগুলোয় হাত বুলোবে। না, বইগুলো নিয়ে যাবে না বুলা। এ বাড়ি থেকে কোন জিনিসই নিয়ে যাবে না। শুধু বুলাকে নিয়ে যাবে।

এবাড়ি থেকে বুলাকে নিয়ে যাওয়া মানে-ই তো অনেকখানি নিয়ে যাওয়া! রং নিয়ে যাওয়া, সুর নিয়ে যাওয়া, ছন্দ নিয়ে যাওয়া!

বুলার দিদির শাড়ি সাদা, বুলার দিদির গলায় সুর নেই। বুলার মার শাড়ি সাদা, বুলার মার জীবনে বুলা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই ছন্দ নেই। বুলার বাবার কাপড় সাদা, কিন্তু তার আড়ালে উদাসীর গেরুয়া রং আছে। বুলা আছে তাই ধরা পড়ে না। বুলা সব কিছু উজ্জ্বল করে রাখে। বুলা সবটা আবরিত করে রাখে।

বুলা চলে গেলেই সব খুলে পড়বে, ছিঁড়ে পড়বে, ঝুলে পড়বে। বুলার বাবা সারা সকাল শুধু উপাসনা করবেন, চা খেতে আসবেন না। বুলার মা শুধু রান্নাঘরে চলে যাবেন, কাউকে বলবেন না, 'তোর কী ঘুম!'

তবু বুলাকে এবাড়ি থেকে 'বুলা' বলে একটা মস্তবড় ভালবাসার ধনকে নিয়ে চলে যেতে হবে। চুরি করে নিয়ে যেতে হবে।

বুলা যদি মিনতি করে চায়, কেউ দেবে না। আঁকড়ে ধরে থাকবে। বুলা যার জন্যে, যাকে দেবার জন্যে, নিয়ে যেতে চাইছে, তাকে গাল দেবে, নিন্দে করবে।

বলবে, ছি ছি!

বুলা জানে বুলার মা বলবেন, 'ছি ছি বুলা, এই তোর বুদ্ধি!'

বুলার দিদি বলবে, 'ছি ছি বুলা, এই তোর পছন্দ!'

আর বুলার বাবা বলবেন, 'ছি ছি বুলা! তোমার ওপর যে অনেক আশা ছিল!'

বুলা যার জন্যে নিজেকে ওঁদের কাছ থেকে চাইবে, সে যে গরীব, সে যে ময়লা রোগা, আর সে যে লেখাপড়া শেখেনি, শুধু অদ্ভুত বেহালা বাজানো শিখেছে, এই সব গুলোই তার বিচ্ছিরি রকমের দোষ বলে গণ্য হবে।

বুলা জানে এগুলো তার দোষ নয়, শুধু অভাব। এত অভাব-গ্রস্ত বলেই তো সে নিজে এসে বুলাকে চাইতে পারবে না। বুলাকেই চাইতে হবে তার জন্যে।

বুলা চাইবে ভেবেছিল।

চাইতে পারেনি।

বুলার চাওয়ার প্রতিবাদে ওরা কে কি বলবে, সবই নিজে নিজেই বুঝে ফেলেছিল বুলা।

তাই বুলা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে।

'বন্ধুর জন্মদিনে নেমন্তন্নে যাচ্ছি' বলে এমনি সহজভাবে সাধারণ-ভাবে শুধু একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাবে। তারপর পালিয়ে যাবে। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।

বিয়ে করে আরো অনেকদূরে পালিয়ে যাবে বুলা। বুলার সেই এখনও বিয়ে-না-হওয়া বর বলেছে, যে কটা টাকা আছে তার, তাই নিয়ে দার্জিলিং যাবে। যে কদিন না টাকা একেবারে ফুরিয়ে যায় থাকবে। তারপর—

তারপরের কথা ভাবে না বুলা।

ভাবতে পারে না।

ভাবতে ইচ্ছে হয় না।

শুধু ভাবে দার্জিলিং পাহাড়ে উঠে গিয়েই এখানে চিঠি লিখবে বুলা। লিখবে, 'দিদি, আমরা পাহাড়ে চলে এসেছি। দিদি, চলে না এলে থাকতে পারতাম না, তাই চলে এসেছি। মা আর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস দিদি, আমরা কি যাবো? ওঁদের প্রণাম করতে, ওঁদের আশীর্বাদ নিতে?'

দিদিকে ঠিকানা জানাবে বুলা।
আর রোজ পিয়ন-আসা দেখবে।

কিন্তু বুলা জানে যে চিঠির উত্তর কোনদিনই আসবে না। বুলাকে প্রণাম করতে যেতে, বুলাকে আশীর্বাদ নিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া সেই চিঠি।

বুলার ধৃষ্টতা কেউ সহ্য করবে না।

বুলাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসলেও না।

তবু বুলাকে পালিয়ে যেতে হবে। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে। কারণ বুলার ভালবাসাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না, বুলার ভালবাসার পাত্রকে কেউ 'সুপাত্র' বলে ভাবতে পারবে না।

বুলাকে পালিয়ে যেতে দিতে সে চায় নি। বেহালা-বাজানো সেই ছেলেটা। বুলার সুখ, বুলার যন্ত্রণা, বুলার আনন্দ, বুলার দুঃখ, সেই ছেলেটা। কিন্তু বুলা বলেছিল, 'নইলে আমি কি করে বাঁচবো?' বলেছিল 'আমি সুখ চাই। আর আমায় যদি ওরা ভালবাসে তো ওরা আমার সুখই চাইবে।'

কিন্তু ওরা তা চায় না।

বুলা বলেছিল, 'তোমার জন্যে আমি আমার চিরদিনের ঘরখানি ত্যাগ করছি না, আমার ভালবাসার জন্যে ত্যাগ করছি।'

আর এ কথাও বলেছিল বুলা, 'ত্যাগের মধ্য দিয়েই তো ভালবাসার পরীক্ষা। ওরা যদি আমাকে সত্যি ভালবাসে, ভয়ঙ্কর ভালবাসে, প্রাণ-কেটে-ফেলা বুক-উপড়ে-ফেলা যে ভালবাসা তাই বাসে, তাহলে ওরাও ত্যাগ করবে। ত্যাগ করবে ওদের রাগ বিরক্তি পছন্দ অপছন্দ, ইচ্ছে সংস্কার! সব ত্যাগ করে বলবে, 'বুলা তোর অভাবে আমাদের সংসারের রং গেছে, রূপ গেছে, ছন্দ গেছে।'

কিন্তু বুলা জানে, তা ওরা বলবে না।

'সর্বস্ব যাওয়ার' রিক্ততা নিয়েও ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে ওরা, জেদ করে তেজ করে।

ওরা যদি সব কিছুও ত্যাগ করতে পারে ওদের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারবে না।

পারবে না বলেই তো বুলা আজ রাতে আর ঘুমোতে পারছে না। এই বাড়ি, এই বারান্দা, ওই ঘর, ওই নিচু চৌকিতে বিছানা, ওই বইয়ের র‍্যাক আর র‍্যাকের বই, সব দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

দেখছে।

দেখে নিচ্ছে।

মনে মনে ভেবে নিচ্ছে—'বুলা' বলে যে একটা ঝিরিঝিরি ঝরণার মত মেয়ে এখানে ঘুরে বেড়ায়, সে আর না ঘুরলে, কেমন দেখাবে এখানটা?

ওরা যদি বুলাকে নিয়ে নিজেদের মনের মত বিয়ে দিত?

যেমন একদিন দিয়েছিল বুলার দিদিকে? তাহলেও তো চলে যেতে হত বুলাকে! বুলা ভেবেছিল।

তারপর ভেবেছিল বুলা, সেই যাওয়ার মধ্যে ফেরার ইসারা থাকে, তাই সেই বিচ্ছেদের বেদনায় মাধুর্য আছে।

বুলা চলে গেলে মাধুর্যের লাবণ্য বিছিয়ে রেখে যাবে না। রেখে যাবে তিক্ততা আর তীব্রতা।

বুলাদের আত্মীয়েরা, আর বন্ধুরা, আর পড়শীরা কানাকানি করবে, চুপিচুপি বলাবলি করবে, বুলুর মাকে আর বাবাকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করবে না—'বুলু কোথায় গেল?'

তারপর দিদি তাদের ডেকে ডেকে ফিসফিস করে জানিয়ে দেবে, বুলু কোথায় গেল!

তারা সবাই বলবে, 'ছি ছি!'

কিন্তু এখনও তারা কিছু জানে না।

এখনও বুলুর মা কি বাবা কি দিদিও কিছু জানেন না।

যখন বুলু চলে যাবে তখনও কিছু জানতে পারবে না ওরা। শুধু ভাববে, 'বুলু বন্ধুর জন্মদিনে নেমন্তন্নে গেল।'

যখন বুলু দমদমে চলে যাবে, ছেলেটার কাছে পৌঁছে যাবে, ময়লা আর রোগা চেহারা নিয়ে একরাশ আলোর মতন যে দাঁড়িয়ে থাকবে এরোড্রোমে তাকে গিয়ে বলবে—'আমি এলাম।' তখনও এরা কিছু জানতে পারবে না। শুধু বলাবলি করবে,—'খুব ঘটার নেমন্তন্ন খাচ্ছে বুলু বন্ধুর জন্মদিনে।'

তারপর বুলু যখন আকাশে উঠে যাবে, উড়ে উড়ে চলে যাবে অনেক পাহাড় অনেক নদী, অনেক ক্ষেত খামার পার হয়ে, তখন ওরা আস্তে আস্তে বলবে, 'তাইতো, বুলু কেন এখনও এল না!'

বলবে, 'বুলুর বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানাটা তো জেনে নেওয়া হয় নি!'

তারপর? তারপরের কথা বুলু ভাবতে পারে না।

আর একটু পরেই ওই সব শুরু হবে।

এখন আকাশ নীলচে অন্ধকার।

আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাবে, রং বদলে যাবে, গোলাপী হবে, সোনালী হয়ে যাবে, ক্রমশ ঝকঝকে সাদা হয়ে উঠবে।

আকাশের রং বদলায়।

মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়।

আকাশের তাতে লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। আকাশ জানে সূর্য তার কাছে যখন যে আলো নিয়ে ধরা দেবে, সেই আলোই তার কাছে সত্য। আকাশের চরিত্রে নিত্যকালের সত্য বলে কিছু নেই। ক্ষণিক মুহূর্তগুলি দিয়েই তার 'নিত্যকাল'। ক্ষণিকের সত্যগুলিই তার নিত্যকালের সত্য।

কিন্তু—

বুলা জানে মানুষ আকাশ নয়।

মানুষের আকাশ হবার সাধ করলে চলে না। মানুষের সত্যকে একেবারে পাকা রঙে এঁকে নিতে হয়।

বুলা যদি ওর বাবার ঘরটি গোছাতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে ভাবে, 'কি হয় যদি না পালাই?'

যদি বাবার জামার বোতাম বসাতে বসাতে চোখের জলের পর্দার আড়াল থেকে ছুঁচের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না বলে হঠাৎ ছুঁচটা রেখে দিয়ে ভাবে, 'আমি পালাব না', তাহলে বুলার লজ্জা করবে। তাহলে বুলার নিজেকেই নিজে বলতে হবে, 'ছি ছি বুলা, ছি ছি তোমাকে।'

নিজেকে 'ছি ছি' বলতে পারবে না বুলা।

আকাশের মতন রং বদলে গেলেও না।

তাই বুলাকে যেতেই হবে।

ছদ্মবেশী

কোনও একটা স্টেশনের কাছাকাছি এলেই বাড়তি এক কাজ, রেলগাড়ীর জানালা বন্ধ করতে হবে। বারে বারে এই একই ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে কুঙ্কুম। অথচ জানালার ধারে বসাও চাই। আর গাড়ী চলতে শুরু করলেই দেখাও চাই উন্মুক্ত পৃথিবীকে।

যাই ভাগ্যিস দু' বার্থের কামরা, তাই অন্য যাত্রীর চোখ নেই কুঙ্কুমের ওপর। দেড়দিন ধরে নিশ্চিন্ত নিষ্কণ্টকেই চল্‌ছে তার, কিন্তু অনবরত জ্বালাতন করছে কুণালকে ওই জানালা জানালা করে।

'নাঃ তোমায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখছি ঝকমারিই করেছি—' বলল কুণাল জানালাটা উঠিয়ে দিয়ে। বসে পড়ে ফের বলল, 'তুমি এমন করবে তা ঠিক্ আগে বুঝতে পারিনি।'

'বাঃ! কেমন আবার'—কুঙ্কুম অপ্রতিভের ফিকে হাসি হেসে বলে, 'জানালাটা দু একবার বন্ধ করতে তোমার কষ্টটাই বা কী?'

'আমার কষ্ট কিছু নয়! তোমার কষ্টটা দেখাই কষ্টকর হচ্ছে আমার পক্ষে।'

কুঙ্কুম কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'এতদিনের মধ্যে এদিকে তো আসিনি, কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।'

কুণাল গম্ভীর ভাবে বলে, 'কে তোমাকে মনে রেখেছে? কে হৃদয়পটে খোদাই করে রেখেছে তোমার মুখ? তাই ট্রেনের জানালায় চকিতে একবার দেখলেই চিনে ফেলবে তোমাকে! সংসার তোমায় ভুলে গেছে বুঝলে?'

'বেশ, গেছে তো গেছে।' কুঙ্কুম আবদারের ভঙ্গীতে বলে, 'আমার ইচ্ছে আমি একশোবার জানালা খুলব আর বন্ধ করবো।'

'তবে করো।' বলে হেসে ফেলে কুণাল।

কুঙ্কুম যথারীতি চলন্ত গাড়ীর জানালায় মুখ রেখে চলন্ত প্রকৃতিকে দেখতে থাকে।

গাড়ীতে যে আর একজন আছে, মাঝে মাঝে যেন সে কথা ভুলে যাচ্ছে কুঙ্কুম।

ওকে বেড়াতে বার করে দেখছি ভুলই করেছি, কুণাল ভাবল মনে মনে। ভাবল, একটু যেন বাড়াবাড়ি করছে কুঙ্কুম। আবার ভাবল, হয়তো এইটাই স্বাভাবিক। এই লজ্জার আতঙ্ক।

তবু, কোনও স্টেশন এলে যে একটু নামতে পাচ্ছে না, এটা ভাল লাগছে না কুণালের!

অথচ তেমন জোর করে বলতেও পারছে না কিছু।

বলা কি যায়? জোর করা কি যায়, বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে? না, তা' যায় না।

বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা যায়, আদর সোহাগ করা যায়, ধমক দেওয়া যায় না। ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর জোর খাটানো যায় না।

গাড়ীর রিজার্ভেসন শ্লিপে লেখা আছে—মিস্টার এণ্ড মিসেস। কুণালের কর্মস্থল ডুয়ার্সের চা বাগানের লোকেরা সকলেই জানে মিসেস, কিন্তু কুণাল তো জানে তাদের সেই জানাটা কত ভুল।

যে মহিলাটি কুণাল সেনের সঙ্গে শুধু দু' বার্থের গাড়ীতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি যে কুঙ্কুম সেন নয়, কুঙ্কুম ব্যানার্জি এমন কথা ওরা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু সেই অদ্ভুত বিশৃঙ্খলাটা ধরা পড়বে, আয়োজনের এমন ত্রুটি নেই।

ধরা পড়ে নি। পড়বেও না হয়তো তবু ধরা পড়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত চোরের মত গাড়ীর জানালাটা নিয়ে কি ছেলেমানুষিই করছে কুঙ্কুম।

সেই অনেকদিন আগে যেদিন কুণাল সেন আর কুঙ্কুম ব্যানার্জির জীবন সহসা এক খাতে মিশে গেল, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনটা তখনও পাশ হয় নি।

তখনও ওই আইন পাশ নিয়ে আন্দোলন চলছে।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত হলেই কি তার সুযোগ নিয়ে

বসতো কুঙ্কুম ? নালিশ রুজু করতো আদালতে ? স্বামীকে ছেড়ে আর এক পুরুষের দুর্বার আকর্ষণে সে ভেসে যেতে বসেছে, শুধু এই কারণটুকু দাখিল করলেই কি আদালত তাকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি দিত ?

না, আদালত অত সদাব্রত খুলে বসেনি !

আইন অত হাতের জিনিস নয়।

অনেক জল ঘোলা করে, অনেক কলঙ্ক গায়ে মেখে, নয়তো অনেক কাদা অপর পক্ষের গায়ে মাখিয়ে, তবে তো প্রমাণ করতে হবে বিবাহ-বন্ধনটা তাদের কাছে এখন নিতান্ত বন্ধন !

'তার চাইতে পালানো ভাল !'

বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন পাশ হবার আগে তার ধারা-উপধারাগুলি তখন বিস্তারিত ক'রে কাগজে বেরোচ্ছিল। আর পড়ে কুঙ্কুম ভেবেছিল তার থেকে পালানো ভাল।

সেই ভালটাই বেছে নিয়েছিল কুঙ্কুম। আইনের অপেক্ষায় দিন গোনেনি।

নিতান্তই সেই আদিঅন্তকালের পচা পদ্ধতিটা অবলম্বন করেছিল। স্রেফ পালিয়েছিল।

শুধু সেই পালানোটা হয়েছিল অদ্ভুত রকমের অসমসাহসিক। একটা বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে উৎসবের অসতর্কতার মাঝখান থেকে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটা হয়তো কিছু অদ্ভুত কঠিন নয়, অদ্ভুত হচ্ছে পারকল্পনাটা।

অথবা পরিকল্পিতও ছিল না সেটা !

ভয়ঙ্কর একটা দৈব সেই মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলেছিল দুটো মানুষকে।

নিরালাটা অবশ্য দৈব ছিল না।

সেটা কুঙ্কুমের সৃষ্টি করা। উৎসব-কক্ষের কলকোলাহল থেকে সরে এসে পিছন দিকের ছায়া-ছায়া অন্ধকার বারান্দাটায় দাঁড়াবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অন্তত ছিল না।

তবু কুণালের চোখে ধরা পড়তে দেরি হয় নি কুঙ্কুমের ঐ সকলের মাঝখান থেকে পিছনে সরে গিয়ে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা।

ধরা পড়তে দেরি হবার কথাও নয়। কুণালের চশমাপরা চোখজোড়া তো শুধু কুঙ্কুমকেই অনুসরণ করে ফিরছিল।

'এত পরীর মত সাজবার কি দরকার?'

বলেছিল কুণাল।

কুঙ্কুম আরক্ত হয়ে বলেছিল, 'বাঃ! বিয়েবাড়িতে সাজব না?'

'না সেজেও তো একাই বিয়েবাড়িটা আলো করে রাখার ক্ষমতা আছে।'

বড্ড যেন কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল কুণাল। ওর গায়ে ফেলা জরিপাড়ের উড়ুনিটা কুঙ্কুমের গায়ে লাগছিল। মৃদু একটা পুষ্পসারের সৌরভ কি এক উতলা শিহরণ এনে দিচ্ছিল খোলা বারান্দার উড়ো-উড়ো বাতাসে। কুঙ্কুম বুঝতে পারছিল না এই সেন্টের গন্ধটা কুণালের উড়ুনির, না তা'র নিজেরই বেশবাসের।

কোন্ কথার কোন্ পরিণাম বোধকরি সে খেয়াল হারিয়ে ফেলেছিল কুঙ্কুম। তাই বলে বসেছিল, 'হুঁঃ বিয়েবাড়ি! কোন কিছু আলো করবার ক্ষমতা থাকলে কি আর—'

তা' একা কুঙ্কুমই খেয়াল হারায় নি।

কুণালও জ্ঞানবুদ্ধি সব কিছুই হারিয়ে বসেছিল। নইলে ওই কথাটুকুতেই কেন অমন করে চেপে ধরেছিল বন্ধুর স্ত্রীর হাত। যে হাতখানা নিতান্ত আলগাভাবে বারান্দার রেলিঙের ওপর রাখা ছিল।

'থামলে চলবে না। কথা শেষ কর।'

কিরকম যেন একটা ভয়াবহ শুনিয়েছিল কুণালের স্বরটা। কুঙ্কুম ভয় পেয়েছিল। তবু নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেনি। শুধু বলেছিল 'সব কথা কি শেষ করা যায়?'

'তবে শেষটা বলবার স্বাধীনতা শ্রোতাকে দাও।' বলেছিল কুণাল। তারপর বলেছিল আরও অনেক কথা।

আর বলেছিল, আজ রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতা ছাড়বে সে। রাত দশটার গাড়ী। তখন ডুয়ার্সের এই কাজটা ছিল না কুণালের, তখন সে রেওয়া স্টেটের ম্যানেজারী করতো।

'তাহলে আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র সময়। তারপর কোথায় তুমি আর কোথায় আমি!' বলেছিল কুঙ্কুম। আর ঠিক সেই সময় বলে বসেছিল কুণাল সেই ভয়ঙ্কর কথাটা, যা তার স্বপ্নের ত্রিসীমানাতেও ।ছল না।

'ইচ্ছে করলে একই জায়গায় পৌঁছতে পারি তুমি আর আমি।'

'কি বললে?'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। যেন কে ছুরি মেরেছে কুঙ্কুমকে। যে কুঙ্কুম এই ক'দিন আগেও ভেবেছিল, তার চাইতে পালানো ভাল। হয়তো সেটা নিশ্চিত নিজের কথা বলে ভাবেনি, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ভেবেছিল সকলের হয়ে। অত কেলেঙ্কারীর চেয়ে পালানো ভাল।

কুণাল নির্বিকারের মত দাঁড়িয়েছিল।

হাতঘড়িটা অন্ধকারেও চোখের কাছাকাছি তুলেছিল। তারপর বলেছিল, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। জীবনের পথ নির্ধারণ করে ফেলতে এ সময়টুকু খুব কম বলে মনে হচ্ছে তোমার, তাই না? আমি কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ডেই ঠিক করে ফেলতে পারতাম।

'কী বলছ কুণাল!'

হতাশ গলায় বলেছিল কুঙ্কুম।

আর কুণাল তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, 'আচ্ছা বিদায়! আমার কথাগুলো পাগলের পাগলামী ভেবে ক্ষমা করতে চেষ্টা কোরো। হয়তো জীবনে আর নাও দেখা হতে পারে। শুভরাত্রি!'

'কুণাল!' এবার হাত চেপে ধরেছিল কুঙ্কুমই কুণালের।

না, তার পরের কথা স্পষ্ট করে মনে পড়ে না কুঙ্কুমের। মনে পড়ে না সে কী বলেছিল, আর কী বা বলেছিল কুণাল।

শুধু যখন পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে চেতনা এসেছিল, তখন দেখেছিল অন্ধকারের পটভূমিকায় একখানা ট্রেন চলেছে, তাতে দুটি আরোহী। আরোহী দু'জন যেন কুঙ্কুমের চেনাচেনা।

নাকি একেবারে অচেনা?

তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করেছিল কুঙ্কুম—তারপর সেই বিয়েবাড়িটার চেহারা কিরকম হয়ে উঠেছিল!

নিশ্চয় প্রথম খোঁজ পড়ল খেতে বসার সময়। তা' সেটা বোধহয় গোলেমালে কেটে গেল। হয়তো কেউ বলল ফার্স্ট ব্যাচে খেয়ে গেছে কুঙ্কুম, হয়তো কেউ বলল নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছে সে।

কুঙ্কুম জানে এ রকম হয়।

এ রকম সবজান্তা লোক কিছু কিছু থাকে সংসারে। কাজেই নিশ্চয় সে ঝোঁকটা কাটল।

তারপর এল মোক্ষম ঝোঁক।

বাড়ি ফিরবার সময় শাশুড়ী ননদ জায়েরা অতবড় তিনতলা বাড়িটা তচনচ করে বেড়ালো কুঙ্কুমকে খুঁজতে। তারপর ননদ রাগ করে বলল, 'নিশ্চয় ছোড়দা আগে নিয়ে গেছে বৌকে, বৌয়ের গরম লাগছে বলে। দেখছ না ছোড়দা নেই।'

অম্লান যে কখনোই কোন উৎসব বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, আগে পালায়, সে কথা আর কারুর মনে থাকল না।

সারা বাড়ি অম্লানের স্ত্রৈণতার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠল।

শাশুড়ী ননদ আর জায়েরা ভাসুরেরা চলে এল বিয়েবাড়ি থেকে। আর তখনই নাটক শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছল।

চাকর বলল—'ছোট বৌদি তো আসেন নি। ছোটদা'বাবু অনেকক্ষণ এসে শুয়ে পড়েছে।'

নিশ্চয় তখন সেই রাত্রে এবাড়ির ওবাড়ির, যত সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য আত্মীয় আর বন্ধুদের বাড়ির বাতাস তোলপাড় হয়ে উঠেছিল টেলিফোনের মারফত মুহুর্মুহু প্রশ্নে। নিশ্চয় তারপর অম্লান গাড়ী বার করে তোলপাড় করে বেড়িয়েছিল কলকাতার রাস্তা—কার সঙ্গে কোন্ সময় চলে গেল কুঙ্কুম তার সন্ধানে।

নিশ্চয় তারপর বাড়ি এসে বলেছিল, 'আর খোঁজবার দরকার নেই।'

কুণালকে কেউ সন্দেহ করবে কেন?

উৎসববাড়ির সবাই তো জানতো, কুণাল সেই রাত্রেই দশটার গাড়ীতে কলকাতা ছাড়বে। আগে আগে খেয়ে নিয়েছিল কুণাল ট্রেন ফেল হবার ভয়ে।

সওয়া নটা পর্যন্ত কুণালকে সবাই বাইরের আসরে দেখেছিল, আর কুঙ্কুমকে দেখেছিল বাসরের উল্লাসের মধ্যে।

'আর খোঁজবার দরকার নেই'—এ কথাই তাহলে বলেছিল অম্লান? কিন্তু কেন? অজানিত একটা দুর্ঘটনার ভয়ে কাতর হয়ে অস্থিরতা না করে ওই অমোঘ নিষ্ঠুর বাণীটা উচ্চারণ করেছিল কেন?

কুঙ্কুম জানে না, কি করেছিল অম্লান, আর কি না করেছিল, তবু নিজে নিজেই ঠিক করে নিয়েছিল, পাথরের মত মুখ করে বলেছিল অম্লান, 'আর খোঁজবার দরকার নেই।'

ভেবেছিল ওই কথা বলবে অম্লান। আর অম্লানের সেই নিষ্ঠুরতায় নিজেকে কঠিন করে নিয়েছিল সে। ওদের বাড়ির ছোটবৌটা হারিয়ে যাবার পর ওরা সকলে কি বলেছিল, কি করেছিল, তা আর মনে আনেনি। মন থেকে মুছে ফেলেছিল কে তারপর ওদের সকাল বেলাকার চা তৈরি করছে, কে ওদের বাড়ির বড় ভাশুরের জন্যে দিন চল্লিশটা করে পান সাজছে।

রেওয়া স্টেটের সকলে জেনেছিল ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে এনেছে কুণাল। বউ দেখে সবাই কুণালের সৌভাগ্যের প্রশংসা করেছিল। রত্নালঙ্কার ভূষিতা, জরির শাড়ী পরিহিতা কুঙ্কুম নব-বিবাহিতার মতই কম্পমান লজ্জা নিয়ে শুধু চুপ করে থেকেছিল।

সেখানের দিনগুলো যেন ঝাপসা-ঝাপসা।

সেখানের কুঙ্কুম যেন আড়ষ্ট।

তারপর চেষ্টা-চরিত্র করে চা বাগানের এই কাজটা জুটিয়ে ফেলেছিল কুণাল।

আর সেখানে কুঙ্কুম যেন একেবারে নতুন মূর্তিতে ঝলসে উঠেছিল। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল কুঙ্কুম, ভুলে গিয়েছিল তার কোন অতীত ছিল।

কুঙ্কুম আর কুণাল, ওরা দু'জন যেন ওদের দু'জনের জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে। আর ওরা যেন জানতে এসেছে, পৃথিবীতে কত গান আছে, কত সুর আছে, কত আলো আর কত বাতাস আছে।

এমনি করেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর।

কী খেয়াল হ'ল এবার ছুটি নিয়ে দিল্লী, আগ্রা, হরিদ্বার, বৃন্দাবন বেড়াতে এল কুণাল কুঙ্কুমকে নিয়ে।

কিন্তু কে জানতো, আগ্রায় অম্লানের ভাগ্নে থাকে আর দিল্লীতে ভাইঝি থাকে। আর কেই বা জানতো, সেই আতঙ্কে সমস্ত লাইনটাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে কুঙ্কুম।

'আর তোমাকে নিয়ে লোকালয়ে বেড়াতে বেরোব না'—বলল কুণাল। 'এতগুলো বছর কেটে গেল, তবু এত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছ কি জন্যে এ এক রহস্য। পৃথিবীতে সর্বত্রই তো কোথাও না কোথাও অম্লানের আত্মীয়বর্গ থাকতে পারে।'

কুঙ্কুম বলল, 'বেশ, আমি নয় বোকামিই করছি। কিন্তু তুমি? ধর, তোমার সঙ্গে ওদের কারুর দেখা হল! কি করবে?'

'কি আবার করব!' কুণাল বলে, 'কারুর সঙ্গে কেন, যদি

অম্লানের সঙ্গেই দেখা হয়, প্রথমেই বলব, 'কথা বলবে, না পুলিশ ডাকবে ?' তারপর তার উত্তরের উপর নির্ভর। আমার সবটাই হচ্ছে ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে। তোমার মত বিপদের ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে হয়ে মনের বিপদ ডেকে আনি না।'

'বেশ, তা'হলে সব জানালা খোলা থাক!' রায় দেবার ভঙ্গীতে বলে ওঠে কুঙ্কুম। 'সব স্টেশনে স্টেশনে প্লাটফর্মে নামবো আমরা।'

'এত হৃদয়বল হবে ?'

'দেখ! নামবো, পকৌড়ি চানাচুর কিনে খাবো, পুতুল কিনবো, কিনবো গালার খেলনা, মাটির ফুলদানী, কাঁচের চুড়ি।'

'সাধু সংকল্প!' বলে হাসল কুণাল।

কিন্তু সহসা এত বেশী পরিবর্তিত হওয়াও বিস্ময়কর বৈ কি! জানালা খুলে বসে থাকছে কুঙ্কুম, প্লাটফর্মে নামছে। প্রত্যেকটা মানুষের মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাচ্ছে, বেশী কথা কইছে, বেশী চেঁচাচ্ছে।

যেন সহসা নিজেকে ঘোষণা করবার সংকল্প নিল সে।

কুণাল বলে, 'ভারী যে সাহস!'

কুঙ্কুম হাসে, 'না সত্যি—অকারণ তোমাকে জ্বালাতন করেছি। বোঝা উচিত ছিল পৃথিবী অনেক বড়। সে পৃথিবীতে অনেক লোক। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে নেই।'

'যাক্, এতক্ষণে বুঝলে!'

তারপর ওরা চা খেল, খাবার খেল, আবার গাড়ী চড়ল, গন্তব্যস্থলে নামল। সেখানে কালীবাড়িতে উঠল।

কুণাল মত চেয়েছিল কুঙ্কুমের। কুঙ্কুম বলল, 'ঠিক আছে।'

ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

এই মন্ত্রই জপ করবে এখন কুঙ্কুম।

দিল্লীতে—উঠল কালীবাড়িতে।

অনেক জায়গা, তবু অনেক ভিড়। পাশের ঘরের একটি বৌয়ের

সঙ্গে আলাপ হল কুঙ্কুমের, বেশ শান্ত নম্র হাসিমুখ। বছর তিনেকের একটি ছেলে সঙ্গে আছে। স্বামী অফিসের কি এক জটিল কাজ নিয়ে এসেছেন, সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটান।

'ছেলেটি বড় সুন্দর মিষ্টি'—বলল কুঙ্কুম, 'আর তেমনি শান্ত।'

'দেখে যতটা ভাবছেন, ততটা না।'

ছেলের মা হাসে।

'নাম কি? নাম কি তোমার বাবু?' বলে কুঙ্কুম! সাধারণ সহজ একটা কথার কথা হিসেবে। ছেলেটি সপ্রতিভ, চড়া গলায় বলে উঠল, 'সব্বাইয়ের খালি ওই কথা। নাম নাম! কই বাপী তো বলে না, মা তো বলে না?'

ছেলের মা অপ্রতিভের একশেষ।

বলে, 'ছি ছি বাবু, তুমি এমন অসভ্য! উনি নাম জানতে চাইলেন, আর তুমি এই করলে? আমরা তোমার নাম জিগ্যেস করবো কেন? আমরা তো জানি। উনি কি জানেন? বল। বলে ফেলো।'

'আমার নাম অজাতশত্তুর ব্যানার্জি। হল? বিচ্ছিরি নাম!'

অজাতশত্তুর!

হেসে ওঠে কুঙ্কুম, 'সত্যি তো বাপু, যে নাম ছেলে বলতেই পারে না, তেমন নাম কেন? কিন্তু অজাতশত্রু, তোমার নামটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কে রেখেছে নাম?'

'বাপী; আবার কে!' অজাতশত্রু বিরক্তভাবে বলে, 'বাপীই তো আমার সব কাজ করে দেন।'

'বাঃ, ভারী সুন্দর বাপী তো তোমার!' নবপরিচিতার চোখে চোখ রেখে রহস্যের হাসি হাসে কুঙ্কুম, 'শুধু ছেলেরই সব কাজ করে দেন, না কর্মক্ষেত্র আরও সুদূরপ্রসারী?'

'বাজে কথা শোনেন কেন!'

'ছোটরাই সব থেকে খাঁটি কথা বলে। অজাতশত্রু, তোমার বাপীর নাম কি?'

এও তো একটি সাধারণ কথা।

ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমাতে এই তো ভাষা! কিন্তু উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিটকে উঠল কুঙ্কুম, উঠল আর্তনাদ করে।

'কী? কী বললে?'

'শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ কেন?' অজাতশত্রু ভুরু কুঁচকে বলে. 'কতবার নাম বলব? বলছি তো বাপীর নাম অম্লানকুসুম ব্যানার্জি।'

কুঙ্কুমের ভাববৈলক্ষণ্য মহিলাটির চোখ এড়ায় নি, কি হল হঠাৎ? সে অবাক হয়ে তাকায়।

'কোথায় থাক তোমরা?'

বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মত প্রশ্ন করে কুঙ্কুম, 'বল না, তোমরা কোথায় থাকো?'

'কলকাতায়'। ছেলের মা-টি আস্তে আস্তে বলে।

'কলকাতায়? কোথায়? কলকাতা বললেই বুঝি সব বলা হয়ে গেল? রাস্তার নাম নেই? বাড়ির নম্বর নেই?

তীব্র তীক্ষ্ণ প্রশ্নে থতমত খাইয়ে দেয় কুঙ্কুম মহিলাটিকে।

'রাস্তার নাম! রাস্তার নাম তো—'

'থাক্ থাক্, আপনাকে আর বলতে হবে না। জানি সব জানি। শুধু এইটাই জানতাম না—'

সহসা নিতান্ত অভদ্রের মত সে-ঘর থেকে উঠে যায় কুঙ্কুম। গিয়ে আছড়ে পড়ে নিজের ঘরে।

কুণাল ছিল না।

কুণাল এল।

অবাক হয়ে বলল, 'কি হয়েছে কি? শরীর খারাপ লাগছে?'

'ও আবার বিয়ে করেছে—' ডুকরে উঠলো কুঙ্কুম।

'বিয়ে করেছে!' থতমত কুণাল বলে, 'কে বিয়ে করেছে?'

'ও ! তোমার সাধের বন্ধু। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে একটা। বৌ নিয়ে ছেলে নিয়ে বেড়াতে এসেছে ! আমি থাকব না, আমি চলে যাবো।'

'কিন্তু কোথায় জানলে এসব ? দেখা হয়েছে ?'

বিপন্ন কুণাল অসহায়ের মত চারদিকে তাকায়।

'আমি জানি না। আমি বলব না। আমি চলে যাবো। এক্ষুণি চলে যাবো।'

'বেশ যাচ্ছি—' কুণাল গম্ভীর গলায় বলে, 'তোমার জানার রহস্য তুমিই জানো। কিন্তু আমার জীবনের রহস্যলেখা আজ উদ্ধার হয়ে গেল। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী আনছি। একেবারে স্টেশনেই ফিরবো। বেড়ানোর ইচ্ছে মিটেছে।'

'তুমি রাগ করছো ?'

কাতর প্রশ্ন করে কুঙ্কুম।

'রাগ ?' ম্লান হাসি হাসে কুণাল, 'মানুষের মনে ওর চাইতে গভীরতর স্তরও আছে কুঙ্কুম !'

না, তাজমহল দেখা হয়নি ওদের। আরো অনেক বেড়ানোও হয়নি।

ডুয়ার্সের সেই চা বাগানেই ফের ফিরে চলেছে ওরা। আর এই দীর্ঘপথ সেই যন্ত্রণার জায়গাটায় হাত দেয়নি কেউ।

এখন আর গাড়ীর জানালা নিয়ে কোন ছেলেমানুষী করছে না কুঙ্কুম। শুধু তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দীর্ঘপথ ট্রেনে অতিক্রম করতে হবে। হাওড়া, দমদম, প্লেনে আলিপুর ডুয়ার্স, তারপর মোটরে চা বাগান।

কিন্তু তারপর ?

জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কঠোর সত্য জেনে ফেলার পর আর কি ?

'আমি শুধু ভাবছি কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হল তোমার ?'

অনেকগুলো ঘণ্টা পার হবার পর বলল কুণাল।

'ওর সঙ্গে নয়—' হতাশ ধূসর গলায় বলে কুঙ্কুম,'ওর বৌয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে।'

'বৌয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে !'

কুণাল বিস্ময়াহতের মত প্রশ্ন করে, 'কিন্তু কোথায় ? তুমি তো আমার সঙ্গে ছাড়া একলা বাইরে—'

'বাইরে নয় বাইরে নয়', কুঙ্কুম অসহিষ্ণু স্বরে বলে, 'কালীবাড়িতে। একেবারে পাশের ঘরে। সেই বাচ্চা ছেলেটা ? সব সময় ছটফট্ করতো ? আলাপ করতে গেলাম। কেনই যে গেলাম !'

'কি বললো তারা ?'

কুণালও অসহিষ্ণু হচ্ছে।

'ওই ছেলেটা ! ওর বাবার নাম বলল !'

একটু চুপ থেকে কুণাল ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'ওর বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। নামটা শুনে প্রথমে অবশ্য আমিও চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এত কথা ভাবতে পারলে, আর একথা তোমার মনে এল না কুঙ্কুম, একই নামের লোক জগতে দু'দশজন থাকতে পারে !'

'তুমি আমায় ঠকাচ্ছ—!'

আবেগে উছলে উঠল কুঙ্কুম।

'লাভ কি ?' কুণাল হাসল। 'আমার দাম তো নির্ণয় হয়ে গেছে, আর বানিয়ে বাজে কথা বলে লাভ কি আমার ?'

তারপরে চুপ হয়ে গেছে দু'জনে।

গাড়ী চলার দুরন্ত ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শুধু মনের মধ্যে অজস্র শব্দ !

একজন ভাবছে, 'কী নির্বোধ আমি, কী নির্বোধ ! এই দীর্ঘদিন ধরে শুধুই ঠকেই এসেছি !'

আর একজন ভাবছে, 'কী নির্বোধ আমি, কী নির্বোধ ! কেন দেখে এলাম না ! কেন দেখে এলাম না ! নিশ্চয় অম্লানই ছিল ওখানে। কুণাল ঠকাল আমায় !'

পাছে দেখা হয়ে যায় এই আশঙ্কার ছদ্মবেশে, শুধু দেখা হওয়ার আশাই করেছে কুঙ্কুম। এটাই খালি টের পাচ্ছে না সে।

দুর্বোধ্য

রাজা নয়, জমিদার নয়, তবু কাণ্ডটা ঘটে গেল রাজা জমিদারের ঘরের মতই। আচমকা রাগের উগ্র আঘাতে জলজ্যান্ত ছেলেটা খুন হয়ে গেল। স্রেফ্ খুন।

অনাদির তিনকুলে সবাই মাঝারি। মধ্যবিত্ত, মধ্যচিত্ত। ওরা 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'তে বিশেষ বিশ্বাসী নয়, চাকরিটাই বোঝে ভাল। অনাদির পিতৃকুল, মাতৃকুল, উভয়কুল তো বটেই, শ্বশুরকুলও।

ওরা চাকরিটাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা বলে মনে করে। ঊর্ধ্বতনদের অকারণেই সেলাম ঠোকে, আর বাড়ি এসে তাদের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে। মাসের প্রথম দিকে স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয়মধুর সম্পর্কটি গাঢ় থাকে, মাসের শেষের দিকে কোঁদল কচকচি, কথাবন্ধর পিরিয়ড চলে।

মোটামুটি এই অনাদির এবং তার আশপাশের ছবি। মেজাজি হবার মত পরিস্থিতিই নেই ওর।

অথচ সত্যিই হ'ল।

অনাদির হাত দিয়েই খুনটা ঘটে গেল।

ছেলেটা অনাদিদের ঝিয়ের ছেলে।

বছর তিনেক বয়স, কালো কুচ্ছিৎ ন্যাড়া, কিন্তু এদিকে বেশ গোলগালটি। ডাবরের মত পেট, চালতার মত গাল, হাত পায়ের চেটো কচুরী-কচুরী! সেই ছেলেটা যে একটা চড়ে সাফ হয়ে যাবে, এ-কথা কে স্বপ্নে ভাবতে পারে?

চড়টা হয়তো খুব মৃদু হয় নি, কিন্তু ছেলেটার দোষটাই কি বেশ মৃদু হয়েছিল?

দিনটা ছিল অনাদির বাপের বাৎসরিকের দিন। ঘটার ব্যাপার নয়, তবে ন্যাটার ব্যাপার বটে। এটুকু সে করে। যেমন সামর্থ্য তেমনই

করে। আর করে বেশ সশ্রদ্ধ চিত্তেই। অনুষ্ঠানে আড়ম্বর না থাক, অনুষ্ঠানে ত্রুটি হতে দেয় না। এর জন্যে বৌকেও টিক্ টিক্ করে সব কিছুতে বিশুদ্ধতা বজায় রইল কি না তার প্রশ্ন তুলে।

তা' সেদিনও সবকিছু গোছগাছ হয়েছে।

পুরোহিত আসতে দেরি দেখে অনাদি উঠে গিয়ে ছেলেকে নির্দেশ দিচ্ছিল—দেরি কেন, খবর নিয়ে আয়। অথবা, সঙ্গে করে নিয়েই চলে আয়।

অফিসে দু'ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে সওয়া ঘণ্টা তো এইখানেই কাবার হয়ে এল। সেই কথাটাই পুরুতকে বুঝিয়ে বলতে বলে ফিরে এসেই ঠিক যেন পাথর হয়ে গেল অনাদি।

মুহূর্ত খানেকের জন্যে পাথর হয়েই রইল, তারপর সে পাথর প্রচণ্ড হুঙ্কারে ভেঙে পড়ল। ভেঙ্গে পড়ল, যেন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই চার বছরের ছেলেটার উপর।

আর—

আর ভুজ্যির মাথা থেকে তুলে-নেওয়া সন্দেশটা হাতে নিয়েই ছেলেটা ঠিক্‌রে দু'হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

কিন্তু পড়ল বলে যে আর উঠবে না এ আবার কেমন কথা? এই কি ভগবানের বিচার? ওই গুরু-অপরাধে এই লঘুদণ্ডটুকুও কি আইনে নেই?

প্রথমটা কেউ কিছু বুঝতে পারে নি, অনাদির গলায় এতবড় হুঙ্কার, এটা আশ্চর্য! ঝি'টা তখনো বাসন মাজছিলো। কড়া মাজতে মাজতে উৎকর্ণ হল, তাকিয়ে দেখল ছেলেটা কাছে নেই। ভয়ে প্রাণ উড়ল। কি জানি কিছু করল নাকি! তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

বলা বাহুল্য এসেই সেই লট্‌কে-পড়া ছেলেটাকে দেখে হাঁউমাঁউ করে উঠল সে।

তখনও অবশ্য অনাদি চরম সর্বনাশের আশঙ্কা করে নি শুধু ভেবেছিল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তাই শুক্‌নো গলায় বলেছিল, 'চেঁচামেচি রেখে আগে তোল না বাপু ছেলেটাকে! ধমক খেয়ে কেমন ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে—'

কিন্তু কথা শেষ করতে পারেনি অনাদি, অনাদির স্ত্রী সবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'ভয় পেয়ে নয় তুলুর মা, চড় খেয়ে। ভুজ্যির সন্দেশ তুলে খেতে এসেছিল, তাই বাবু রাগের মাথায়—'

ততক্ষণে তুলুর মা'র পরিত্রাহী চীৎকার গগন ভেদ করতে শুরু করেছে, 'ওগো মাগো, এ যে ছেলে নড়ে চড়ে না গো! ও-মা, এ যে কাঠ হয়ে গেল গো! ও বাবা, তুমি কী 'কাল' সন্দেশ খেতে গেছিলে বাবা? এই রাক্ষসপুরীর মধ্যে তুমি আসতে গেলে কেন মাণিক? এই তো আমার কাছের গোড়াটিতে বসেছিলে—'

অনাদি ঘরভেদী বিভীষণ স্ত্রীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে, তুলুর মাকে উদ্দেশ করে বলে, 'পড়ে গিয়ে একটু অজ্ঞান মতন হয়ে গেছে, অত অমন করছো কেন? একটু জল দাও, বাতাস করো—।' বলে নিজেই সামনে গোছানো কোশাকুশির গঙ্গাজলই এক-আছড়া দেয় ছেলেটার মুখে-চোখে, কিন্তু বাবুর এহেন মমতার পরিচয় পেয়েও ছেলেটা অবহিত হয়ে উঠে বসে না। যেমন পড়েছিল তেমনি পড়েই থাকে।

আর সবিতা দৃঢ় কঠিন মুখে—'যাক ভালই হল, নিদানকালে মুখে একটু গঙ্গাজল পড়ল', বলে আবার ঘরে ঢুকে যায়।

তারপর যা ঘটে সেটা বর্ণনাতীত। সেই সময় পুরোহিত আসেন, কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পাড়ার লোক এসে পড়ে, এবং অনাদির নিজের ছেলেমেয়েগুলো 'ও বাবা কী করলে? ও বাবা মেরে ফেললে?' বলে চীৎকার করতে থাকে।

পিতৃশ্রাদ্ধ মাথায় ওঠে, অনাদি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। তুলুকে যে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাও মনে পড়ে না অনাদির।

তবে অনাদির কিছু মনে না পড়লেও কাজ ঠিকই এগিয়ে যায়। যেখানে 'পাঁচজন' উপস্থিত থাকে, সেখানে কর্মরথ বিনা সারথাতেও চলে।

পুলিশ আসে, তুলু প্রথমে হাসপাতালে এবং সেখান থেকে লাশ-কাটার ঘরে চলে যায়। বাসা থেকে তুলুর বাবা আসে, তুলুর বাবা আর মা থানায় গিয়ে নালিশ জানিয়ে এজাহার লিখিয়ে আসে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না কিছু।

অতএব অনাদি যে খুনী সে কথা চাপা দেবার আর কোনো উপায় থাকে না।

কিন্তু এতটা কাজ যদি পড়শীরা এগিয়ে না দিত, তা হলেই কি অনাদি চাপা দিতে পারত? অনাদির নিজের স্ত্রী? সবিতা? সে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসতো না কি?

সবিতার নিজের দাদা আসেন উকিলকে সঙ্গে করে। ক্ষুব্ধ তিরস্কার করেন, 'এ তুই কী বোকামি করেছিস বল দিকি, সবি? ভয় খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে, এ একটা সাধারণ কথা। কিন্তু মার খেয়ে পড়া? দুটোতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ও কথাটা তুই বলে ফেললি কেন?'

'সত্যি কথা বলে!' বলল সবিতা।

উকিল গম্ভীরভাবে বললেন, 'সত্যি কথা বলে আপনার স্বামীকে আপনি ফাঁসিকাঠে তুলতে চান?'

'সেটা যদি তাঁর অদৃষ্টে থাকে, আমি কি আটকাতে পারবো?'

'পারতেন বৈকি? ওই কথাটা বললে কেস্ অন্যরকম চেহারা নিত। ছেলেটা যা দোষ করেছে, তার জন্যে একটা ধমক দেওয়া এমন

কিছু অন্যায় নয়, আর ধমক খেয়ে ছুটে পালানোও খুব একটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু সে যাক্, কথাটা আপনি ক'জনের সামনে বলেছেন বলুন!'

সবিতার দাদাও বলেন, 'ভাল করে মনে ভেবে দেখ, কে কে ছিল সেখানে? পাড়ার কেউ এসেছিল কি না?'

সবিতা গম্ভীর গলায় বলে, 'কেউ ছিল না। একা ঢুলুর মা-ই ছিল। কিন্তু কোর্টে সকলের সামনে তো আমাকে সেই কথাই বলতে হবে দাদা!'

'বলতে হবে?' উকিলও গম্ভীর হন, 'তা হলে ধরে নিতে হবে, আপনি আপনার স্বামীর শত্রু।'

'আমি তা মনে করি না। আমি মনে করছি বন্ধু। উনি যা করেছেন তার যথার্থ শাস্তি না পেয়ে বেকসুর খালাস পেলেই কি ওঁর পক্ষে কল্যাণ হতো?'

'যথার্থ শাস্তি মানে তো ফাঁসি—'

দাদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'তাতেই ওর কল্যাণ সাধন হবে, কেমন?'

সবিতা চুপ করে থাকে।

কিন্তু তার মুখের রেখার অনমনীয়তা উকিলের চোখ এড়ায় না।

উকিল বলেন, 'আপনি বলছেন স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব ছিল। আমার মশাই উল্টো ধারণা হচ্ছে—'

দাদা শুকনো মুখে বলেন, 'তাই তো জানতাম। হঠাৎ এই ব্যাপারেই—'

'আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে। এবং ওঁর 'সত্য সাক্ষ্য'তে যাতে আমাদের বিপদে পড়তে না হয়, সে বিষয়ে আট-ঘাট বাঁধতে হবে। যাই বলুন, ডেঞ্জারাস্ স্ত্রীলোক!'

উকিলের মন্তব্য অন্যায় বলা চলে না। ব্যাপারটা যে শুনবে, সেই

সবিতাকে ডেঞ্জারাস্ স্ত্রীলোক বলবে। স্বামী তোর পাষণ্ড নয়, নৃশংস নয়, চিরকেলে অপরাধপ্রবণও নয়, একেবারেই ভাগ্যের হাতের বলি! তাকে তুই বাঁচাবার চেষ্টা না করে সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে এলি?

কিন্তু জগতে সবাই ডেঞ্জারাস্ নয়।

সবিতা স্ত্রী হয়ে যে করুণাটা না করল, দুলুর মা ঝি হয়ে তা করল।

হ্যাঁ, দুলুর বাবাই শুধু নয়, দুলুর মা-ও নাকি কোর্টে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সাক্ষ্য দিয়েছে, 'ছেল বাবা, মিরগি ছেল! জন্মাবধিই ছেল। ওই মিরগির তাড়নায় য্যাখন ত্যাখন মুণ্ডু ঘুরে লটকে পড়ে যেত······ডাক্তার? কোন্ ডাক্তারে দেখেছে বলছেন? ডাক্তার কোথা পাবো বাবা—গরীব মানুষ! তা' ছাড়া— মিরগির ব্যামোর আবার ওষুধ কী? ঝাড়-ফুঁক মাদুলী কবচ ঢের করেছি, কিছুতে কিছু হয় নি।······বাবু দয়ার সাগর, দুলুকে আমার কত আদর করতেন, মুঠোমুঠো বিস্কুট ল্যাবনচুষ দিয়েছেন, পুজোর সময় জামা-পেণ্টুল দিয়েছেন···চলে গেল আমার পোড়াকপালে—'

'ভুল এজাহার লিখিয়েছিলে কেন?' —এ প্রশ্নের উত্তরে চরম অবোধের ভঙ্গীতে কপাল চাপড়ায় সে। বলে—'জানি না বাবা, পাঁচজনে মিলে কী লিখিয়েছে জানি না। আমি যা বলবার বলেছি। আমার চোখের সামনেই তো সব ঘটল। ছোঁড়াকে দুর্মতিতে ধরেছেল তাই ছুটে গিয়ে পুজোর নৈবিদ্যি থেকে সন্দেশ তুলে নিয়ে পালিয়ে আসছেল, আমিও রে রে করে উঠেছি, বাবুও একটা ধমক দেছেন, ব্যস্, ভয়ে ডরে রোগ চেগে উঠল!'

'সদ্ভাব?'

গিন্নীমা'তে আর কর্তাবাবুতে?

'ছেল না বাবা, একতিল ছেল না। আমরা দাসীবাঁদী মানুষ, কী আর বলব, ঘরে এসে দুলুর বাবার সাথে বলাবলি করতাম—সংসারে কোনো অভাব নেই, তবু মায়ের যেন সদাই রাগ, সদাই অসন্তোষ।'

দুলুর বাবা আর দুলুর মায়ে অসদ্ভাব নেই, তাই তাদের দুজনের কথায় গরমিল হয় না।

একটা ঝিয়ের ছেলে নিয়ে আর কত লড়বে ও পক্ষের উকিল? কত পাবে? হ্যাঁ, অনাদি লোকটাও যদি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতো, তাহলেও তাকে ফাঁসানোয় লাভের আশা ছিল।

অনাদি খালাস পেল।

মৃগী-রোগগ্রস্ত ছেলেটা রোগের ঝোঁকে লটকে পড়ে যাওয়ার দায়ে অনাদি কেন ফাঁসিকাঠে লটকাতে যাবে?

দুলুর মা, দুলুর বাবা, আপাততঃ দেশে চলে গেল। দয়ার অবতার মামাবাবু তাদের যা 'সাহায্য' করেছেন, আপাততঃ তাতে তাদের দুটো তিনটে বছর চলে যাবে। ভগবান দয়া করলে ততদিনে আবার কোলে খোকা আসতে পারে। তা বলে রেলগাড়ীতে যে উঠল দুলুর মা—সে কি নিঃশব্দে? ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতেই উঠল। পুত্রশোকটা তো মিথ্যে নয়?

ভাল-মন্দ সাত-পাঁচ বিবেচনা করে সে তার প্রতিহিংসার আগুনকে জল ঢেলে নেভাতে পারে, পুত্রশোকের আগুন কি সহজে নেভে?

রেলগাড়ীতে কাঁদবে সে, দেশে গিয়েও আছড়া-আছড়ি করে কাঁদবে, শুধু দুলুর মৃত্যুর কারণটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে। হয়তো ক্রমশ তার নিজের কাছেও সেই অন্যরকমটাই পাকা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রাণ বাঁচলো! কিন্তু সদ্যলব্ধ একটা পেকে-ওঠা ইনসিওরের টাকার প্রায় সবটা বেরিয়ে গেল। তাই অনাদির মেজাজ খাপ্পা, রুক্ষ। তাই অনাদির মুখে কটু ভাষা ফোটে।

এটুকু ফোটা বোধকরি অন্যায়ও নয়। সবিতার ব্যবহারে অনাদির যে চিরদিনের বিশ্বাসের মূল আলগা হয়ে গেছে!

রাগ করে সবিতার হাতে খেতে না চাওয়াও তার অন্যায় নয়, আর

এটুকুও বলা অসম্ভব নয়, 'কোন্ সাহসে খাবো বল ? কী জানি কিছু মিশিয়ে বসে থাকবে কি না ? ফাঁসিতে ঝোলাতে পারনি, সে চেষ্টাটা যদি অন্যদিকে কর ?'

সবিতা কথা কয়নি।

দুলুর মার সাক্ষ্যের পর থেকেই সবিতা পাথর হয়ে গেছে। তাই এই অপমানেও কথা বলল না।

তারপর পাড়ার লোকে আর এক রোমহর্ষক কাহিনীর হুজুগ পেল পাড়ায়। অনাদিবাবুর স্ত্রী এই আধবুড়ো বয়সে কুলত্যাগ করেছে!

অনেকদিন ধরে এই মুখরোচক আলোচনাটা সকলের খোরাক হল।

আর অনাদি ?

অনাদি রাজা জমিদার নয় যে, ভয়ানক একটা কিছু করে বসবে। অনাদি কপালে হাত দিয়ে বলে 'ভাগ্য'! তারপর যথারীতি অফিসে যায়, বছর বারোর বড় মেয়েটার সাহায্যে রান্না-বান্না চালিয়ে নেয়, আর আস্তে আস্তে না হয়ে দ্রুত বুড়ো হয়ে যায়।

সবিতার সত্যনিষ্ঠা তার বুদ্ধির অগম্য!

কিন্তু শুধুই কি অনাদির ?

সবিতার ত্রিসীমানায় যারা আছে, সেই তার নিতান্ত মধ্যবিত্ত আর মধ্যচিত্ত আত্মীয়কুলের ? কার বুদ্ধিতে কুলোবে সবিতাকে বুঝতে পারা ?

গুহা-মানব

পূর্বরাগ প্রথাটা দেশে বেশ কিছুটা চালু হয়ে গেলেও ঘটকালিঘটিত বিয়েও কিছু কম হচ্ছে না। কনে না দেখে বিয়ে, কলাতলাতেই প্রথম শুভদৃষ্টি, এ ঘটনারও অভাব নেই।

তবে সেই বরকনেরা অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে আর ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, বাসরেই পরিচয়ের পালা শেষ করে অনুরাগের অঙ্কুর রোপণ করে ফেলে।

সৌমিত্র আর সুবর্ণারও অতএব তাতে ত্রুটি হ'ল না। বিয়েটা হল গোধূলী লগ্নে, সেটাও ওদের সুবিধের খাতায় যোগ হল। আর সারারাত বাসর জেগে জ্বালাতন করবে, এত অসভ্য বৌদি-ঠানদিও ছিল না ওদের।

অতএব এই বাসর রাত্রেই সুবর্ণার এই উনিশ বছরের জীবনের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য (এবং অনুল্লেখযোগ্যও) ঘটনাবলীর বর্ণনায় সৌমিত্রব মাথা জমাট হয়ে উঠল, আর সুবর্ণারও জানা হয়ে গেল শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করেই সুবর্ণা যাদের দেখতে পাবে, তাদের কোন্ কোন্ জন বিশিষ্ট এবং কী কারণেই বা বিশিষ্ট। সৌমিত্রর মায়ের মধ্যে কতটি গুণরাশির সমাবেশ, বাবার প্রকৃতিতে কতটি দৃঢ়তা, এবং দাদা কতখানি ভালমানুষ, আর বৌদি কী পরিমাণ পটু মহিলা, এ সবের কিছুই জানতে বাকী রইল না সুবর্ণার।

ঘণ্টা কয়েক সময়ের মধ্যে এত কথার চাষ সম্ভব কি না, এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলেন, তবে তাঁকে অনুরোধ করবো কোনো এক বিগত রজনীতে ফিরে যেতে অথবা কোনো একটি ভবিষ্যৎ রজনীর অপেক্ষায় থাকতে।

এই পাগল-ঝোরা ঝরনাবারি ঠেকে গেল একটি পাথরে। সৌমিত্র যখন জানালো আগামী পশু´ সকালের গাড়ীতে তাদের 'দেশের বাড়িতে'

যাওয়া হবে, ফুলশয্যা হবে সেখানেই, তখন সুবর্ণার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল।

বলল, 'কই একথা তো শুনিনি!'

সৌমিত্র বলল, 'আগে কথা ছিল না, মাত্র আজই ঠিক হয়েছে। মা বললেন, 'যেখানে আমাদের ফুলশয্যা হয়েছে, সেখানে তোদেরও হোক, এই আমার ইচ্ছে।' বাবাও লুফে নিলেন কথাটা। বললেন, 'ভালই! বৌ-ভাতের যজ্ঞি তো রবিবারে হবার কথা, তার মধ্যেই ফিরে আসা যাবে। পরে একদিন দেশে গিয়ে সেখানের লোকজনকে তো খাওয়াতেই হতো, সেটাই বরং আগে হয়ে যাক!'

এই সূত্রে আরো জানাল সৌমিত্র, যদিও তা'রা তিনপুরুষ কলিকাতাবাসী, তথাপি আদৌ তাদের দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। সর্ববিধ পালে-পার্বণে যাওয়া-আসা আছে।

বলাবাহুল্য, এ খবরে সুবর্ণা উল্লসিত হ'ল না, বরং শ্বশুরবাড়ি নামক জায়গাটা পূর্বধারণার চাইতেও আরো খানিকটা 'জমাট' হয়ে উঠল।

'দেশ' মানেই তো পাড়াগাঁ।

অতএব কলের জল নেই, বিদ্যুতের আলো নেই, প্রচণ্ড গরমে ফ্যানের হাওয়া নেই এবং আরো অনেক কিছুই নেই।

তা হলে?

মাসিপিসির বাড়ি নয় যে, তাই নিয়ে হাসবে কাঁদবে, হৈ-চৈ করবে, ন্যাকামি করবে, এ হচ্ছে গিয়ে শ্বশুরবাড়ি। গ্র্যাজুয়েট মেয়েরও যাতে হৃৎকম্প ধরে। সুবর্ণারও ধরল।

সকাতরে প্রশ্ন করলো, 'খুব পাড়াগাঁ?'—

শুনে অবশ্য সৌমিত্র বাসরঘর ভুলে বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। তারপর বলল, 'তোমার ধারণায় খুব পাড়াগাঁ-টা কি তা'তো জানি না, তবে গাছপালা ঝোপঝাড়, পানাপুকুর, সবেরই নমুনা পাবে কিছু-কিছু!'

সুবর্ণা গলার স্বরকম্পন লুকোতে পারল না। বলল, 'স্নানের জন্যে পুকুরে যেতে হবে ?'

'কী মুশকিল! নতুন বৌকে কেউ পুকুরে পাঠায়? ফাঁসি যাবার ভয় নেই ?'

'আলো নেই তো ?'

সৌমিত্র এবার মৃদু হাসলো, 'এতদিন ছিল না, এইবার হবে। তুমিই সারাবাড়ি আলো করে বেড়াবে। আচ্ছা, এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমরা কি কখনো কোনো পাড়াগাঁয়ে যাওনি ? বেড়াতে-টেড়াতেও না ?'

সুবর্ণা একটু ঝেঁজে উঠল, 'বেড়াতে ? বেড়াতে যাবার আর জায়গা নেই জগতে ?'

'তা বটে!' সৌমিত্র হাসে, 'কাছের তীর্থ তীর্থমূল্য হারায়। কিন্তু আমি বলছি, গিয়ে দেখবে খুব ভাল লাগছে।'

সুবর্ণা ভাবে, তুমি চিরকাল যাচ্ছো তোমার নিজের দেশ, তোমার আর ভাল লাগবে না কেন, যা হবে আমারই হবে। বিমনা সুরে বলে, 'কি জানি!'

সৌমিত্র এই ঘণ্টা কয়েক আগে যে পাণিযুগল গ্রহণ করেছে, তারই একখানা হাতে তুলে নিয়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলল, 'কি জানি মানে? আমি থাকবো সেটা বুঝি মনে পড়ছে না ?'

সুবর্ণা অবশ্য তার এই ঘণ্টাকয়েক-লব্ধ বরের এহেন আত্মবিশ্বাসের বহরে হেসে ওঠে না। বরং সেই ধরা হাতটাতেই একটি স্পর্শের গভীরতা দান করে।

সৌমিত্র আস্তে বলে, 'মাত্র তো চল্লিশ মাইল দূরে, ভয় কি ?'

সূচনা পর্ব এই।

ভয়-ভাঙানোর ইতিহাস।

নির্দিষ্ট সময়ে রওনা দিল ওরা।

বেশ ভোর-ভোর সকালে।

গতরাত্রিটা কালরাত্রি ছিল, দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি, তবু ইতিমধ্যে বহুবার চকিত দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে মধুর আর গভীর একটি অনুভূতি জন্ম নিয়েছে এবং ভোরে রওনা দেবার আগেই সকলের অলক্ষ্যে একটু বাক্য-বিনিময় হয়ে গেছে।

সৌমিত্রর বাবা লোকটি গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু এ ব্যাপারে অবিবেচনা দেখালেন না। নিজের একপাল হাবিজাবি লোক সমেত যে কম্পার্টমেণ্টে উঠলেন, নববিবাহিতদের সেখানে না তুলে অন্য একটা কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিলেন এবং স্টেশনে নেমেই একখানা সাইকেল রিক্শায় ওদের তুলে দিয়ে 'তোরা একটু পরে রওনা দিবি, আমরা আগে গিয়ে ওদিকের ব্যবস্থা—' বলে নিজেরা সদলবলে সাইকেল রিক্শার মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ওঁরা চলে যেতেই সুবর্ণা বলে উঠল, 'দেখ আশ্চর্য! আমার আগে এত ভয় করছিল তো? স্টেশনে নেমেই কী রকম একটা অদ্ভুত ভাল লাগছে!'

সৌমিত্রর মুখে বিজয়-গর্বের আলো ছড়িয়ে পড়ে। 'দেখ! বলেছিলাম না ভাল লাগবে!'

'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে। দিল্লীতে গিয়েছিলাম যেবার, লালকেল্লার মধ্যে ঢুকে ঠিক এই ধরণের ভাল লেগেছিল জানো? কি রকম যেন, কত কি হারানো-হারানো আবার পাওয়া-পাওয়া ভাব!'

সৌমিত্র হেসে উঠে বলে, 'তুমি যে একটি কবিতা জানতাম না। ক্রমশই নিজের লাভের ওজন দেখে চমৎকৃত হচ্ছি। কিন্তু সঙের মত অচল রিক্শায় বসে থেকে কি হবে, ওঁদের বরণ-পর্বের প্রস্তুতি হতে তো বেশ কিছুক্ষণ, চল গ্রামের পথঘাটের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিই তোমার!'

রিক্শাটাকে আদেশ দিল ঘুরপথে রওনা দিতে।

এদিকটা একেবারে ভিতর দিক, বাংলা দেশের পাড়া-গাঁয়ের

প্রতীক বললেই হয়। স্টেশনের দিকে যে-সব নব নব আধুনিকতার আমদানি হয়েছে, এদিকে তা অনুপস্থিত।

গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল, মাটির ঘর, সব কিছুই আছে। কিছুক্ষণ এগোবার পর সৌমিত্র ঈষৎ নির্জনতার সুযোগে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে বলে, 'কি, কেমন লাগছে?'

আজ আর কিন্তু সুবর্ণা এই স্পর্শের গভীরতায় গভীরতা যোগ করে না। হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বলে, 'কী বলছ?'

'ওরে বাবা, পল্লী-সৌন্দর্যে যে দেখছি মোহিত হয়ে যাচ্ছ? বলছি, কেমন লাগছে?'

সুবর্ণা শূন্যে দৃষ্টি মেলে বলে, 'ভাল!'

সৌমিত্র বিষণ্ণ হয়। সৌমিত্র ভাবে, একটু আগে যে বলছিল ভাল লাগছে সে শুধু আমার মন প্রসন্ন রাখতে! ভাবে—আশ্চর্য, এত গ্রামভীতি? মাত্র আড়াইদিন থাকা হবে জানে, তবুও!

গ্রাম সৌমিত্রর তো খুব ভাল লাগে।

সৌমিত্র চুপচাপই এগিয়ে চলে। অনেকক্ষণই।

সুবর্ণা নড়েচড়ে বলে, 'তুমি রাগ করেছ?'

'সে কি, কেন?'

'না, এমনি! দেখ যত যাচ্ছি ততই কি মনে হচ্ছে জানো? আমি যেন আগে এখানে এসেছি।'

সৌমিত্র মনে মনে বিপদ গণে।

কবিত্বটা দেখছি একটু বেশী। মাত্রাধিক্য হলে অসুবিধে আছে। সত্যি বলতে, সে এঞ্জিনীয়ার মানুষ, এসব কবিত্ব-টবিত্বর ধার ধারে না। 'ভাল লাগছে, সুন্দর লাগছে, চমৎকার লাগছে' এসব ভাষা সে বোঝে। 'লালকেল্লার মত লাগছে, আগে এসেছি মত লাগছে,' এসব গোলমেলে কথা কেন বাবা!

সাধে কি আর নারীজাতিকে একটা জটিলবস্তু বলা হয়?···

সৌমিত্র জটিলতাকে পাশ কাটাতে চায়, সহজ প্রসঙ্গে আসতে

চায়। তাই একটু পরে বলে, 'আর একটু গেলেই একটা সুন্দর জিনিস দেখতে পাবে—'

সুবর্ণা ক্ষীণ গলায় বলে, 'কী?'

'পদ্মদীঘি! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত নয়, দস্তুরমত অনেক পদ্ম ফুটে থাকে। জমিদারের জিনিস। জমিদারি অবশ্য নেই, তবে এগুলো রেখেছে। চারদিক থেকে ঘাট বাঁধানো—'

সুবর্ণা সহসা বিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'অনেক উঁচু থেকে লাল লাল সিঁড়ি, না?'

সৌমিত্র ঈষৎ চমকায়।

তারপরই হেসে উঠে বলে, 'ও! ইতিমধ্যেই সব খবর শোনা হয়ে গেছে? শ্রীমতী বৌদি বোধহয় 'কালরাত্রির' সুযোগে তোমায় শয্যাভাগিনী পেয়ে কাল রাত্রেই সবিস্তারে সব বর্ণনা করেছেন?'

সুবর্ণা আস্তে বলে, 'না তো! উনি কিছু বলেন নি। আমি আগে দেখেছি! ওই তো · ওই তো ওই, লাল সিঁড়ি, দু'পাশে চওড়া বেদী...আমি নামবো!'

সৌমিত্র এবার ভুরুটা কোঁচকায়।

এটা কি? বিশেষ একটা ঢং?

বন্ধুরা বলেছিল, 'আজকালকার মেয়েদের তল পাওয়া ভার···ওরা কখনো ন্যাকা, কখনো পাকা, কখনো সনেট, কখনো মহাকাব্য।···মাথা ঘুরিয়ে দেবে!'

একটু আগে পর্যন্তও বন্ধুদের সেই কথা সৌমিত্র অলীক ভীতি-প্রদর্শন ভেবে মনের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততার সুখ অনুভব করেছিল।

ট্রেনে যখন কী একটা স্টেশনে ওরা মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে মজা করেছিল, চিনেবাদামের চাক্তি আর মরিচ গুঁড়ো মাখানো কাটা-শশা খেয়ে মজা করেছিল, তখন একেবারে সাধারণ একটি হাসিখুশী মেয়ে ছাড়া কিছুই মনে হয় নি সুবর্ণাকে। সাধারণ আর সরল।

এখন যেন একটু প্যাঁচের আভাস পাচ্ছে।

অতএব একটু দৃঢ় হয় সৌমিত্র।

'নামবে কি ? পাগল না কি ! আর দেরি করা ঠিক নয়। মা-বাবা ভাববেন, ছেলেটা আমার বৌটাকে নিয়ে কোথায় ভেগে পড়ল ! ওই তো দেখলে ?'

'একটু নামি না ?'

সুবর্ণা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকায়।

সৌমিত্রর বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে।

দীঘি দেখে নামার শখ কেন ? কোনো দুর্বুদ্ধির মতলব নেই তো ? 'পুকুর' বলে এত ভয়, আবার দীঘি দেখে নামবার বায়না ! না, না, চটপট বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে ফেলাই শ্রেয়ঃ।

তবে নতুন বৌ বলে কথা !

তাই খুব মিষ্টি করে বলে, 'আচ্ছা, ভাল লাগছে, কাল বরং মা'দের সঙ্গে এসো আবার। এখন সত্যি বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সাইকেলকে নির্দেশ দেয় বাড়ির দিকে।

সুবর্ণা আস্তে বলে, 'তুমি বিশ্বাস করছ না ? কিন্তু সত্যি বলছি, সব যেন চেনা-চেনা লাগছে, মনে হচ্ছে এই গাছপালা ঘরবাড়ি সব যেন দেখেছি।...এই জায়গাগুলোয় কত যেন বেড়িয়েছি।'

সৌমিত্র মনে মনে বলে, 'রহস্য সিরিজে'র একখানি পৃষ্ঠা। মুখে বলে 'তা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। হাজার হাজার বছর ধরে তো আমরা দু'জনে এই ভাবে একখানি সাইকেল রিক্‌শায় চড়ে যুগের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছি !

'তুমি ঠাট্টা করছ !' সুবর্ণা আহত ভাবে বলে, 'বেশ আর বলব না।'

বলে।

বলব না বলে।

তবু সহসা প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে যায়। বাড়ির দরজায় আসামাত্র বলে ওঠে, 'এইতো, এই বাড়িতেই তো থাকতাম আমি !'

সৌমিত্র বেশী সময় পায় নি।

দরজায় গাড়ীর আওয়াজ পাওয়ামাত্র হৈ-চৈ করে বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এত দেরির জন্যে কৈফিয়ত চেয়ে ঠাট্টা করেছিল, শাঁখের শব্দে কানে তালা ধরিয়েছিল, উলুধ্বনিটা শোনবার মত করে তুলেছিল এবং এর মাঝখান থেকেই 'মঙ্গল কর্মের' বেড়াজালে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল···তবু একটি ক্ষণিক অবসরে সৌমিত্র সাবধান করে দিয়েছিল, 'ওই সব আগে দেখেছি, এই বাড়িতে ছিলাম' ইত্যাদি কবিত্বর কথাগুলো আর কারো কাছে বোলো না লক্ষ্মীটি!'

বলেছিল।

তবু সুবর্ণা সেই অনুরোধের মান রাখল না!

সে কি নিতান্তই রাখতে পারল না বলে!

ওঁরা যখন যুগলকে নিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে প্রণাম করাতে গেলেন, সুবর্ণা অস্ফুটে বলে উঠল, 'ঠাকুমা কই?'

ঠাকুমা!

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, 'ঠাকুমা' কাকে বলছে? ঠাকুমা বলবার মত কে আছে?

বড়-বৌ বলল, 'ঠাকুমা কাকে বলছিস রে।'

সৌমিত্র অলক্ষ্যে নববিবাহিতার বাহুমূলে একটা চিমটি কাটল।··· এবার ওর ভয় ধরছে। মাথায় ছিটটিট নেই তো? ঠকিয়ে গছিয়ে দেয় নি তো! কিন্তু এই বয়সের মধ্যে বি-এ পাশ করা হয়ে গেছে, গানে মেডেল পাওয়া, আর খেলায় 'কাপ' পাওয়া বলে শুনেছে, মাথার দোষ কবে হবে?

কিন্তু যাই হোক, চিমটিতে বোধহয় কাজ হল। সুবর্ণা সামলে নিয়ে বলল, 'ভাবছিলাম এখানে বোধহয় ঠাকুমা-টাকুমা কেউ আছেন! দেশের বাড়িতে তো থাকেন এ রকম—'

বড়-বৌ ভাবল, 'একটু যেন ন্যাকা লাগছে। কাল তো অত বুঝতে পারি নি।'

কিন্তু এতটা বুঝতে কি সুবর্ণাই আগে পেরেছিল ?

চিমটির প্রতিক্রিয়া ফুরিয়ে গেল, বরণ শেষে বৌকে যেই দোতলায় উঠিয়ে সৌমিত্রর মার ঘরে এনে বসাল ওরা শাড়িটাড়ি বদলাতে, সুবর্ণা হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'এই তো আমাদের ঘর, ওই তো আমার ছবি !'

আমাদের ঘর ! আমার ছবি !

অনেকগুলি মহিলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, 'তোমার ছবি ! কই, কোথায় ?'

নতুন বৌ বিস্ফারিত নেত্রে সামনের দেওয়ালে আঙুল বাড়িয়ে ভাঙা গলায় বলে ওঠে, 'ওই তো !'

ওই তো !

সকলেরই সেই দেয়ালে চোখ পড়ে। আর গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে !

শুধু কাঁটা দিয়েই ওঠে না, অজানা একটা ভয়ে যেন শিথিল হয়ে যায় ওরা।

দেয়ালে ঝোলানো ওই এনলার্জ'ড্ ফটোটা যে কার সে তো কারো অজানা নয়।...সেই সুন্দর ফ্রক-পরা বছর ছয়েকের হৃষ্টপুষ্ট হাস্যমুখী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হিম হয়ে যায় সবাই।

শুধু বড় বৌ ঈষৎ তীব্রস্বরে বলে ওঠে, 'এ আবার কি ধরণের ঠাট্টা, সুবর্ণা ? খবরদার, মার সামনে এরকম বোলো না। ও আমাদের একটি ছোট ননদ ছিল, তার ছবি। ঠাকুরপোর সঙ্গে পিঠোপিঠি ছিল। ছবি এনলার্জ করিয়ে আনার পর মা দেখলেই কাঁদতেন বলে বাবা এখানে এনে রেখেছিলেন।'

সমাগত মহিলারা বলে ওঠেন, 'ঠিকই করেছিলেন বাবা ! তোমার শাশুড়ীর সেই কান্না মনে পড়লে এখনো হৃৎকম্প হয় ! উন্মাদ পাগল হতেই যা বাকী ছিল !'

কিন্তু ততক্ষণে এক কিম্ভূতকিমাকার উন্মাদ কাণ্ড হয়ে গেছে।

পালঙ্কে বসে থাকা কনে-বৌ সহসা পালঙ্কের উপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই ছবিখানা টেনে দড়ি ছিঁড়ে নামিয়ে তীব্রস্বরে বলে উঠেছে, 'না! এ আমার ছবি! এই তো আমার পুজোর জামা!'

বড় বৌয়ের বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থই হল। মহিলাকুল সভয়ে সরে গিয়ে এখানে ওখানে জটলা করতে শুরু করলেন—'হয় পাগল, নয় জাতিস্মর!'

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ সন্দেহটাই নিশ্চিতে পরিণত হল। ওঁরা দেখেছেন বৌয়ের কানের পিঠে তিল।···সৌমিত্রর পিসি জানেন না সেই মেয়েটারও কানে তিল ছিল?

তবে?

তবে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কোনো দিকেই অবকাশ নেই। বৌ সেই ছবিখানা কিছুতেই ছাড়ছে না, কোলে চেপে বসে আছে, ছোট ছেলেরা যেমন ভাবে নতুন কেনা জুতো আগলায়।···শত চেষ্টাতেও সৌমিত্রর মা ক্ষণপ্রভার কানে ওঠানো বন্ধ করা গেল না। এতগুলি মহিলার মুখকে সামলানো তো সোজা নয়!

কানে আসামাত্র ক্ষণপ্রভা প্রথমে শিউরে উঠলেন, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেলেন, আর তারপর বহুদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা কান্নার গলা নতুন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

সদ্য শোকের মতই তীব্র আর তীক্ষ্ণ!

বছর কুড়ি আগের একটা পাঁচ ছ বছরের শিশুর মৃত্যু এই উৎসব বাড়ির উল্লাস ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিতে পারেনি, মনেও রাখেনি কেউ।

শুধু মাতৃহৃদয়ের সেই অনেক স্তম্ভের নীচে চাপা পড়ে থাকা স্মৃতির আগুন মাঝে মাঝে বেদনার বাষ্প হয়ে চকিত ছায়া ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছিল। শুভদিনে চোখে জল আনব না প্রতিজ্ঞায় ক্ষণপ্রভা সেই বাষ্পকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এই নতুন এক অভাবনীয়ের ধাক্কায় বাষ্পে আগুন জ্বলল।···

ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন ক্ষণপ্রভা—'ওরে, আমি ঠাকুরের কাছে বড় মাথা খুঁড়েছিলাম 'আবার ফিরিয়ে দাও' বলে, এতদিন পরে কথা তাই কি রেখেছেন ঠাকুর!'

স্তব্ধ হয়ে যায় সমস্ত কোলাহল।

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে এই হ্যারিকেন জ্বালা বিরাট তে-মহলা বাড়িটায় যেন নতুন মৃত্যুর ছায়া নামে!

সেই ছায়ার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে সৌমিত্র বসে থাকে বাইরের মহলে। মুখটা পাথরের মত দেখায় তার।

দিদি-বৌদিরা এখানে এসেই হানা দেয়, 'কী কেলেঙ্কারি হচ্ছে, শুনেছ তো? তুমি একবার যাও?'

সৌমিত্র শুকনো গলায় বলে, 'আমি আর গিয়ে কি করবো?'

'কি আর করবে? বোঝাবে! মা-বৌ দু'জনকেই বোঝাবে।'

'বোঝাবার কিছু আছে?'

'নেই তো কি সবাই মিলে পাগল হতে হবে? বিয়ের অর্ধেক নিয়মলক্ষণই এখনও বাকী! ফুলশয্যের গোছ নিয়ে বসে আছি আমরা!'

সৌমিত্র আস্তে দোতলায় উঠে যায়। ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে বড় পালঙ্কের উপর ক্ষণপ্রভা ঘুমোচ্ছেন সুবর্ণাকে বুকের মধ্যে নিয়ে। বোধকরি অনেক কান্নার শেষ ক্লান্তির এই ঘুম।

কিন্তু সুবর্ণা?

ওরও কি ক্লান্তি এসেছে? অনেক ক্লান্তি? আর একজন্ম পার হয়ে আসার এক দুর্বহ দুর্ভার ক্লান্তি?···এই ঘুম ভাঙাবে সৌমিত্র?

কিন্তু সৌমিত্রও কি হঠাৎ আর এক জন্ম পার হয়ে যাবার মন্ত্র পেয়ে গেছে? তাই বিশ বছরের যবনিকা সরে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে থেকে!

···ঘরে আর কেউ নেই, ওই ছেলেটার থাকবার কথা নয়, তবু সৌমিত্র দেখতে পাচ্ছে ওকে। ছলছলে চোখ, অভিমানে লাল লাল

মুখ, বছর আট নয়ের ওই ছেলেটাকে।...ক্ষণপ্রভার খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও।

বোনের জ্বর হয়েছে বলে মায়ের বিছানায় ওঠা তার বারণ হয়ে গেছে।···মা যে সেই বোনটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুয়ে আছেন, এ দেখে বুকের মধ্যে দুঃখের সমুদ্র উথলে উঠছে তার।···ওই ছেলেটা আজও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কান্না চাপছে।

কিন্তু আর এক সমুদ্রের কান্না কেঁদেছিল সেই ছেলেটা, যে দিন ওই বোনটা—ওই খাট বিছানা ছেড়ে চলে গিয়েছিল নিথর ঘুমন্ত মুখে। এখনো তো সেই নিথরতার শান্ত ছাপ ওর মুখে।

দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল সৌমিত্র।

বলল, 'ওসব হবে না।'

'হবে না? ফুলশয্যে হবে না?'

'না।'

'এলো না বুঝি? রোসো, আমরাই হিড়হিড় করে টেনে আনছি। এ কী হচ্ছে! হাতের সুতো খোলা না হওয়া পর্যন্ত তো বিয়ে সিদ্ধ হয় না—'

'হবার দরকার নেই!'

বলে সৌমিত্র হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে ওদের মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া ওদের হাত থেকে ছাড়ান পাবার অন্য আর উপায় নেই।

অথচ ছাড়ান তাকে পেতেই হবে। ফুলশয্যার বিছানা পেতে সুবর্ণাকে গ্রহণ করবার মত মনের জোর খুঁজে পাচ্ছে না সে। এক কণাও না।

আধুনিক মনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অগ্রাহ্য করে একটা পাষাণভার কুসংস্কার অন্ধ-প্রশ্নের বিদারণ রেখা টানছে, 'জাতিস্মর কি হয় না? না যদি হয় তো, এ রকম হয় কি করে?'

অলৌকিক

'মা'য়ের প্রথম বলি হচ্ছে রাস্তার সেই ঘেয়ো কুকুরটা। যেটা অনবরতই অসীমাদের বাড়ির দরজার গোড়ায় তার ঘৃণ্য দেহটা নিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো, আর হাঁফাতো।

হ্যাঁ, সেইটাই প্রথম বলি।

তবে তার জন্যে তো আর হাড়িকাঠের ব্যবস্থা করা হয়নি, ব্যবস্থা করে দিল একটা দুর্দান্ত দোতলা বাস। প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনটা একটু বেশীই হয়েছিল। শুধু তো ধড়মুণ্ডু আলাদা নয়, একেবারে পেষাই হয়ে গিয়েছিল কুকুরটা।

তবু সে ঘটনাটাকে তেমন করে আমল দেয়নি অসীমা, 'নেহাতই কাকতালীয়' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। শুধু কুকুরটার সেই পেষাই-হয়ে-যাওয়া বীভৎস চেহারাটা তার মনের মধ্যে একটা ঘায়ের মত দগ্‌দগ্‌ করেছিল বেশ কয়েকদিন। বিভাস প্রশ্ন করেছিল, 'হঠাৎ কি হল তোমার?' খুকু বলেছিল, 'মা, তুমি সারাক্ষণ বুবুর মা'র মতন হাঁড়িমুখ করে আছ কেন?' অসীমা হেসে উত্তর দিতে পারেনি। ফিকে একটু হাসির মত করে বলেছিল, 'কই আবার?'

তার বেশী আর কিছু নয়। সেই তো প্রথম।

তখনও নিজেকে ভয়ানক একটা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী বলে টের পায়নি অসীমা।

দ্বিতীয়টা ঘটলো—

কিন্তু তার আগে আগের ইতিহাসটা বলে নিলেই বোধহয় ভাল হয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল নিতান্তই আকস্মিক। পুরনো মডেলের ছোট গাড়ীখানা বাতিল করে বিভাস যখন নতুন বড় গাড়ীটা কিনল, অসীমা ধরে বসল, 'চলো একদিন যথেচ্ছ বেড়িয়ে আসি।'

'যথেচ্ছ! কোথায়?'

'যেখানে দু'চক্ষু যায়।'

'আইডিয়াটা—মন্দ নয়। তারপর?'

'তারপর-- আবার কি? সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন, ভুরিভোজন, আরামে শয়ন—'

'যাক্ বাঁচা গেল! পুরোপুরি বৈরাগ্য নয় তাহলে? কিন্তু তোমার আদরের দিদির বাড়ি যেতে না চেয়ে—'

'নাঃ, কারুর বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করে না। এ বেশ—খাবার টাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, কোথাও নেমে পড়ে গাছতলায় বসে খাব। সন্ধ্যায় ফেরার আদায় রেখে যতটা যেতে পারা যায় যাব—'

বিভাস হেসে বলে, 'শুনে ভালই লাগছে। প্রাক্-বিবাহ যুগের স্মৃতিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। কিন্তু হাতে যে গোটাকতক ঝুলে থাকা রুগী রয়েছে—'

'থাক।' অসীমা রেগে উঠেছিল, 'ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তারা আর তোমার নামে কালি লেপে সুতো ছিঁড়ে পড়ে যাবে না!'

তারপর সত্যিই পরদিন 'যেদিকে দু'চক্ষু যাওয়া'র পথে বেরিয়ে পড়ল ওরা খুকুকে নিয়ে। যত পারল খাবার নিল, জল নিল, ডাব নিল, মোটকথা বৈরাগ্যের লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেল না এই যাত্রায়।

খুকু তো তার প্রিয় পুতুলটাকে পর্যন্ত নিল।

ডুগডুগির আওয়াজটা প্রথম কানে এসেছিল খুকুরই। আর যেই শোনা সেই আবদার।

'বাবা ভালুক নাচ দেখবো।'

'ভালুক নাচ? সে আবার কোথা?'

'ওই যে শব্দ আসছে। ···ও বাবা—'

অতএব শব্দ অনুসরণ করে এগোতে হ'ল। আর একটু এগোতেই

মেলার প্যাণ্ডেলটা নজরে পড়ল। শুধু ভালুক নাচ নয়, বহুবিধ নাচ চলছে সেখানে। গাড়ী থেকে মুখ বাড়ালো বিভাস।

'কিসের মেলা বসেছে হে?'

'আজ্ঞে, কঙ্কালেশ্বরীর বার্ষিক মেলা।'

'কঙ্কালেশ্বরী! সর্বনাশ! শুনছো খুকু, এখানে নেমে কাজ নেই। এসব ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেতের আড্ডা!'

'না-আ-আ! মেলা দেখবো।'

'এই শুনছো, তোমার মেয়েকে সামলাও।'

'কে কাকে সামলায়?' অসীমা খুশিখুশি মুখে বলে, 'কোনও কালে গ্রামের মেলা দেখিনি, ছাড়বো ভেবেছ? আজকের নিরুদ্দেশ যাত্রায় এটাই হলো পরম লাভ।'

মেলাতলায় ঢুকে পড়ে খুকুর আর খুকুর মায়ের মধ্যে আবেগ, আনন্দ, উত্তেজনার তারতম্য দেখা গেল না বিশেষ। বরং খুকুর খেলনা খুকু যত কিনল, অসীমার খেলনা কেনা হল তার চেয়ে বেশী। বিভাসের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাধাপ্রদান কোনটাকেই গ্রাহ্য করল না অসীমা।

'তোমার সংসারে যে এত জিনিসের অভাব ছিল, আর ঘর সাজাবার যে কিছুই ছিল না, তা তো জানতাম না—' বিভাস হাসে, 'জানলে—কোথায় কখন মেলা বসছে তার খোঁজ নিতাম। বাংলাদেশে আর যত যার অভাব থাক, মেলার অভাব নেই।'

'আহা, খোঁজ করা জিনিসে মজা কোথায়? এ আচমকা পেয়ে গেলাম বলেই না—'অসীমা জিনিস-ভর্তি নতুন কেনা ঝুড়িটা ঠেলে ঠুলে গাড়ীতে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, 'তুমি তো সবতা'তেই হাসো। দেখবে—আমাদের সওদা যে দেখবে, ভাল বলবে। এই সব গ্রামের—'

কথাটা শেষ হল না অসীমার। শেষ করা হল না।

পিছনে বেজে উঠল শাঁখের আওয়াজের মত তীব্র একটা আওয়াজ।

'মেলার বাজারে তো খুব পয়সা ছড়ালি, মাকে দর্শন করে গেলি না ?'

অসীমা চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কপালে সিঁদুর-লেপা রক্তাম্বরধারী সেই কালো শুঁটকো লোকটা, যে লোকটা সমানে অসীমাদের কাছাকাছি ঘুরছিল, আর অসীমা যাকে নেহাতই কাপালিক-সাজা গ্রাম্য গাঁজাখোর ভেবে লক্ষ্যমাত্র করছিল না।

এখন কিন্তু ওর ওই শাঁখের মত গলার তীব্র প্রশ্নটায় বুকটা কেমন কেঁপে উঠল অসীমার। থতমত খেয়ে বলল, 'দর্শন ?'

'হ্যাঁ। মা কঙ্কালেশ্বরীকে দর্শন করেছিস ?'

অসীমা ভয়ে ভয়ে বলে, 'মন্দিরটা কোন্ দিকে ?'

'থাক্—' বিভাস গাড়ীতে স্টার্ট দেবার উদ্যোগ করতে করতে বিরক্তভাবে বলে, 'এখন আর মন্দির কোন্‌দিকে জানতে হবে না। ওঠো, দু-চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে উঠে এসো গাড়ীতে। যত্তোসব—'

মেয়েদের ভয় দেখিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে, লোকটা যে তাদেরই একজন, এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না বিভাসের। বিশ্বাস নেই—হয়তো অসীমা এখুনি ওর পিছু-পিছু দেবীদর্শনে ছুটবে। লোকটার যেমনি কদাকার চেহারা, তেমনি চোয়াড়ে কথা! এঁরাই আমাদের দেশের ভগবানের দরোয়ান! ভাবল বিভাস, এঁদের কাছেই স্বর্গের পাশপোর্ট! নিকুচি করেছে। এখন পালাতে পারলে হয়।

কিন্তু গাড়ীটা স্টার্ট নিচ্ছে না কেন ?

বিভাস নেমে পড়ে গাড়ীর গায়ে বড় একটা ধাক্কা মেরে বলে ওঠে, 'সরে পড় না বাবা! দেখছ না, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আমি নই! ভিক্ষে চাইবে সোজাসুজি চাও, ঠাকুরদেবতার নাম করে কেন ?'

'কী বললি ? ভিক্ষে ?' লোকটা আর একবার তার গলার শাঁখে ফুঁ দেয়, 'একখানা গাড়ীর মালিক হয়ে ধরাকে সরা দেখছিস যে ? তোর

মতন অমন কত গাড়ী এখানে এসে গড়াগড়ি যায় বুঝলি ? মিনিস্টাররা আসে, ম্যাজিস্ট্রেটরা আসে, কোটিপতি জেঠিয়ারা আসে, তোর দেখছি বড় গুমোর ! থু থু !'

ধুলোর ওপর খানিকটা থুতু ছিটিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলে যায় লোকটা।

'ভিক্ষে-টিক্ষে বলার তোমার দরকার কি ছিল বাপু ?' অসীমা অসন্তোষ প্রকাশ করে।

'ঠিক আছে। মিনিস্টার দেখিয়ে ভয় খাওয়াতে এসেছে ! যত্তোসব—'

কিন্তু বেশী কথা বলবার জুৎ হয় না আর। গাড়ীটা বড় জ্বালাতন করছে।

স্টার্ট আর নিচ্ছে না।

অনড় অচল দারুভূতো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

'কী হলো ? নতুন গাড়ীর কী হলো তোমার ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

হঠাৎ অচল হয়ে যাওয়া গাড়ীকে সচল করবার যত রকম কৌশল জানা আছে বিভাসের, কাজে লাগায় সমস্ত। কিন্তু কাজ হয় না।

গাড়ীটা যেন কী এক গোঁ নিয়ে বসে আছে। যেন পূর্বজন্মের শত্রুতা সাধছে বিভাসের সঙ্গে।

খুকু ওদিকে অস্থির হচ্ছে, 'ও বাবা, চালিয়ে দাওনা গাড়ীটা। বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

বিভাস কখনো যা না করে, তাই করে বসে। খুকুকে একটা ধমক দিয়ে বসে, 'হচ্ছে ! সব সময় আবদার !'

অচল গাড়ী দেখে এদিক ওদিক থেকে ছেলে জুটেছে বেশ কতকগুলো। তাদের পয়সার লোভ দেখিয়ে গাড়ী ঠেলাতে চেষ্টা করে বিভাস, সুবিধে হয় না।

শীতের দিনে কপালের ঘাম মোছে বিভাস।

অসীমা চুপ করেই ছিল। শেষ পর্যন্ত আর না বলে থাকতে পারে না। বলেই ফেলে। 'দেখ, শুনছো, চল না হয় ঠাকুর দর্শন করেই আসি।'

'কেন?' বিভাস বিরক্তির হাসি হেসে বলে, 'তোমার ঠাকুর আমার গাড়ীর চাকা চেপে ধরে বসে আছেন প্রণামীর আশায়?'

'আহা তা কেন! এতক্ষণই যখন এখানে আটকে থাকতে হলো, একবার দেখে আসতে দোষ কি? চল না!'

'না। অন প্রিন্সিপ্‌ল যাব না আমি। ওই গেঁজেল লোকটা দেখছি তোমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ভয় ধরানোই ব্যবসা ওদের।'

'বাঃ, ওর সঙ্গে কি? ঠাকুর'দেখব বৈ তো না! সত্যি, দেখাই তো উচিত ছিল। এসেছি যখন—'

'তোমার উচিতের সঙ্গে আমার উচিত-বোধ মিলছে না—' বলে গাড়ীর গায়ে আবার প্রকাণ্ড একটা থাবড়া মারে বিভাস। কিন্তু তা'তে তার কিছুই বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যেমন অনড় তেমনিই থাকে।

অসীমা যেন এই গাড়ীর অনড়তার মধ্যে কোনও এক রহস্যময় ইঙ্গিত পায়। ওর মন বলে, দেবীদর্শন না করা পর্যন্ত গাড়ী চলবে না। অথচ বিভাস এখন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, বিপন্ন, জোর করাও শক্ত।

তাই ফিকে হাসি হেসে বলে, 'মা কালী বলছেন তোদের না দেখে শান্তি পাচ্ছি না আমি—'

বিভাস জ্বলন্তস্বরে বলে, 'তোদের' নয়, বল 'তোর'। তোমার ইচ্ছে হয় যেতে পারো, আমাকে কাটলেও যাব না, অন্‌ প্রিন্সিপল্‌ না।'

'ঠিক আছে। আয় খুকু!'

'না না, খুকুর আর এই রোদে নামতে হবে না। তোমার ইচ্ছে হচ্ছে তুমি যাও। আর পার তো তোমাদের সেই মঙ্গলচণ্ডীর গল্পের মত, প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটার স্টার্ট করিয়ে দাও। শুনেছিলাম ছেলেবেলায় মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় ডোবা ডিঙি ভেসে উঠেছিল নাকি—'

কিন্তু এত কথা দাঁড়িয়ে শোনবার ধৈর্য নেই অসীমার, ও এগিয়ে গেছে।

মন্দিরের চাতালেই বসেছিল লোকটা। উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছিল।

অসীমাকে দেখে দাঁত বার করে হেসে বলে ওঠে, 'আসতে হল তো?'

অসীমা অস্ফুটে কি একটু বলে।

লোকটা তেমনি বিকশিত দন্তে পাশের একটা লোককে বলে, 'বাবুরা সব পয়সার অহঙ্কারে মাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, বুঝলে? আর 'কারে' পড়লেই—কী, দর্শন করবি মাকে?

'হ্যাঁ।'

লোলরসনা করালবদনা দেবীমূর্তি, প্রায়ান্ধকার মন্দিরের মধ্যে যেন একটা ভয়াবহতা নিয়ে বিরাজ করছেন। অসীমা আড়ষ্ট হয়ে একটা দশ টাকার নোট নামিয়ে রাখে।

দশ টাকা!

লোকটা হৃষ্টচিত্তে বলে, 'এই নে, এই মায়ের নির্মাল্য। প্রসাদী বেলপাতা। নিয়ে গিয়ে কৌটোয় রেখে দিবি। এ জিনিস কাছে থাকলে যা সংকল্প করবি তাই সাধন হবে। যা মন করবি তাই হবে। অবিশ্বাস করেছিস কি মরেছিস। যাঃ।'

আস্তে হাতটা পাতে অসীমা।

তারপর ফিরে আসে দ্রুতপদে। আসতে আসতে ভেবেছিল, বিভাস যেমন ঠাট্টা করল, তেমনি যদি ফিরে গিয়ে দেখি গাড়ীটা স্টার্ট নিয়েছে, বেশ হয়!

ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই আশা করেছিল কি?

করেনি।

করলে গাড়ীর গর্জনে বুকটা অমন কেঁপে উঠত না তার। দাঁড়িয়ে পড়ত না অমন স্তব্ধ হয়ে।

হ্যাঁ, ঘুমন্ত বাঘ জেগে ওঠার মত, ঘুমন্ত গাড়ীখানাও জেগে উঠে গর্জন করেছিল তখন।

'একেবারে অব্যর্থ ফলপ্রদ স্বপ্নাদিষ্ট মাদুলি!' 'তিক্ত হাসি হেসে স্টিয়ারিঙে হাত দিয়ে বিভাস বলে, 'হাতে হাতে ফল লাভ, কি বল?'

অসীমা ওর ওই পরাজিত-পরাজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জিজ্ঞেস করে না হঠাৎ কি করে অচল যন্ত্রটা সচল হলো? বলল না, 'এখুনি ফিরছ যে? আর বেড়ানো হবে না তা হলে?'

অদ্ভুত একটা আতঙ্কময় অনুভূতি যেন তার বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, সব কিছুকে অসাড় করে দিচ্ছে।

সেই সেদিন অন্তরলোকে দেবীর প্রতিষ্ঠা।

অসীমার অবচেতনে।

তার পরদিনই বলি নিলেন দেবী।

প্রথম বলি!

সাবধানে যেই প্রসাদী বেলপাতা মুঠোয় নিয়ে গাড়ী থেকে নামছিল অসীমা, একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ল ঘেয়ো কুকুরটা। যেটা অসীমার একান্ত বিরক্তি উৎপাদন ক'রে ওর দরজার কাছে পড়ে থাকে আর হাঁফায়।

অসীমা অনুভব করল তার পায়ের পাতাটা ভিজে ভিজে।

অসীমা তাকিয়ে দেখল, কুকুরটার জিভ দিয়ে লালা ঝরছে। কী কুৎসিত! কী অশুচি!

অসীমার হাতে দেবীর নির্মাল্য, আর ওটা কি না—অসীমা হঠাৎ ভাবল এত লোক গাড়ীচাপা পড়ে, আর এই হতভাগা ঘেয়ো কুকুরটা গাড়ী চাপা পড়ে মরে না?

বাড়িতে ঢুকে প্রসাদী বেলপাতা একটা আলমারীর মাথায় তুলে রেখে, সাবান মেখে স্নান করতে গেল অসীমা। বিভাস বলল, 'তোমার এই খেলনার ঝুড়ি?'

'রাখো কোনখানে।'

সহসা যেন অনেকখানি বয়েস বেড়ে গেছে অসীমার। তাই খেলনা বস্তুটা নেহাতই খেলনা হয়ে গেল তার কাছে।

পরদিনই ঘটল ঘটনাটা।

ভয়ানক একটা হৈ-হৈ উঠল একেবারে বাড়ির সামনে। ছুটে জানলায় এসে দাঁড়াল অসীমা। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল কলরব। ভিড় সরে গেল।

মানুষ নয়, কুকুর! একেবারে রাস্তার কুকুর!

ওর পক্ষ নিয়ে গাড়ীটাকে ইটিয়ে ভাঙা যায় না, ড্রাইভারকে মেরে তক্তা বানানো যায় না। তবে আর কিসের তামাসা দাঁড়িয়ে দেখবে লোকে?

শুধু অসীমা জানলায় দাঁড়িয়ে রইল তক্তা হয়ে। কুকুরটার মাংসর দলার মত দেহটা পড়ে রইল তার সামনে রাস্তার ওপর। হয়ত ওর ওপর দিয়ে আরও অনেক গাড়ী যাবে। কাল সকালের আগে তো আর কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ী আসবে না!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তবু, মনকে তত বিচলিত হতে দেয়নি অসীমা। কাকতালীয় বলেই মেনে নিয়েছিল ওটাকে। আস্তে আস্তে ভুলেই যাচ্ছিল।

এই সময় আবার বোধ করি ক্ষুধা জাগল দেবীর।

আর একটা বলি পড়ল।

দ্বিতীয় বলি, বিভাসের সেই আদি অন্তকালের রোগিণী মল্লিক-গিন্নী। প্রথম পাশ করে বেরিয়ে পর্যন্ত মল্লিক-গিন্নীকে দেখছে বিভাস। তার আগে তাঁকে আর কে দেখত বিভাসের জানা নেই। তবে পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ নাকি তিনি হার্টের অসুখে ভুগছেন। বছর পঁচাশী বয়স, কিন্তু ছেলের বৌরা বলে একশোর কাছাকাছি।

বড়লোকের গিন্নী ছিলেন, এখন বড়লোকের মা। আজীবন স্বামীকে ভুগিয়েছেন, এখন ছেলেদের ভোগাচ্ছেন, হপ্তায় পাঁচদিন 'যায় যায়' হন, আর ডাকের ওপর ডাক আসে বাড়ির ডাক্তারের। দিন নেই, রাত নেই।

ওঁর হার্ট যে কোনোদিন ফেল করবে এ আশা বাড়ির লোকের মন থেকে মুছে গেছে, নাতবৌরা নাম দিয়েছে 'অমরলতা'। আর অসীমা বিভাসকে বলে, 'তোমার কামধেনু'।

কিন্তু সে রাত্রে হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল অসীমার। একটা রোগীকে নিয়ে অনেক লড়ালড়ি ক'রে রাত এগারোটায় ফিরে সবে নেয়ে খেয়ে শুয়েছে বিভাস, টেলিফোন ক্রীং ক্রীং করে উঠল।

'কে?'

'ডাক্তার কাকা, আমি অরুণ বলছি—ঠাকুমার আবার বাড়াবাড়ি হয়েছে, কি রকম যেন করছেন!'

'ওই ওষুধটা দিয়েছ?'

'দিয়েছি, কিছু হচ্ছে না। খালি আপনাকে খুঁজছেন।'

'নাঃ, ঘুমোতে আর দিলে না।' উঠে পড়ল বিভাস।

আর অসীমা হঠাৎ বলে উঠল, 'আঃ, আর তো পারা যায় না। আজ রাতই যেন বুড়ির শেষ রাত হয়।'

কিন্তু এ প্রার্থনা কি অসীমা একাই করেছিল? মল্লিকবাড়ির সেই বিরাট গুষ্টির সব্বাই করেনি? সপ্তাহের মধ্যে দুটো দিন যারা রাতে ঘুমোতে পায় কি পায় না, মাসের মধ্যে দশদিন যাদের গীতা গঙ্গাজল আর তুলসীগাছ মজুত রাখতে হয় হাতের কাছে, আর আবার সরিয়ে রাখতে হয় হতাশ হয়ে?

করেছিল বৈকি। সবাই করেছিল। বলেছিল, 'ভগবান ওঁকে নাও।' মল্লিক-গিন্নীর নাতি-নাতনীর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত যে লায়েক হয়ে গিয়েছে। তাই যখন তখন ওঁর কাছে গিয়েই বলতো, 'বুড়ী, তুমি মরবে কবে? কবে ভোজ খাবো আমরা?'

একটা মানুষ একশোবার মরমর হচ্ছে, অথচ মরছে না, এর থেকে অসহ্য আর কি আছে?

প্রার্থনা করেছিল সবাই।

কিন্তু সে খবর অসীমার জানা নেই।

অসীমা শুধু এই উপলক্ষে নিজের ওই হঠাৎ পাওয়া অলৌকিক শক্তির খবরটা জানলো।

নিশ্চয় বাক্‌সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অসীমা। সে যা কিছু বলে তাই ফলে যায়। বিশেষণটা বিভাসই দিয়েছিল। শেষরাত্রে মল্লিকবাড়ি থেকে ফিরে এসেই বলেছিল, 'তোমাকে এবার থেকে বাক্‌সিদ্ধ বলা চলবে।'

তবু কুকুরটার কথা জানতো না বিভাস। শুধু বুড়ীর কথাতেই বলেছিল। কিন্তু অসীমার মনে আবার নতুন করে কুকুরটা এসে জায়গা নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা ভয়ে হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

দু'দুটো জীবহত্যা করেছে অসীমা!

মানুষ আর পশু! দু'দুটো প্রাণী যেন তাদের মৃত্যুনীল চোখে অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে অসীমার দিকে! ধাক্কা দিচ্ছে তার গভীর চৈতন্যের স্তরে। তাদের সেই নীরব দৃষ্টি বলছে, 'তুমি, তুমিই দায়ী! আমাদের খুন করেছ তুমি!'

অসীমা কি ওই প্রসাদী বেলপাতাটা ফেলে দেবে? বলবে, 'হে কঙ্কালেশ্বরী, তুমি আমায় মার্জনা করো!'

ফেলে দিতেই গেল একদিন, কিন্তু গুটিয়ে এল হাত। শুধু খুনী হয়েই থাকবে অসীমা?

শুধু হত্যার দায়ে দায়ী? জীবন দিতে পারবে না কাউকে? পারবে, পারবে বৈ কি। আসুক সে সুযোগ।

ফেলে দিল না।

বরং আরও যত্ন করে তুলে রাখল।

হয়তো কাঁপে, হয়তো অন্যদিকে তাকিয়েই বলে, 'এখন লাভ হচ্ছে মানটা বজায় থাকা, মুখটা বড় হওয়া।'

দীপক সহসা হেসে উঠে বলে, 'এই দেখ, এখন এই মহামুহূর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে বসছি আমরা! যাও যাও, এগিয়ে যাও, ওই বোধহয় একটা গাড়ী থেকে একদল মহিলা নামছেন, ওঁদের সঙ্গে ভিড়ে পড়।'

শমিতা এগিয়ে যায়। দীপক একটা অদ্ভুত কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সত্যিই ওই দলটার পিছু-পিছু ঢুকে পড়ল শমিতা বিয়েবাড়ির মধ্যে। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভিতরের একটা প্রবল আলোড়ন ওকে যেন ঠেলে রাস্তায় বার করতে চাইল।

এ কী করলাম আমি, এ কী করলাম! স্খলিত চিন্তায় শমিতার অন্তরাত্মা যেন হায় হায় করে উঠল। এ কোন্ ভূত আমাকে পেয়ে বসেছিল! আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! বড়মুখ করে বলেছিলাম দীপককে, 'সব রকম পরিস্থিতির জন্যেই প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি', কিন্তু যদি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলে ওঠে, 'তুমি কে? তুমি এখানে কী জন্যে? তোমাকে এখানে আসবার পারমিশনটা দিল কে? তোমার শরীরে কি লজ্জা বলে বস্তুটা একেবারে নেই?'

কী উত্তর দেব তখন আমি?

যদি বলে, 'তোমার ওই উপহারটা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাওগে যাও' —কী করব আমি? ভাবতে লাগল। তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল যন্ত্রের পুতুলের মত।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে এল শমিতা, তখনও যন্ত্রের পুতুলের মত ছাড়া আর কি?

নেমে এল, গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, গাড়ীতে গিয়ে উঠল যেন স্প্রীংয়ের দমে।

দীপক বলল, 'কী হল? বাসনা মিটল?'

শমিতা কথা বলল না, শুধু হাত নেড়ে গাড়ীটা ছাড়বার ইশারা করল।

দীপক আর কথা বলল না। ওই অপমানাহত মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করল। নিজের দোযে কষ্ট পেলেও কষ্টটা কষ্টই। ওকে থিতোতে দিতে হবে। ওকে শান্ত হতে সময় দিতে হবে।

আস্তে আস্তে গাড়ীটাকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু অপমান কি সত্যিই কেউ করেছিল শমিতাকে? ঘৃণা আর ধিক্কারের প্রবল ঝড় তুলে গলাধাক্কা দিতে এসেছিল কেউ ওকে? যার জন্যে আট-ন'টা বছর তৃষিত হয়ে আছে ওর প্রাণ?

না, তৃষ্ণার জল জোটে নি শমিতার। কেউ ওকে তীব্র অপমানে জর্জরিত করে নি। উপযাচক হয়ে গেলেও নিমন্ত্রিতার আপ্যায়ন পেয়েছিল ও। পরিচিত-অপরিচিত সবাই ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছিল। এমন কি কনের কাকাও।

চলে আসবার সময় নীচের দালানে দেখা হয়ে গিয়েছিল যার সঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠল, তখন কনের মা হাস্যবদনে এগিয়ে এসেছিলেন দেড়হাত চওড়া লালপাড় একখানা কোরা তাঁতের শাড়ি পরে। সম্মুখবর্তিনীকে লক্ষ্য করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'এই যে—সেজবৌদির আসা হল! বাবাঃ, কী পায়াভারী! গায়ে-হলুদে আসাই হল না! অত করে বললাম!'

সেজবৌদি হৈ-চৈ করে তাঁর না আসার কৈফিয়ত দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন, পিছনে পিছনে আরও দু-তিন জন।

সহসা এক মুহূর্তের জন্যে মুখোমুখি হল শমিতা আর কনের মা।

শমিতার প্রাক্তন ভাশুরের বৌ।

কিন্তু সে বোধকরি মুহূর্তের জন্যই।

পরক্ষণেই ভয়ানক একটা ব্যস্ততার ভানে বলে উঠলেন তিনি, 'এই যে! অ বৌমা, কোথায় গেলে তুমি? যাঁরা আসছেন, বসাও টসাও।'

দেড়হাত চওড়া লালপাড় শাড়ি সমেত মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু বৌমা এল।

যন্ত্রের পুতুলও একটা কথা ভাবল; ভাবল, বৌমা! তার মানে দেবুর বিয়ে হয়ে গেছে! আশ্চর্য! দিন কী তাড়াতাড়ি দৌড়য়!

বৌমা বোধকরি কাউকেই খুব একটা চেনে না। তাই বৌমা নরম ভদ্রগলায় বললে, 'আসুন!'

শমিতার মুখ দিয়ে কথা বেরিয়েছিল বৈকি। শমিতা বলেছিল, 'কনে?'

'এই যে এ-ঘরে।'

বৌমা পথ-প্রদর্শিকা হয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘরে, যে ঘরে একরাত্তিরের রাণী ফুলু বসে আছে রীতিমত জমকালো ভঙ্গীতে।

শমিতাকে দেখে ফুলু কি চমকে উঠল?

যে-চমকানির জন্যে কথা সাজিয়ে রেখেছিল শমিতা! বলবে ঠিক করে রেখেছিল, কী রে, ভূত দেখলি মনে হচ্ছে? ভূত নয় অবিশ্যি, পেত্নী! তারপর ফুলুর কথার পিঠে কথা কইবে। অনেক কথা। কথাই তো ছড়িয়ে দিয়ে যেতে এসেছে। যাকে তাকে বলে যাবে কথা। অর্থহীন, অসংলগ্ন।

সেই কথা এ-কান থেকে ও-কানে যাবে, এখানে থেকে ওখানে।

তারপর সেইখানে। যেখানে পৌঁছে ওই অর্থহীন অসংলগ্ন কথাগুলোই সংলগ্ন হয়ে অর্থের ব্যঞ্জনা বহন করবে।

কিন্তু ফুলু চমকালো না।

ফুলু প্রথমে অচেনা চোখে তাকালো, তারপর বোকাটে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে।

সেই চালাক-চতুর জলি মেয়েটা এমন বোকাটে হয়ে গেছে!

হবেই তো! যেমন মা! যেমন বাড়ির সব লোক! কিন্তু নিজেই বা শমিতা কি চাতুর্য দেখাতে পারল? নিজেও তো বোকার মত কিছু না বলে হাতের বাক্সটা এগিয়ে দিল, ডালাটা না খুলেই।

ফুলুর বোকামির হাওয়া কি তার গায়েও লাগল?

কোন একটা মেয়ে কাছে বসেছিল। বোধকরি কনের বান্ধবী। সে সকৌতূহলে কেসটা খুলে ধরে এগিয়ে দিল কনের সামনে, দিব্যহাসির ঝলক মুখে মেখে।

সঙ্গে সঙ্গে কনের মুখেও ফুটে উঠল একটুকরো দিব্যহাসি।

ছুই বান্ধবীর চোখে চোখে একটা ইশারা খেলে গেল, যে ইশারার অর্থ— ঈস্! কী সাংঘাতিক সুন্দর! কে জানে কত দাম!

শমিতা ঘামতে ঘামতে বলল, 'পছন্দ হয়েছে?'

ফুলু মৃত্নু হেসে ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু ঘরে কি আর কেউ ছিল না?

ছিল বৈকি, ঘর-ভর্তিই তো মহিলা। বেশে-বাসে সৌরভে-গৌরবে ঝলমল করছেন। ছু'চারজন জটলা করে করে নিজমনে গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তাঁরা।

হ্যাংলার মত ছুটে এসে গহনা দেখতে বসবেন না তাঁরা।

দেখবেন। পরে দেখবেন। এখন শুধু আড়নজরে দেখে নিলেন একটু। তাই দেখছেন সবাই। কে কি দিল মনের খাতায় টুকে রাখছেন, পরে উঠে এসে নিরীক্ষণ করবেন।

আচ্ছা, শমিতার সেই চেনা-মানুষগুলো কোথায় গেল? শাশুড়ী, ভাশুর, ননদ-নন্দাই, ভাগ্নে-ভাগ্নীরা?

ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে বুঝি, কেউ আর এদিকে আসবে না!

শমিতা কি তাদের খবর জিগ্যেস করবে ফুলুকে? নাকি শমিতা

অনন্তকাল ধরে শুধু বসে থাকবে বোকার মত, কনের দিকে মুখ আর দরজার দিকে পিঠ করে ?

চেনা মুখ ! চেনা মুখ ! কোথায় সেই চেনা মুখ ?

বাসনা পূর্ণ হল শমিতার।

শমিতার ননদ এল মেয়েদের খেতে ডাকতে। সবাইয়ের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন, চলুন।' শমিতার কাছে আসবার টার্ন এল।

থমকে দাঁড়াল।

ফুলুর চোখে চোখে তাকাল। তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিতের ভঙ্গীতে বলল, 'চলুন, পাতা হয়েছে।'

'চলুন !' শমিতার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু শমিতা কষ্টে বলল, 'আমি কিছু খাব না।'

আশ্চর্য ! ওর স্বর রুদ্ধ হল না, শমিতার সমবয়সী ওই ননদের। ও পরিষ্কার গলায় কথা বলল।

না, একথা বলল না, 'তোকে নেমন্তন্ন কে করল রে ? লাজলজ্জাহীন ছোড়দা বুঝি ? কিন্তু তোকে বলিহারী দিই, এই লোকে-লোকারণ্য বিয়েবাড়িতে এলি কোন্ মুখে ?' এই ধরনেরই তো বাক্যবিন্যাস-প্রণালী ছিল ওর।

কিন্তু এখন ও নিজ পদ্ধতি ত্যাগ করল। বলল, 'ওমা খাবেন না কেন ? শরীর ভাল নেই বুঝি ? তা' বেশ, একটু মিষ্টিও তো খাবেন ? ...ও বৌমা, এঘরে একটা প্লেটে করে—'

ঘর খালি হয়ে গেল। মহিলারা 'পাত'-উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেন।

পরক্ষণেই বৌমা এল একটা মাটির প্লেটে গোটা আষ্টেকদশ মিষ্টি নিয়ে।

শমিতা এবার হাসতে পারল।

হেসে ফেলে বলল, 'এত মিষ্টি মানুষে খেতে পারে ?'

বৌমা বলল না, 'মানুষে কী না পারে? আর মানুষের পারার মাপেই কি চলছেন আপনি?'

বৌমা শুধু বলল, 'যা পারেন খান।'

'কিছুই পারব না।' বলল শমিতা।

কিন্তু কেন? শমিতা কি আশা করছিল ওর ওই না-খাওয়াকে উপলক্ষ করে অনেকে জড় হবে? অনুরোধ উপরোধ করবে? শমিতা তো একসময় বুদ্ধিমতী ছিল। হঠাৎ এত বোকা হয়ে গেল কি করে? কিন্তু বৌমা কাউকে ডেকে আনল না। বৌমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শমিতা সাহসে ভর করল।

শমিতা প্রশ্ন করল, 'তুমি দেবুর বৌ?'

বৌমা ঘাড় কাৎ করল।

'কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

'দু' বছর।'

শমিতার মনে হল মেয়েটা যেন কাঠের পুতুল। আবার বলল শমিতা, 'থালাটা তুলে নিয়ে যাও, বৃথা পড়ে থেকে নষ্ট হবে কেন?'

বৌমা তুলে নিয়ে চলে গেল।

ফুলু অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কিছু খেলেন না?'

হ্যাঁ, ফুলুও শমিতাকে 'আপনি' বলল।

শমিতা বুকের শির ছিঁড়ে হাসল। হেসে বলল, 'কেন খাব? তুই কি তোর বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিলি?'

ফুলু মাথা নামালো।

'আমি এবার যাই', বলল শমিতা, উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে।

ফুলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা নমস্কারের মত করতে গেল, করল না। থতমত খেল। ফুলুর মা ঘরে ঢুকলেন। নৈর্ব্যক্তিক সুরে বললেন, 'বিয়ে বাড়িতে এসে মিষ্টিমুখ করতে হয়।'

শমিতা গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আজ থাক!' তারপর শমিতা নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেল।

উনি 'থাক্ থাক্' বলে সরে গেলেন।

শমিতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

শমিতা দালান পার হতে গেল।

যে দালানে কনের কাকা এই বিয়েবাড়িতেও বসে বসে একটা ভাঙা টেবিল-ফ্যান নিয়ে সারাবার চেষ্টা করছিল।

আশ্চর্য! ওর সেই পুরনো বাতিকটা এখনো ছাড়েনি ও।

তার মানে ওর পৃথিবীতে কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি।

শমিতা নিজেও যে এখনো প্যাটার্ন খুঁজে খুঁজে উল বোনে, সে কথা ভুলে গেল শমিতা।

দালানটা পার হতে হতে থমকে দাঁড়াতে পারতো শমিতা, কিন্তু পারল না। যন্ত্রের পুতুলের মত এগোতে লাগল।

কনের কাকা কিছু বলল না, শুধু ছড়ানো দড়িদড়াগুলো টেনে সরিয়ে নিল, পাছে শমিতার পায়ে বাধে।

সেই সাবধানতা দেখতে পেল শমিতা, আগুন ধরে উঠল ওর মাথায়। তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'কী হচ্ছে এসব?'

কনের কাকা ভদ্র নরম গলায় বলল, 'বিশেষ কিছু না। ফ্যানটা একটু খারাপ হয়ে গেল, তাই—'

নিমন্ত্রিতা অভ্যাগতার সঙ্গে যতটুকু সম্ভ্রমসূচক গলায় কথা বলা যায়, তা বলেছে কনের কাকা।

রাগ নয়, ঘৃণা নয়, সাধারণ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে নিল কনের কাকা।

নিজের কাজে মন দিল। যেন এই মুহূর্তে ওই কাজটা ছাড়া আর অন্য কোন কিছু চিন্তা নেই ওর। তার মানে অস্বীকার করল শমিতা নামের ওই মানুষটাকে, ওকে বুঝিয়ে দিল, তোমাকে আমরা মনে রাখিনি। তোমার ঘৃণ্য কুৎসিত অসভ্য ব্যবহারটাকেও না। শমিতার

মনে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই লোকটার উপর। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওকে, 'কেন? কেন? সেটুকু মনে রাখলে ক্ষতি কি ছিল?'

ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। শমিতা তাই চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'কলকাতায় এসে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? মুঙ্গের কি দোষ করল?'

কনের কাকা নিরুত্তর থেকে অপমান করল না শমিতাকে, খুব নিরীক্ষণ করে সূক্ষ্ম ছুটো তারে একটা প্যাঁচ দিতে দিতে নির্লিপ্ত গলায় যেন দেওয়ালকে উত্তর দিল, 'পাত্রপক্ষের হুকুম!'

শমিতা আরো চাপা তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'আমায় কেউ আসতে বলেনি, তবু এসেছি কেন, সে-কথা জিগ্যেস করলে না?'

কনের কাকা তারটাকে কায়দা করে ফেলে তাতে একটা ব্ল্যাক-টেপ জড়িয়ে দিতে দিতে তেমনি ভাবে বলল, 'জিগ্যেস করবার কি আছে? ফুলু খুব আদরের ছিল—বিয়ে হচ্ছে শুনে থাকবে কোথাও। দেখতে ইচ্ছে হয়েছে—'

'ওঃ তাই! দয়া! মহানুভবতা!' ছিটকে বেরিয়ে এল শমিতা। স্প্রীংয়ের দমখাওয়া পুতুলের মত।

দয়া করছে সবাই শমিতাকে!

ফুলুর মায়ায় পড়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ছুটে এসেছে শমিতা। তাই করুণা করে কেউ কিছু বলল না।

ওরা বোধ হয় ভাবল, যাক্‌গে, কাজ-কর্মের বাড়িতে এমন কত ভিখিরীও তো আসে!

শমিতাকে বেচারী ভিখিরী ভাবল ওরা!

শমিতা কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, 'অমন সস্তা সেন্টিমেন্ট নেই আমার! আমি ফুলুর জন্যে আসিনি।'

অনেকক্ষণ পরে দীপক বলল, 'বলেছিলাম না, শুধু শুধু অপমান হতে' যাওয়া! কী যে খেয়াল হল!'

শমিতা সহসা ভস্মশয্যা থেকে জেগে উঠল। শমিতা ঝেঁজে উঠে বলল, 'কে বলল তোমায় খুব একটা অপমানিত হয়েছি আমি? যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছে সবাই আমার সঙ্গে।'

দীপক মৃদু হেসে বলে, 'সেটাই তো বেশি অপমান।'

শমিতা ওর কাঁধটা খামচে ধরল, ঝাঁকুনি দিল। তীব্রগলায় বলল, 'তার মানে?'

'মানে?' দীপক হেসে উঠে বলে, 'মানে, সব অভিযানটাই ব্যর্থ। যা চেয়েছিলে হল না।'

'কী চেয়েছিলাম আমি, শুনি?' আরো প্রখর হল শমিতা।

আর দীপক আরো শান্ত, 'কী চেয়েছিলে তুমি নিজেই জানো। আমি বললে ক্ষেপে যাবে।' হাত থেকে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিল।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে হেসে উঠল শমিতা। বলল, 'ঠিক ধরেছ তো! উঃ, কী বুদ্ধি তোমার! অন্যের মনের খবর নির্ভুল পড়ে ফেলতে পারো।···ঝগড়া বাধাতেই গিয়েছিলাম আমি, যেমন নেমন্তন্ন করেনি মেয়ের বিয়েতে! কিন্তু হল না। ঝগড়া করল না। ওই উপহার দেখেই ঘাবড়ে গেল। ধরতে পারলো না স্রেফ্ ঝুটো! দেখেনি তো কখনো! তাই কাঁচ-পুঁতি-পেতলকে হীরে-মুক্তো-সোনা ভেবে মোহিত হল, বিশ্বাস করল, তাই সমীহ করল আমাকে। অপমান করতে ভুলেই গেল। কী মজা! কী মজা!'

বাচালের মত হাততালি দিয়ে উঠে শমিতা, 'কী ঠকানোটা ঠকালাম, দেখলে তো!'

দীপক একটা রহস্যভরা হাসি হেসে বলল, 'দেখলাম বৈকি! আগাগোড়াই দেখলাম।'